তকদীর কি ?

মূল উর্দূঃ

হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মওলানা
আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদঃ

মাওলানা বশির উদ্দিন

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী কুতুবখানা

৩৯/১, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
মোহাম্মদী কুতুবখানা
৩৯/১, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৮৩২৯

প্রথম প্রকাশঃ
রবিউল আওয়াল, ১৪১৮ হিজরী
জুলাই, ১৯৯৭ ইংরেজী

হাদিয়া ঃ ১৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণেঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দারুল কলম কম্পিউটার
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ লালবাগ, ঢাকা-১৩১০ ফোনঃ ২৩২৩২৭

পরিবেশনায়

মোহাম্মদী কুতুবখানা	নিউ মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী
৩৯/১, নর্থ ব্রুক হল রোড	ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা	১১/১, বাংলা বাজার, ঢাকা।

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ববিধাতা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফার উপর ও তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবাদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক।

আম্মাবাদ-

তাকদীর ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। সাতটি মৌলিক বিষয়ের উপর ঈমান রাখা ঈমানদারের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর উপর, তাঁহার ফিরিশতাদের উপর, তাঁহার প্রেরিত নবী রাসূলগণের উপর সকল আসমানী কিতাবের উপর, আখেরাতের উপর, তাকদীরের উপর অর্থাৎ ভালমন্দ যাহাকিছু হয় সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর। এই জন্য প্রত্যেক হাদীছগ্রন্থে তাকদীরের বয়ানের জন্য পৃথক অধ্যায় কায়েম করা হইয়াছে। ঈমানদারের জন্য ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকদীরের উপরে ঈমান মানব জীবনের অস্থিরতা দূরীভূত করিয়া স্থিরতা পয়দা করে।

যুগ সংস্কারক হাকীমূল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) মানবজীবনের প্রয়োজনীয় এমন কোন দিক ছাড়েন নাই যাহা সম্বন্ধে তিনি একটি গ্রন্থ হইলেও রচনা করেন নাই। তাকদীর সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে "তাকদীর কিয়া হ্যায়" একটি প্রশিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি কুরআন ও হাদীছের আলোকে তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বিভিন্ন উদাহরনের মাধ্যমে বিষয়টি সর্ব সাধারণের সামনে উপস্থাপন করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ উর্দূ ভাষায় রচিত বিধায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষ মহা উপকারী এই গ্রন্থের উপকারীতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষাভাষী মানুষও যাহাতে এই গ্রন্থ হইতে উপকৃত হইতে পারে এই দিকে খেয়াল রাখিয়া মোহাম্মদী লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার উদ্যেগ গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুবাদ ও সম্পাদনার কার্য সমাপ্ত করার দায়িত্ব এই অধমের উপর অর্পন করা হয়েছে। এই অধম গ্রন্থের শব্দে শব্দে অনুবাদ করার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু পাঠক সমাজের সামনে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিয়াছে। এই বিষয় কতটুকু সফলকাম হইয়াছে; পাঠক সমাজ তাহা বিবেচনা করিবেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়িলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অবগত করিলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করনে সংশোধন করিতে প্রস্তুত থাকিব। সবচেয়ে বড় কথা পাঠক সমাজের কাছে দরখাস্ত রহিল তাহারা যেন এই প্রচেষ্টা কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করেন। আল্লাহ পাক কবুল করিলেই শ্রম সার্থক হইবে। অন্যথায় সবই অসার। অবশেষে আল্লাহ পাক যেন এই গ্রন্থের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত সকলকে স্বীয় প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল করেন। এই দোআ করি।

নিবেদক
বশির উদ্দিন
জামিয়া ইসলামিয়া
ইসলামপুর, নরসিংদী

সূচীপত্র

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ

তকদীর কি ?

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

হযরত ইমাম আরিফ, মোহাক্কেক, তাজুল আরিফিন, যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হুজ্জাতুল সলফ, ইমামুল খলক, সালেকীনদের পথ প্রদর্শক তাজউদ্দিন আবুল ফজল আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল করীম ইবনে আতাউল্লাহ সেকান্দরী (আল্লাহ পাক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাকে খুশী করেন, আমাদিগকে এবং সকল মুসলমানদিগকে তাঁহার দ্বারা উপকৃত করেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সবকিছু শুনেন। তিনি সকলের কাছে আছেন। সকলের দোয়া কবুল করেন।) বলিতেছেনঃ আল্লাহ পাকই একমাত্র প্রশংসা পাওয়ার হকদার। সৃষ্টি করার ও সুষ্ঠ পরিচালনায় যিনি অনন্য। নির্দেশ প্রদান ও নির্ধারনে যিনি অদ্বিতীয়। অতুলনীয় সম্রাট। তাঁহার ন্যায় কাহারও শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁহার কোন মন্ত্রীর প্রয়োজন হয় না। এমন রাজা যাহার রাজ্যের বাইরে ছোট বড় কিছুই নাই। পরিপূর্ণ গুনাবলীর অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁহার কোন সদৃশ ও উদাহরণ নাই। তাঁহার সত্ত্বা এত পরিপূর্ণ যে, ইহার উদাহরণ পর্যন্ত সম্ভব নয়। তিনি মহাজ্ঞানী। কাহারও অন্তরের কথা পর্যন্ত তাঁহার কাছে গোপনীয় নয়। তিনি নিজেই বলেন

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ *

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি করিয়া জানিবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক অবগত।

তিনি এমন জ্ঞানী যে, প্রত্যেক জিনিসের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবর রাখেন। তিনি এমন শ্রোতা যে, তাঁহার সম্মুখে চিৎকার করিয়া বলা এবং চুপে চুপে বলা সমান। উভয় প্রকারের কথা সমভাবে শ্রবন করেন। তিনি রিযিক দাতা। তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে রিযিক দান করেন। তিনি সবকিছুর ধারক। সর্বাবস্থায় তিনি সকলের যিম্মাদার। তিনি স্বীয় পূর্ণ অনুগ্রহের দ্বারা আত্মা সমূহের হায়াতের অস্তিত্ব দিয়াছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। স্বীয় পরিপূর্ণ শক্তির দ্বারা সমস্ত মাখলুককে পুনরায় জীবন দান করিবেন। তিনি মহা হিসাব গ্রহণকারী ও যে দিন

তাঁহার সম্মুখে ভাল মন্দ আমল লইয়া উপস্থিত হইবে সে দিন তিনি আমলকারীকে বিনিময় দান করিবেন। ঐ পবিত্র সত্তাই যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত যিনি বান্দাদের অস্তিত্বের পূর্বেই তাহাদিগকে নিয়ামত দান করিয়াছেন। সর্বাবস্থায় তাহাদিগকে রিযিক দান করেন। বান্দা তাঁহার আদেশ পালন করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় তিনি রিযিক পৌঁছাইতে থাকেন। তিনি স্বীয় দয়ায় সমস্ত কিছুকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার অস্তিত্বের সাহায্যে সমস্ত অস্তিত্বশীল টিকিয়া আছে। ভূমণ্ডলে রহিয়াছে তাঁহার হেকমতের প্রকাশ আর আসমানে রহিয়াছে তাঁহার কুদরতের প্রকাশ।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এই অদ্বিতীয় মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নহে। কেহই তাঁহার অংশীদার হওয়ার অধিকার রাখে না। আমি একজন তাবেদার ও অনুগত বান্দার ন্যায় সাক্ষ্য দিতেছি। আমি ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। সকল নবীগণ অপেক্ষা তিনি উত্তম। আল্লাহ পাক বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারাই সূচনা করা হইয়াছে। আর তাঁহার দ্বারা সমাপ্ত করা হইয়াছে। অন্য কাহারও মধ্যে এই মর্যাদা নাই। যে দিন বান্দাদের আমলের প্রতিদান প্রদানের ফায়সালা করার জন্য একত্রিত করিবেন সেদিন তিনি সকলের শাফায়াত করিবেন। তাঁহার পবিত্র সত্তার, সকল নবীদের এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হউক।

আম্মাবাদ, হে ভ্রাতা! দোয়া করি আল্লাহ পাক তোমাকে যেন, স্বীয় আশেকদের অন্তর্ভুক্ত করেন; স্বীয় নৈকট্য নসীব করেন; স্বীয় আশেকদের মহব্বতের স্বাদ গ্রহণ করান; তোমাকে স্বীয় সান্নিধ্যে রাখিয়া বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি থেকে নির্ভয় করিয়া দেন; তিনি যেন তোমাকে এমন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাহাদেরকে তিনি ইসলামের দৌলত দ্বারা সৌভাগ্যশালী করিয়াছেন; তাহারা এমন বান্দা যে যখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে আল্লাহ পাককে চর্ম চোখে দেখা সম্ভব হইবে না। তখন তাহারা ভগ্ন হৃদয় হইয়া গেলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক তাহাদের সান্তনা প্রদানের উদ্দেশ্যে তাহাদেরকে স্বীয় নূরের তাজ্জালী দ্বারা সৌভাগ্যশালী করিয়াছেন। তাহাদের জন্য স্বীয় নৈকট্যের বাগানের দরজা প্রশস্ত করিয়া তাহাদের অন্তরের উপর দিয়া স্বীয় নৈকট্যের সুরভি পবন প্রবাহিত করিয়াছেন। তাহাদিগকে আবহমান কাল থেকে নির্ধারিত তাকদীর প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। তাহারাও নিজেদের এখতিয়ার পরিপূর্ণভাবে তাঁহার কাছে সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ পাক তাহাদের সামনে প্রকাশ

করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার কাজ করার মধ্যে তাঁহার অনুগ্রহ ও মেহেরবানী লুকায়িত রহিয়াছে। ইহা অবগত হওয়ার পর তাহারা ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের অনুগত হইয়াছেন। সর্বকার্যে সর্বক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি নির্ভর করা শুরু করিয়া দিয়াছেন। কেননা, তাহারা অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের মর্যাদায় তখনই উন্নীত হইতে পারিবেন যখন তাঁহার নির্দেশের প্রতি রাজী থাকিবেন।

তাহারা ইহাও জানিয়াছেন যে, তাঁহার খালেছ বান্দা হওয়া তখনই সম্ভব হইবে যখন তাকদীরকে মানিয়া লইবেন। সুতরাং এই প্রকারের বান্দা সর্বপ্রকার (আকিদাগত ও আমলী) ময়লা অবর্জনা ও ধুলিবালি হইতে মুক্ত থাকে। এই সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন-

"বিপদাপদ তাহাদের পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছিবে? যখন তাহারা তাঁহার রশি ধরিয়া রাখিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের হুকুম জারী হয়। তাহারা তাঁহার আযমতের সামনে অবনত থাকে এবং তাঁহার হুকুমের সামনে মস্তক অবনত থাকে যেন তাঁহার নিয়ন্ত্রন জারী রয়েছে উপর তোমার; ফলে অন্তর নত করিয়া দিয়াছে শির তোমার।"

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্যে পৌঁছিতে চায় নিঃসন্দেহে তাহার জন্য অপরিহার্য হইল সে যেন দরজা দিয়া আসে। (দরজা হইল তাকদীর) আর পৌঁছার পাথেয় প্রস্তুত করে। এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয় বিষয় হইল উপায় অবলম্বন করা। কেননা উপায় অবলম্বন করা প্রকৃতপক্ষে তাকদীরেরই মোকাবিলা করা। সুতরাং এই বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য এবং ইহাতে যাহা কিছু আছে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আমি এই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছি। আর ইহার নাম রাখিয়াছি "তানবীর ফি এসকাতিত তাদবীর"[১] যাহাতে গ্রন্থের নাম ইহাতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাইয়া যায়। আল্লাহ্ পাকের কাছে কায়মনবাক্যে আবেদন এই যে, তিনি যেন গ্রন্থ রচনায় পরিপূর্ণ ইখলাস নসীব করেন, স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা ইহাকে কবুল করেন এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায় বিশেষ বিশেষ লোকদিগকে ও সর্বসাধারণকে উপকৃত করেন।

তিনি সবকিছুর উপর শক্তি রাখেন। কবুল করার যোগ্যতা তাঁহারই আছে। আল্লাহ্ পাক কুরআনে বলিয়াছেন, আপনার প্রতিপালকের শপথ, তাহারা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আপনাকে (হে

১। উপায় অবলম্বন পরিত্যাগ করার সৌন্দর্য আলোকিত করা।

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের মধ্যে ন্যায় বিচারক বলিয়া মনে না করে। অতঃপর আপনার ফয়সালার উপর নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাইবে না তাহা কায়মনবাক্যে গ্রহণ করিয়া লইবে।[১]

আল্লাহ পাক আরও বলিয়াছেন "আপনার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। মাখলুকের কোন ক্ষমতা নাই। আল্লাহ পাক মুশরিকদের শিরক হইতে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।[২]

আল্লাহ পাক অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন, তবে কি মানুষের প্রতিটি আকাঙ্খা পুরা হয়? সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাত আল্লাহর জন্যই।"[৩]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে প্রতিপালক মানিয়া লইয়া, ইসলামকে দ্বীন মানিয়া লইয়া আর মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানিয়া লাইয়া রাজী আছে। সে ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, "আল্লাহর প্রতি রাজী থাকিয়া ইবাদত কর। যদি রাজী থাকার সামর্থ না হয় তাহা হইলে অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর ধৈর্যধারণ করার মধ্যেও প্রচুর মঙ্গল রহিয়াছে।"

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ ব্যতীত আরও অনেক আয়াত ও হাদীছ রহিয়াছে যাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপায় অবলম্বন পরিত্যাগ করার এবং তাকদীরের মোকাবিলা না করার প্রমাণ বহন করে। তবে আহলে মারেফাত বলেন, "যে ব্যক্তি উপায় অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়াছে- তাহার উপায় এই দিক থেকেই হইয়া থাকে।" শায়খ আবুল হাসান শাযলী (রহঃ) বলেন, যদি একান্তই উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা হইলে এই উপায় অবলম্বন কর যে, উপায় অবলম্বন ছাড়িয়া দাও। তিনি আরও বলিয়াছেন, কোন কার্যে নিজের পছন্দের দখল দিও না। বরং নিজের পছন্দ বর্জন করা পছন্দ কর। স্বীয় পছন্দ থেকে পলায়ন কর। (দূরে থাক) এই পলায়ন হইতেও বরং এক কথায় সব কিছু হইতে পলায়ন করিয়া আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হও। তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন আর যাহা ইচ্ছা করেন পছন্দ করেন।

১। فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما *

২। و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحن الله و تعالى عما يشركون *

৩। للانسان ما تمنى فالله الاخرة و الاولى *

প্রথম আয়াত অর্থাৎ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ *

দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত ঈমান ঐ ব্যক্তির অর্জিত হইয়াছে, যে আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসূলকে নিজের জন্য হাকীম মানিয়া লইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার কথায় কাজে, অবলম্বন করা ও বর্জন করার ক্ষেত্রে, ভালবাসা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে, প্রভৃতিতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে ফয়সালাকারী নির্ধারন করিয়াছে। আহকামে তাকলিফী ও আহকামে তাছরিফী উভয় আল্লাহ পাকের এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত। উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুসরণ ও তাহাদের ফয়সালা মানিয়া লওয়া একান্ত অপরিহার্য ও ওয়াজিব।

আহকামে তাকলিফী বলিয়া ইবাদত সম্পর্কিত করণীয় ও বর্জনীয় কার্যসমূহকে বুঝানো হইয়াছে। আর আহকামে তাছরিফী বলিয়া এমন সব বিষয়কে বুঝানো হইয়াছে যাহা স্বীয় উদ্দেশ্য ও চাহিদার পরিপন্থী হইয়া থাকে।

সুতরাং ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, দুইটি বিষয়ের মাধ্যমে প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয়। এক– তাঁহার হুকুম মানা। দুই– তাঁহার পরাক্রমের সামনে নত শির হইয়া যাওয়া। অতঃপর আল্লাহ পাক এতটুকুতেই ক্ষান্ত হন নাই যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম মানিয়া লইতে পারে নাই কিংবা সংকীর্ণ মনে মানিয়াছে তাহার ঈমান নাকচ করিয়াছেন বরং এই নাকচ করিতে গিয়া নিজের সেই রবুবিয়তের শপথ করিয়াছেন যাহা বিশেষভাবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা এখানে তিনি فلا و الرب (প্রতিপালকের কসম) না বলিয়া فلا و ربك (আপনার প্রতিপালকের কসম) বলিয়াছেন।

এইরূপ বলার দ্বারা কৃত শপথ এবং যে বিষয় সম্পর্কে শপথ করা হইয়াছে উভয় মজবুত ও শক্তিশালী হইয়াছে।

অধিকন্তু আল্লাহ পাকের এই বাণীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমকে নিজের হুকুম আর তাঁহার ফয়সালাকে নিজের ফয়সালা বলিয়া অভিষিক্ত করিয়াছেন। তাই তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুকুম মান্য করা এবং তাঁহার অনুগত হওয়া বান্দাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এমনকি যতক্ষন পর্যন্ত তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুকুম মান্য না করিবে ততক্ষণ

পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি আনীত ঈমানও গ্রহণযোগ্য হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। কেননা তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না; বরং যাহা বলেন তাহা ওহী ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুকুম আল্লাহ পাকেরই হুকুম। তাঁহার ফয়সালা আল্লাহ পাকেরই ফয়সালা। যেমন কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে, "যাহারা আপনার হাতের উপর বয়য়াত করে; তাহারা আল্লাহর হাতেই বয়য়াত করিতেছে।" ১

ইহাকে আরও মজবুত করার জন্য বলিয়াছেন "আল্লাহ পাকের হাত তাহাদের হাতের উপর।" আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও অতীব গুরুত্বের প্রতি দ্বিতীয় আর একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, فلا و ربك বলিয়া আল্লাহ পাক স্বীয় সত্ত্বাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আসিয়াছে

كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا *

অত্র আয়াতেও আল্লাহ পাক স্বীয় পবিত্র নামকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত করিয়াছেন। আর যাকারিয়া (আঃ)-এর পবিত্র নামকে স্বীয় নামের সাথে সম্পর্কিত করিয়াছেন। এইরূপ করিয়াছেন যাহাতে বান্দাগণ উভয়ের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে। অতঃপর মুসলমান হওয়ার জন্য শুধু বাহ্যিকভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী মানিয়া লওয়াকে যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; বরং তাহার ফয়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা স্থান না দেওয়াকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ফয়সালা তাহাদের চাহিদার অনুকূলে হউক বা প্রতিকূলে হউক উভয় অবস্থায় ফয়সালা সম্পর্কে অন্তর সংকীর্ণতামুক্ত জরুরী। অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার কারণ হইল অন্তর নূর থেকে খালি হওয়া এবং আবর্জনা ও ময়লাযুক্ত হওয়া। মুমিন ব্যক্তি এমন হয় না; কেননা মুমিনের অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং তাহাদের অন্তরে প্রশস্ততা থাকে। প্রশস্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের নূর তাহাদিগকে প্রশস্ত অন্তরওয়ালা বানাইয়াছেন। আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। ফলে তাহারা তাঁহার আহকামকে মানিয়া লইতে সদা প্রস্তুত এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার মতের প্রতি রাজী।

১। ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله *

ফায়দা ঃ আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাকে দ্বারা স্বীয় হুকুম পালন করানোর ইচ্ছা করেন তখন তাহাকে স্বীয় নূরের দ্বারা হুকুম পালনের যোগ্যতার পোশাক পরিধান করান। সুতরাং আল্লাহর হুকুম নাযিল হয় পরে। আর ইহার পূর্বে নাযিল হয় নূর। এই নূরের দ্বারা সেই ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর একান্ত হইয়া যায়। নিজের থাকে না। ফলে সে হুকুমের ভর ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে শক্তিমান ও ধৈর্যশীল হইয়া যায়।

মোটকথা (১) নূর অবতীর্ণ হইতে থাকে আর নূরের অবতরণের প্রভাবে তাকদীরে লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহ বান্দার জন্য সহনীয় হইয়া উঠে। (২) অথবা বিষয়টি এইভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, বান্দার অনুধাবন শক্তিই বান্দার সামনে আহকামসমূহকে গ্রহণীয় করিয়া তোলে। (৩) অথবা ইহাকে এইভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইতে থাকে। ফলে তাকদীরে লিপিবদ্ধ আহকামসমূহ পালনে যে বাঁধা-বিঘ্ন ও বিপদাপদ সামনে আসে তাহা অনুগ্রহের প্রভাবে উঠিয়া যায়। (৪) অথবা মনে কর যে, আল্লাহর উত্তম মনোনয়ন প্রত্যক্ষ করিয়া তাকদীরের বোঝা বহন করিয়া লয়। (৫) আল্লাহ পাক সবকিছু এই বিশ্বাস তাঁহার হুকুম পালনে বান্দাকে ধৈর্যশীল করিয়া তোলে। (৬) অথবা ইহা এইভাবে বলা যায় যে, যখন বান্দা একীন করে যে, আল্লাহ পাক তাহার সবকিছু দেখিতেছেন তখন তাহার সাথে সম্পর্কিত ঘটনাসমূহে তাহার ধৈর্য আসিয়া পড়ে। (৭) অথবা এইভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের সৌন্দর্য্যের প্রকাশ বান্দাকে স্বীয় আমলের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল করিয়া তোলে। (৮) অথবা বিষয়টি এভাবেও বুঝা যায় যে, বান্দা যখন বিশ্বাস করে যে, ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। তখন তাহার মধ্যে ধৈর্য আসিয়া পড়ে। (৯) অথবা বিষয়টি এইভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, বান্দার আন্তরিক দর্শনের পর্দা উঠিয়া যাওয়ার ফলে বান্দা ধৈর্যশীল হইয়া পড়ে। (১০) অথবা এইভাবে বলা যায় যে, আহকামের ভেদ ও রহস্যসমূহ জ্ঞাত হওয়ার ফলে বান্দার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বান্দা আহকাম পালনের বোঝা বহন করার ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হইয়া পড়ে। (১১) অথবা ইহা এইভাবে বুঝিয়া লওয়া যায় যে, যখন বান্দা জানিতে পারে যে, স্বীয় প্রভুর আহকাম পালনে প্রভুর অনুগ্রহ ও করুনা নিহিত রহিয়াছে। তখন সে আহকাম পালনে আগ্রহী ও ধৈর্যশীল হইয়া উঠে।

প্রথম সবব (উপায়)

নূরের অবতরণ তাকদীরকে সহনীয় করিয়া দেয়। ইহা এইভাবে হয় যে, যখন নূর অবতীর্ণ হইতে থাকে তখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয়টি বান্দার সামনে খুলিয়া যায়। আর সে জানে যে এই সব আহকাম তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে। আহকাম প্রভুর পক্ষ হইতে আসার অবগতি তাহার জন্য সান্তনার ও ধৈর্যধারণের কারণ হইয়া যায়। আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়াছেন "আপনি স্বীয় পরোয়ারদিগারের হুকুমের উপর ধৈর্যধারণ করুন। কেননা, আপনি তো আমার চোখের সামনে রহিয়াছেন।"[১]

অর্থাৎ ইহা অন্য কাহারও হুকুম নহে যে আপনার জন্য কষ্ট হইবে। বরং ইহা আপনার প্রভুর হুকুম। আপনার প্রতি তো তাঁহার ইহসান অনুগ্রহ রহিয়াছে। এই বিষয়ের উপর আমাদের কবিতাঃ

سبك هوگيا يجو كرجو كجهو تها غم و بلا

سناجب سے هے تم نے كيا لجو كو مبتلا

هنيں حكم حق ہے آدمى كو كهيں پناه

نهيں چلتا بش هيں پر جو خود

"আমার যে সব চিন্তা ভাবনা ও বিপদাপদ ছিল তাহা হালকা হইয়া গিয়াছে। যখন থেকে আমি শুনিয়াছি যে, আপনি আমাকে জড়িত করিয়াছেন।

"আল্লাহর হুকুম থেকে মানুষের রেহাই নাই। তিনি নিজে যাহা মনোনীত করিয়াছেন তাহা না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া চলে না।"

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমেও বুঝা যাইতে পারে যেমন, এক ব্যক্তি একটি অন্ধকার কক্ষে আছে। কোন একটি জিনিস তাহার দেহে পড়িল কিন্তু কে তাহা নিক্ষেপ করিল সে তাহা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বাতি জ্বালানোর পর যখন দেখিতে পাইল যে, এই ব্যক্তি তাহার পীর অথবা পিতা অথবা হাকীম। এই সময়ে তাহার এই ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া তাহার ধৈর্য ও সান্ত্বনার কারণ।

দ্বিতীয় সবব ঃ অনুধাবনের দরজা প্রশস্ত হইয়া যাওয়া আহকাম কবুল করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। আল্লাহ পাক যখন স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে

১। * واصبر لحكم ربك فانك باعيننا.

কাহারও প্রতি হুকুম আপতিত করিতে ইচ্ছা করেন এবং অনুধাবনের দরজা খুলিয়া দেন। তখন তিনি উক্ত বান্দাকে বলিয়া দেন যে, আল্লাহ পাক তাহার এই হুকুমটি কবুল করিতে চাহিতেছেন। ইহা এইভাবে হয় যে, অনুধাবন তোমাকে আল্লাহর দিকে লইয়া যায়। তাঁহার দিকে চলার দিকে উৎসাহিত করে। তাঁহার প্রতি তাওয়াক্কুল করাইয়া দেয়। আল্লাহ্ পাক বলেন,

و من يتوكل على الله فهو حسبه *

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে। আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ঠ।" অন্যের মোকাবিলায় আল্লাহ্ পাক তাহাকে সাহায্য করেন। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে বান্দা যে অনুধাবন শক্তি লাভ করে তাহা বান্দার সামনে বন্দেগী ও ইবাদতের রহস্য খুলিয়া দেয়। তাহার দাসত্বের হেকমত তাহার সামনে খুলিয়া যায়। আল্লাহ পাক স্বীয় দাসত্বের সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ কি স্বীয় বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নয়? অবশিষ্ট দশটি সববের সারকথাও এই অনুধাবন। আর অবশিষ্ট সববসমূহ ইহার প্রকার ভেদ।

তৃতীয় সবব ঃ আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ্ ও দান অবতীর্ন হওয়া বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে সহায়ক ও সাহায্যকারী হইয়া থাকে। ইহা এইভাবে হইয়া থাকে যে, পূর্বেই তোমার প্রতি আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ ও নিয়ামত অবতীর্ণ হইয়াছে। এইগুলি স্বরণ করা আল্লাহ্ পাকের আহকাম কবুল করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কেননা, তিনি তোমাকে প্রিয় নিয়ামত দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমার ও তাঁহার প্রিয় হুকুমের প্রতি ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ তাহা পালন করা উচিত। (সুতরাং এই নীতির অনুসরণ) করিলে আহকাম পালন করা সহজতর হইয়া পড়ে)

যেমন আল্লাহ পাক ওহুদের যুদ্ধে আহত সাহাবাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন,

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا *

"তবে কি যখন তোমাদের বিপদ পৌঁছিয়াছে তোমরাও ইতিপূর্বে বর্তমান বিপদের দ্বিগুণ পৌঁছাইয়াছ।" আল্লাহ পাক তাহাদের বিপদের সময় সান্ত্বনা দিয়াছেন এমন একটি নিয়ামত উল্লেখ করিয়া যাহা পূর্বেই তাহাদের অর্জিত হইয়াছিল।

আবার কখনও কখনও বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার সময় আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন জিনিস আসিয়া উপস্থিত হয় যাহা আল্লাহর মকবুল বান্দাদের জন্য বিপদাপদ হালকা করিয়া দেয়। তন্মধ্যে একটি হইল-অবতীর্ণ বিপদের সময়

ধৈর্যধারণ করিলে অনেক সওয়াব অর্জিত হয়।

এই বিশ্বাস বান্দার বিপদ হালকা করিয়া দেয়। তন্মধ্যে আরও একটি হইল, বান্দার বিপদের সময় তাহার অন্তরে ধৈর্যধারণ ও অটল থাকিবার যোগ্যতা ঢালিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে আরও একটি হইল এই যে, বিপদগ্রস্থ বান্দার অন্তরে বিপদাপদ সহ্য করার স্বাদের রহস্যগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনকি অসুস্থ অবস্থায় কোন কোন সাহাবা কেরাম দোআ করিতেন-

তাহাদের অসুস্থতার কষ্ট যেন আরও শক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন আরিফ বলিয়াছেন- 'আমি একবার অসুস্থ হইয়াছি। আমি চাহিতেছি যে, আমার অসুস্থতা যেন না সাড়ে। কেননা, এই অবস্থায় আমার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত অবতীর্ণ হইয়াছে। অদৃশ্যের বিষয়সমূহ আমার সামনে খুলিয়া আসিয়াছে।'

চতুর্থ সবব ঃ আল্লাহ পাক বান্দার জন্য মঙ্গলজনক পক্ষ অবলম্বন করেন। বান্দার এই বিশ্বাস তাহার তাকদীরে লিখা বিষয়সমূহ সহ্য করার প্রতি শক্তি যোগায়। ইহা এইভাবে হয় যে, বান্দা যখন তাহার জন্য আল্লাহ পাকের মঙ্গলজনক পন্থা অবলম্বন করা প্রত্যক্ষ করে তখন তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তিনি বান্দাদের দুঃখ দিতে চান না। কেননা তিনি তাহাদের প্রতি সীমাহীন মেহেরবান। তিনি নিজেই বলেন-

وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا *

'তিনি মুমিনদের প্রতি পরম করুনাময়।'

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুসহ এক মহিলাকে দেখিয়া সাহাবাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি ধারণা হয় যে, এই মহিলা স্বীয় শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে পারিবে? উপস্থিত সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তাহা করিতে পারে না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই মহিলার স্বীয় শিশুর প্রতি যতটুকু মহব্বত রহিয়াছে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আরও অনেক বেশী মহব্বত রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তিনি কখনও কখনও তোমাদের দুঃখ দিয়া থাকেন। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও ইহসান করা।

তোমরা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুন নাই যে, আল্লাহ পাক বলেন, "ধৈর্যধারণকারীদিগকে অগণিতভাবে পুরাপুরি বিনিময় দেওয়া হইবে।"[১]

(১) انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب *

যদি আল্লাহ পাক বান্দাদের নিজের নিয়ন্ত্রনে না রাখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে সোপর্দ করিতেন, তাহা হইলে বান্দারা আল্লাহ পাকের ইহসান ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িত।[১] আল্লাহ পাকের ইহসান ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে বেহেশতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিত না। সুতরাং আল্লাহপাক বান্দাদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া তাহাদের জন্য সর্বক্ষেত্রে মঙ্গলজনক পক্ষ অবলম্বন করার কারণে তাঁহার শুকরিয়া আদায় করিতেছি।

তোমরা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুন নাই যে, আল্লাহ পাক বলিতেছেন, 'হয়ত বা কোন বিষয় তোমাদের কাছে অপছন্দ অথচ তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং হয়তবা কোন বিষয় তোমাদের কাছে খুবই পছন্দ অথচ তাহা তোমাদের জন্য অনষ্টিকর।'

আল্লাহ পাক বান্দাকে দুঃখ দেওয়া সত্ত্বেও তাহার জন্য মঙ্গলজনক পন্থা অবলম্বনের উদাহরণ; পিতা ও পুত্রের উদাহরণ। পিতা পুত্রের প্রতি দয়াশীল হয়। পুত্রের প্রতি তাহার অজস্র দয়া থাকা সত্ত্বেও পুত্রের দেহের ফোঁড়া কাটার জন্য বৈদ্য ডাকিয়া আনে। বৈদ্য ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার ফোঁড়া কাটিয়া দেওয়ার দ্বারা পুত্রকে কষ্ট দেওয়া পিতার উদ্দেশ্য হয় না। বরং তাঁহার কল্যাণ করা উদ্দেশ্য হয়। অনুরূপভাবে মঙ্গলকামী কোন চিকিৎসক তোমাকে তেজ প্রভাব মলম ব্যবহার করিতে দিয়া দুঃখ দেয়। ইহাতে যদিও তোমার কষ্ট হয় কিন্তু ইহাতে তোমার কল্যাণই হইয়া থাকে। যদি এই চিকিৎসক তোমার মতের অনুসরণ করে তাহা হইলে সুস্থতা আর চোখে দেখিবে না। যদি কাহাকেও কোন বস্তু না দেওয়া হয় আর সে জানে যে, তাহাকে ভালবাসে বলিয়া তাঁহার কল্যাণের দিকে খেয়াল করিয়া তাহাকে দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে তাহাকে না দেওয়াই দেওয়া হইল। যেমন; দয়াময়ী মাতা স্বীয় শিশুকে অধিক খাইতে দেয় না শিশুর বদ হজমের আশংকা করিয়া।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, জানিয়া রাখ যে, যদি আল্লাহ পাক তোমাদিগকে কোন কিছু না দেন, তাহা হইলে তাহার এই না দেওয়াটা তাঁহার কৃপণতা নয় বরং ইহা তাঁহার রহমত।

১। কেননা, তখন হয়ত বান্দা নিজের এখতিয়ারে কাজ করিত। আর কার্যে ভুলক্রটি হওয়ার কারণে দুঃখ-কষ্টে পতিত হইত। ফলে দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহর ইহসান ও অনুগ্রহ লাভ হইত না। কিন্তু যদি আল্লাহ নিজে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন তাহা হইলে ইহার বিনিময়ে ইহসান ও অনুগ্রহ লাভ করিবে। (অনুবাদক)

সুতরাং আল্লাহ পাকের না দেওয়াই দেওয়া। কিন্তু না দেওয়াকে দেওয়া বলিয়া ঐ ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে, যে খালেছ বিশুদ্ধ হইতে পারিয়াছে। আমরা অন্য এক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছি যে, যখন কোন ব্যক্তি বুঝে যে, আল্লাহ পাক তাহাকে কোন বিপদে জড়িত করিয়াছেন তখন তাহার বিপদে জড়িত হওয়ার কষ্ট কমিয়া যায়। সুতরাং যে সত্ত্বার পক্ষ হইতে তোমার প্রতি তাকদীর সম্পর্কিত হুকুমগুলি আসিয়াছে তিনিই তো ঐ সত্ত্বা যিনি তোমার সম্পর্কে কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করেন।

পঞ্চম সবর ঃ আল্লাহ সবকিছু দেখেন। বান্দার এই বিশ্বাস আল্লাহর হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে বান্দাকে ধৈর্যশীল বানাইয়া তোলে। ইহা এইভাবে হয় যে, বান্দা যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাকই তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছেন এবং আল্লাহ পাক তাঁহার এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, তখন তাঁহার বিপদের বোঝা অবশ্যই হালকা হইয়া যায়। তোমরা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শোন নাই যে, আল্লাহ পাক বলেন, "স্বীয় পরোয়ারদিগারের হুকুমের উপর ধৈর্যধারণ করুন। কেননা আপনি আমাদের (আল্লাহর) সামনে আছেন।" [১]

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুরায়েশ কাফেররা আপনার প্রতি হিংসাত্মক কার্যকলাপ করিয়াছে; আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছে। তাহা আমার অজানা নয়। এক ব্যক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনা রহিয়াছে যে, তাহাকে নিরানব্বইটি বেত্রাঘাত করা হইয়াছে কিন্তু সে উহঃ পর্যন্ত বলিল না। যখন পরে আর একটি বেত্রাঘাত করিয়া শত পুরা করা হইল তখন উহঃ করিয়া উঠিল। কোন এক ব্যক্তি এইরূপ আচরণের কারণ সম্পর্কে জানিতে চাহিলে সে জবাব দিল যে, যাহার কারণে আমাকে প্রহার করা হইতেছিল, নিরানব্বইটি বেত্রাঘাত করা পর্যন্ত সে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে দেখিতেছিল। তাই আমি ব্যথা অনুভব করিতেছিলাম না। কিন্তু সর্বশেষ বেত্রাঘাতটি করার পূর্বে সে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তাই আমি শেষ বেত্রাঘাতে ব্যথা অনুভব করিতেছিলাম।

ষষ্ঠ সবব ঃ আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যের প্রকাশ তাঁহার কর্মের উপর ধৈর্যশীল বা অবিচল বানাইয়া দেয়। ইহা এইভাবে যে, বান্দার প্রতি কোন তিক্ত বিপদ আপতিত হওয়ার সময় আল্লাহ পাক যখন তাজাল্লী (জ্যোতি) অবতরণ করেন তখন তাজাল্লীর স্বাদে তাঁহার কর্মের কষ্ট দূর হইয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাজাল্লীর অধিক্যতার কারণে কষ্টদায়ক কর্মের কষ্ট পর্যন্ত অনুভূত হয় না।

---

(১) و اصبر لحكم ربك فانك باعيننا *

বিষয়টি বুঝিবার জন্য হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কিত আয়াতটিই যথেষ্ঠ। "যখন নারীরা ইউসুফকে দেখিল; তাহারা তাঁহার বড়ত্ব বর্ণনা করিল এবং নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল।"

সপ্তম সবব ঃ ধৈর্য ধারণের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। বান্দার এই বিশ্বাস তাহাকে আল্লাহর ফয়সালা গ্রহন করার ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল করিয়া তোলে অর্থাৎ দেহমনে প্রস্তুত করিয়া তোলে। ইহা এইভাবে হয় যে, আল্লাহর প্রদত্ত আহকামের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহা পালন করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হয়। সুতরাং অন্তর যখন এমন হইয়া পড়ে, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চাহিদা শক্ত আহকামকে সহ্য করিয়া লয়। যেমন, রোগ মুক্তির আশায় তিক্ত ঔষধও পান করিয়া থাকে।

অষ্টম সবব ঃ পর্দাসমূহ উঠিয়া যাওয়ার ফলে বান্দা তাকদীরের উপর ধৈর্যশীল হইয়া পড়ে। ইহা এইভাবে হয় যে, আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দার উপর অপতিত বিপদাপদ সরাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার আন্তরিক দর্শনের পর্দা উঠাইয়া দেন এবং তাহাকে নিজের নৈকট্য দেখাইয়া দেন। অতঃপর নৈকট্য তাহার উপর এত প্রভাব বিস্তার করে যে, বিপদাপদের কষ্ট পর্যন্ত অনুভূত হয় না।

যদি আল্লাহ পাক জাহান্নামীদের উপর স্বীয় সৌন্দর্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেন তখন জাহান্নামীরাও নিজের আযাবকে আযাব বলিয়া মনে করিবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাক যখন বেহেশতীদের সামনে পর্দা করিয়া লন; তখন বেহেশতের কোন নেয়ামতও তাহাদের কাছে নেয়ামত বলিয়া মনে হইবে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আযাব হইল বান্দা হইতে আল্লাহ পাকের পর্দা করিয়া লওয়া। আর বিভিন্ন প্রকার আযাব ইহারই প্রকাশ। বেহেশতের নেয়ামত হইল তাঁহার তাজাল্লীর প্রকাশ। আর বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত আল্লাহ পাকের তাজাল্লীরই বিভিন্নরূপ।

নবম সবব ঃ আহকামের রহস্য ও ভেদ খুলিয়া সামনে আসিলে আহকাম পালন করার ক্ষেত্রে শক্তির যোগান হয়। ইহা এইভাবে হয় যে, আহকামের দায়িত্ব অবশ্যই একটি ভারী বোঝা বা কঠিন দায়িত্ব। আহকামের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত। ১। আহকাম পালন করা। ২। নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকা। ৩। আহকামের উপর ধৈর্যধারণ করা। ৪। নেয়ামত লাভের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

ইহাদের সাথে চারটি বিষয় সম্পর্কিত রহিয়াছে। যথাক্রমে আনুগত্য,

গোনাহ, বিপদাপদ, নেয়ামত। যেমন আহকাম পালনের সাথে সম্পর্কিত আনুগত্য। নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত গোনাহ। ধৈর্য ধারনের সাথে সম্পর্কিত বিপদাপদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত নেয়ামত। আল্লাহ পাক প্রত্যেক বান্দার প্রতিপালক আর প্রত্যেকে তাঁহার বান্দা। সুতরাং বান্দা হওয়া হিসাবে প্রত্যেকের উপর এই চার বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহ পাকের হক রহিয়াছে। আনুগত্যের ক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্বে আল্লাহর হক হইল, বান্দা তাঁহার ইহসান ও অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করিবে। গোনাহের ক্ষেত্রে হক হইল যে, বান্দা যাহা কিছু নষ্ট করিয়াছে সে সম্পর্কে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। বিপদাপদের ক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্বে আল্লাহর হক হইল, বান্দা বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ করিবে। নেয়ামতের ক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্বে আল্লাহর হক হইল, বান্দা নেয়ামত পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

সুতরাং যখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ইবাদতের লাভ তুমি লাভ করিবে, তখন ইবাদতের জন্য দাঁড়াইয়া যাওয়া তোমার জন্য সহজ হইয়া পড়িবে। আর যখন তুমি জানিতে পারিবে যে, গোনাহ করা থেকে সরিয়া না আসা এবং গোনাহে লিপ্ত হওয়া পরকালে আল্লাহ পাকের গোস্বার এবং ইহকালে ঈমানের নূর মিটিয়া যাওয়ার কারণ হইবে, তখনই তুমি গোনাহ পরিত্যাগ করিবে। অনুরূপভাবে যখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ধৈর্যধারণের সুফল তুমিই লাভ করিবে আর ইহার বরকত তোমার প্রতি ধাবিত হইবে তখন তুমি অবশ্যই ইহার দিকে দৌড়াইয়া যাইতে থাকিবে। ইহার আশ্রয় তালাশ করিতে থাকিবে। আবার যখন তুমি অন্তরে বিশ্বাস জন্মাইয়া লইবে যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। ইরশাদ হইয়াছে-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ *

"যদি তোমরা শোকর কর তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদের বৃদ্ধি করিয়া দিব।" উল্লেখিত বিশ্বাস সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এবং ইহার প্রতি অগ্রসর হওয়ার কারণ হইয়া যাইবে। অত্র গ্রন্থের শেষভাগে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিষয় চতুষ্টয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

দশম সবব ঃ আল্লাহ পাক তাকদীর সম্পর্কিত আহকামসমূহে স্বীয় মেহেরবানী ও ইহসান যতটুকু নিহিত রাখিয়াছেন যখন মানুষ ইহা অবগত হইতে পারে তখন তাহার মধ্যে ধৈর্য আসিয়া পড়ে। ইহা এইভাবে হয় যে, অপছন্দনীয় ও মনের চাহিদার পরিপন্থী জিনিস সমূহের মধ্যে আল্লাহ পাক মেহেরবানী ও অনুগ্রহ গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তোমরা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুনো নাই-

فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ٭

"হয়তোবা কোন জিনিস তোমরা অপছন্দ কর অথচ ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

অনুরূপভাবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ- "জান্নাত বিস্বাদ জিনিসের দ্বারা আর জাহান্নাম মনের চাহিদার অনুকূল জিনিসের দ্বারা সাজানো হইয়াছে।"

বিপদাপদ, রোগশোক ও ভুখা-ফাকার মধ্যে এতোধিক মেহেরবানী গোপনীয় করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সূক্ষ্মদর্শী লোক ব্যতীত অন্য কেহ ইহা বুঝিতে পারে না।

তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, বিপদাপদের দ্বারা প্রবৃত্তি দমিয়া যায় এবং অপদস্থ হইয়া পড়ে। আর স্বাদ ও মজার জিনিসের দ্বারা প্রবৃত্তি লাফাইয়া উঠে। বিপদাপদের সাথে রহিয়াছে অপদস্থতা। আর অপদস্থতার সাথে রহিয়াছে সাহায্য। আল্লাহ সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন-

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ٭

"বদরের ময়দানে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল।"

এই সম্পর্কে আর বেশী আলোচনা করিতে গেলে মূল লক্ষ্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িব তাই পুনরায় উল্লিখিত আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। আয়াতটি হইল-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ ٭

আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার কথা বলা হইয়াছে। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার অবস্থা তিনটি। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পূর্বাবস্থা। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার সময়ের অবস্থা। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পরের অবস্থা। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পূর্বাবস্থায় ইবাদত হইল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা। ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার সময় এবং ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পর ইবাদত হইল অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা পোষন না করা।

অবশ্য কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পর

অন্তরে সংকীর্ণতা পোষণ করার কি অর্থ হইতে পারে। কারণ এমন ব্যক্তিকেই ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা হয় যাহার সম্পর্কে কোন দ্বিধা সংকোচ থাকে না। সুতরাং ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পর অন্তর সংকীর্ণতা মুক্ত করার শর্তারোপ করা ঠিক হয় নাই। এই প্রশ্নের জবাব এই যে, ফয়সালাকারী নির্ধারন করার পর অন্তর সংকীর্ণতা ও সন্দেহমুক্ত হওয়া অপরিহার্য নয়। কেননা, কখনও কখনও এমন হয় যে, বাহ্যিক পরিস্থিতির কারণে কাহাকেও ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা হয় কিন্তু অন্তরের মধ্যে তাহার প্রতি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার পরও আন্তরিক সংকীর্ণতা মুক্ত হওয়া এবং তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফয়সালা গ্রহণ করা অপরিহার্য শর্ত।

অত্র আয়াত সম্পর্কে আরও একটি আপত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তাহা এই যে, অন্তর সংকীর্ণতামুক্ত হইলে তাঁহার ফয়সালা গ্রহণ করিয়া লওয়া তো একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং আয়াতে يسلموا تسليما বলার ফায়দা কি? ইহার জবাব এই যে, উল্লিখিত আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত বিষয়গুলি যেন গ্রহণ করিয়া লওয়া হয়। এই জবাবের উপরও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, আয়াতে حتى يحكموك বলার দ্বারাই তো বুঝা গেল যে, তাঁহার সমস্ত বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে। ইহার জবাব এই যে, ইহা হইতে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাহাকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করার কথা বুঝা যায় না। কেননা এখানে فيما شجر بينهم (অর্থাৎ যে বিষয়ে তাহাদের ঝগড়া হয়) বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, حتى يحكموك বলিয়া সমস্ত কিছুর ফয়সালাকারী বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ইহাতে সমস্ত কিছু গ্রহণ করিয়া লওয়ার কথা বুঝা যায় না। তাই সমস্ত কিছু গ্রহণ করার শর্তারোপ করার জন্য يسلموا تسليما বলা হইয়াছে। সুতরাং অত্র আয়াতে তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

১। নিজেদের ঝগড়া বিবাদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা।

২। তাঁহার ফয়সালায় কোনরূপ সংকীর্ণতা অনুভব না করা।

৩। সর্বক্ষেত্রে তাঁহার কথা মানিয়া লওয়া। অর্থাৎ ঝগড়া বিবাদের ফয়সালার ক্ষেত্রেও আবার নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও তাঁহার কথা মানিয়া লওয়া।

দ্বিতীয় আয়াত

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ * [১]

অত্র আয়াতে কয়েকটি বিশেষ ফায়দার কথা রহিয়াছে।

প্রথম ফায়দা ঃ "আপনার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন।" এই আয়াতাংশ থেকে বুঝা যায় যে, বান্দার জন্য অপরিহার্য যে, বান্দা যেন আল্লাহর মোকাবিলায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে।

কেননা তিনি যখন যাহা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন তখনই তাহা সৃষ্টি করেন। সুতরাং যে ব্যবস্থা গ্রহনের ইচ্ছা করিবেন তাহাই করিবেন। ইহার বাধা দেওয়ার কেহই নাই। আর যে সৃষ্টি করিবার মালিক নহে সে ব্যবস্থা গ্রহণেরও মালিক নহে। সুতরাং অন্য কেহ সৃষ্টি করার মালিক নহে বিধায় ব্যবস্থা গ্রহণেরও মালিক নহে। কুরআনে আসিয়াছে "তবে কি যে সৃষ্টি করিতে পারেন আর যে সৃষ্টি করিতে পারে না উভয় সমান?" তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? [২]

আয়াতাংশের দ্বিতীয় কথা "তিনি যাহা ইচ্ছা পছন্দ করেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোন কিছু পছন্দ করা বা মনোনীত করার ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি কোন কাজ করার জন্য বাধ্য নহেন। বরং স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক করার গুনে গুণান্বিত। অত্র আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বান্দার জন্য অপরিহার্য হইল বান্দা স্বীয় এখতিয়ার ও ব্যবস্থা গ্রহন যেন আল্লাহর এখতিয়ার ও ব্যবস্থা গ্রহণের সামনে রহিত করিয়া দেয়। কারণ আল্লাহ পাকের যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বান্দার তাহা নাই।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশেঃ "তাহাদের কোন এখতিয়ার নাই" ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক- কোন প্রকার এখতিয়ার থাকার যোগ্য তাহারা নহে। অধিকন্তু তাহারা ইহার হকদারও নহে। দুই- আমি তাহাদিগকে কোন এখতিয়ার প্রদান করি নাই এবং তাহাদিগকে ইহার যোগ্যও বানাই নাই।

আয়াতের শেষাংশঃ- "তাহারা আল্লাহ পাকের সাথে যে সকল জিনিসকে

১। আয়াতের অনুবাদঃ এবং আপনার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাহাদের কোন এখতিয়ার নাই। তাহাদের শিরক থেকে আল্লাহ পাক ও পবিত্র।

২। فمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون * ।

শরীক বলিয়া মান্য করে আল্লাহ পাক উহাদের শরীক হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও অনেক উর্দ্ধে।"

অর্থাৎ আল্লাহর সামনে তাহাদের এখতিয়ার চলিবে এমন বিষয় থেকে আল্লাহ পবিত্র। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে তাহাদের কোন এখতিয়ার চলিতে পারে না।

অত্র আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা গেল যে, কেহ আল্লাহ পাকের সাথে কাহাকেও শরীক বলিয়া দাবী করিলে সে মুশরিক। যদিও সে স্বীয় মুখে প্রতিপালক হওয়ার দাবী করে না। কিন্তু সে নিজের মধ্যে এমন অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে যাহা তাহার প্রতিপালক হওয়ার দাবীর প্রমাণ করিতেছে।

তৃতীয় আয়াত– আল্লাহ তাআলা বলেন,

ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة و الاولى *

"তবে কি মানুষের সব আকাঙক্ষাই পুরা হয়? সুতরাং আল্লাহর জন্যই আখেরাত ও দুনিয়া।"

অত্র আয়াতে এই প্রমাণ রহিয়াছে যে, আল্লাহর সামনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ রহিত করিয়া দেওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ পাক বলিতেছেন যে, তবে কি মানুষের সকল আকাঙ্খাই পুরা হয় অর্থাৎ এমন হয় না যে, তাহার সকল আকাঙ্খাই পুরা হইবে। আর ইহা তাহার জন্য শোভনীয়ও নয়। কেননা আমি তাহাদিগকে ইহার মালিক বানাই নাই। অতঃপর আল্লাহ পাক এই বিষয়কে স্বীয় ইরশাদ, "আল্লাহরই জন্য আখেরাত ও দুনিয়া" দ্বারা মজবুত ও সুদৃঢ় করিয়াছেন। অর্থাৎ যখন দুনিয়া আখেরাত উভয় আল্লাহর জন্য তখন মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। সুতরাং তাহার জন্য উচিত নহে যে, অন্যের রাজত্বে সে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার ঐ সত্তারই রহিয়াছে; যিনি উভয় স্থানের মালিক। আর সে মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে প্রতিপালক মানিয়া, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল গ্রহণ করিয়া খুশী হইয়াছে সে ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে।

এই হাদীছ প্রমাণ করিতেছে যে, সকল গুন ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ ও মজা পাইবে না। তাহার ঈমান ছবি সমতুল্য,

প্রাণহীন। বাহ্যিক, অর্থহীন। কাগজের ফুলের ন্যায়। এই হাদীছে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, যে সকল অন্তর গাফিলতির ও প্রবৃত্তির অনুসরণের রোগ হইতে নিরাপদ, সে সকল অন্তর ঈমানের মজা লুটিতেছে। যেমন মজাদার খাদ্য দ্বারা মানবন্তর খুশী হয়। সুখ অনুভব করে। ইহাও তদ্রূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাককে স্বীয় প্রতিপালক মানিয়া লইয়াছে সেই ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। কেননা যখন আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে মানিয়া লইবে তখন তাঁহার সামনে গর্দান ঝুঁকাইয়া দিবে। তাহার নির্দেশের অনুগত হইবে। স্বীয় ক্ষমতা তাঁহার কাছে সমর্পণ করিবে। তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণের সময় নিজের ব্যবস্থা এখতিয়ার পরিত্যাগ করিবে। তখন সে জিন্দেগীর মজা ও আল্লাহর সামনে স্বীয় এখতিয়ার সোপর্দ করার আরাম দেখিতে পাইবে।

যখন আল্লাহকে প্রতিপালক মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট হইবে তখন আল্লাহর পক্ষ হইতেও সন্তুষ্টি পাওয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ *

"আল্লাহ পাক তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে আর তাহারাও আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট।"

যখন আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন তখন তিনি বান্দার মধ্যে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা সৃষ্টি করেন যাহাতে সে আল্লাহ পাকের ইহসান অনুগ্রহ সম্পর্কে জানিতে পারে। আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া বোধ উদয় ব্যতীত হইতে পারে না। নূর ব্যতীত বোধ উদয় হয় না। আল্লাহর নৈকট্য লাভ ব্যতীত নূর লাভ হয় না। আর আল্লাহর রহমত ব্যতীত নৈকট্যও লাভ হয় না। সুতরাং যখন বান্দার দিকে আল্লাহর রহমত ঝুঁকিয়া পড়ে তখন তাঁহার ইহসান ও অনুগ্রহের ভাণ্ডার হইতে সর্বপ্রকার দৌলত বান্দার জন্য প্রকাশ হইতে থাকে।

সুতরাং আল্লাহ পাকের সাহায্য ও নূর যখন বান্দার প্রতি অনবরত আসিতে থাকে তখন তাহার অন্তর রোগ শোক হইতে মুক্তি লাভ করে আর বিশুদ্ধ অনুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠে। সুতরাং বিশুদ্ধ অনুভূতি ও নির্মল আস্বাদন ক্ষমতার কারণে তাহার ঈমানে মজা ও স্বাদ লাভ হইতে থাকে। আর যদি সে আল্লাহ থেকে অমনোযোগী হওয়ার রোগে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে সে ঈমানের মজা ও স্বাদ পাইবে না। ইহার উদাহরণ এইরূপ যে, জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে অধিকাংশ সময় চিনি তিক্ত লাগে। অথচ বাস্তবে চিনি তিক্ত নয়। শুধু তাহার জ্বরের কারণেই তাহার কাছে তিক্ত লাগে। রুগ্ন ঈমান বিশিষ্ট লোকও তদ্রূপ। সুতরাং যখন তাঁহার ঈমানের রোগ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন সে সমস্ত

জিনিসের হাকিকত বুঝিতে পারে। আর ঈমান ও ইবাদতের স্বাদ ও মজা এবং আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন করার ও তাঁহার বিরোধিতা করার তিক্ততা পাইতে থাকে। যখন সে ঈমানের মজা পায় তখন সে খুশী হইয়া যায়। আর আল্লাহ্ পাকের ইহ্সান প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। অতঃপর এমন সব জিনিস অনুসন্ধান করে যাহা দ্বারা ঈমান মজবুত হয় এবং অর্জিত হয়। যখন ইবাদতের মজা পায় তখন ইহা সর্বদা করিতে থাকে এবং ইহাতে আল্লাহ্ পাকের ইহ্সান দেখিতে থাকে। আর যখন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর তিক্ততা অনুভব করে তখন আল্লাহর নাফরমানী বর্জন করে। ইহার দিকে ঝুঁকে না। বরং ইহা ঘৃণা করে। তাহার এই অবস্থা গোনাহ পরিত্যাগ করার এবং গোনাহের দিকে না ঝুঁকিবার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয়। গোনাহ পরিত্যাগ করা এবং গোনাহের দিকে না ঝুঁকা পৃথক পৃথক দুইটি বিষয়। গোনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হইল এই যে, ঈমানদার স্বীয় অর্ন্তদৃষ্টির নূরের মাধ্যমে জানিতে পারে যে আল্লাহ্ পাকের বিরোধিতা করা এবং তাঁহার প্রতি অমনোযোগী হওয়া অন্তরের জন্য বিষস্বরূপ।

বিষমিশ্রিত খাদ্যের প্রতি তোমাদের যেরূপ ঘৃনা হয় মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি এমন ঘৃণার সৃষ্টি হয়

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, وبالاسلام دينا, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। কেননা, ইসলামকে স্বীয় দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ স্বীয় প্রভুর প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিসের উপর সন্তুষ্ট হওয়া। ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ *

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে সত্য দ্বীন হইল ইসলাম।"

অন্য একস্থানে বলিয়াছেন-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ *

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না। "

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ *

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য দ্বীন মনোনীত করিয়াছেন। মুসলমান হওয়া ব্যতীত তোমরা মৃত্যুবরণ করিও না।"

যখন কোন ব্যক্তি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিয়া রাজী থাকিবে তখন ইহার নির্দেশগুলি পালন করা এবং ইহার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হইতে বিরত থাকা তাহার জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু তাহার জন্য জরুরী হইল অন্যান্যদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া, খারাপ কর্ম ও কথা হইতে বিরত রাখা, আর যখন কোন পথভ্রষ্টকে দেখিতে পাইবে যে, দ্বীন নহে এমন জিনিসকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করিতে চায় তখন ইহা বন্ধ করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ জন্মিবে। দলীল প্রমানের দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক ধৌত করিবে; বয়ান বক্তৃতার দ্বারা তাহার এই পথভ্রষ্টতার মূলোৎপাটন করিবে।

উল্লিখিত হাদীছে بمحمد نبيا "মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার উপর সন্তুষ্ট থাকে।" বলা হইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছে তখন তাহার জন্য অপরিহার্য হইল যে, সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত করনেওয়ালা হইবে, তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণ করিবে। পার্থিবতার অনাসক্তি, দুনিয়া হইতে পৃথক থাকা, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করা, তাহার প্রতি খারাপ আচরণকারীকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিবে। অনুরূপভাবে কথাবার্তায়, চলাফেরায়, গ্রহণ-বর্জনে, প্রীতি-ঘৃণায়, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে তাঁহার অনুকরণকারী হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে সে তাঁহার সামনে স্বীয় গর্দান নত করিবে। ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিলে ইসলামের বিধান মোতাবেক আমল করিবে। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে গ্রহণ করিলে তাহার অনুকরণ করিবে।

উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে যদি কোন একটি না পাওয়া যায় আর অবশিষ্ট দুইটি পাওয়া যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, একটিও পাওয়া যায় নাই। কেননা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজী না হইয়া আল্লাহকে প্রতিপালক মানিয়া লওয়ার দাবী অসম্ভব। আবার মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানিয়া লইতে রাজী না হইয়া ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মানিয়া লওয়ার দাবীও অসম্ভব। ইহাদের প্রত্যেকটি একে অপরের জন্য অপরিহার্য।

ইহার পর জ্ঞাতব্য বিষয় হইল একীনের পর্যায়ের আলোচনা। একীনের পর্যায় নয়টি। তাওবা, পার্থিবতা ত্যাগ, ধৈর্যধারণ, শুকরিয়া, ভয়, সন্তুষ্ট থাকা, আশা করা, তাওয়াক্কুল, মহব্বত। উল্লেখিত পর্যায়গুলির মধ্যে কোন একটি

পর্যায়ও ব্যবস্থা গ্রহণ ও বর্জন করা স্বীয় এখতিয়ার বর্জন করা ব্যতীত সহীহ হইতে পারে না।

যেমন, তাওবা। তাওবাকারী স্বীয় গোনাহ হইতে তাওবা করা অপরিহার্য। অনুরূপভাবে স্বীয় পরোয়ারদিগারের ব্যবস্থা গ্রহণের সামনে স্বীয় ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে তাওবা করাও অপরিহার্য। কেননা আল্লাহর ব্যবস্থা গ্রহণের সামনে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বীয় এখতিয়ার থাকা অন্তরের বড় বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

তাওবার অর্থ আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় বিষয় হইতে ফিরিয়া আসা। আল্লাহ পাকের নির্ধারনের সামনে ব্যবস্থা গ্রহণ আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইহা আল্লাহ পাকের প্রতিপালন নামক গুণের মধ্যে শিরক করা। বিবেক নামক নিয়ামতের না শুকরিয়া করা। বান্দাদের না শুকরিয়া আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না।

সুতরাং পার্থিব ব্যবস্থা গ্রহণে লিপ্ত ও স্বীয় মনিবের মঙ্গলময় বিবেচনা হইতে অমনোযোগী ব্যক্তির তাওবা কিভাবে সহীহ হইতে পারে?

অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নির্ধারনের পরও ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে পৃথক না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পার্থিবতা ত্যাগ করাও বিশুদ্ধ হইবে না। কেননা যে সব জিনিসকে মুক্ত হওয়ার এবং অনাসক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণও একটি। সুতরাং ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে পৃথক থাকা জরুরী।

পার্থিবতা ত্যাগ দুইভাবে হয়। এক বাহ্যিক ত্যাগ অপর গোপনীয় ত্যাগ। বাহ্যিকভাবে পার্থিবতা ত্যাগ বলিতে পানাহার, পরিধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনতিরিক্ত জিনিসের প্রতি অনাসক্তি থাকাকে বুঝায়। আর গোপনীয় পার্থিবতা ত্যাগ বলিতে প্রাধান্যতা, নেতৃত্ব, খ্যাতি প্রভৃতির প্রতি আকাঙ্খা না থাকাকে বুঝায়। আল্লাহর নির্ধারণের পরও ব্যবস্থা গ্রহণ ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ ত্যাগ না করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ এবং শুকরিয়া আদায়ও বিশুদ্ধ হয় না

আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ধৈর্যধারন করে (অর্থাৎ সেগুলি হইতে বিরত থাকে) প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই ধৈর্যধারণকারী। আল্লাহ পাকের সামনে স্বীয় এখতিয়ার থাকা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তাঁহার অপছন্দনীয়। কেননা ধৈর্যধারন কয়েকভাবে হইয়া থাকে। যেমন ১। হারাম

জিনিসসমূহ থেকে ধৈর্যধারন করা। ২। অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ পালন করার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করা। ৩। আল্লাহ পাকের সামনে স্বীয় এখতিয়ার বজায় রাখা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে ধৈর্যধারন করা। অর্থাৎ এখতিয়ার না রাখা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। অথবা ধৈর্যধারণের প্রকার ভেদ এইভাবেও বর্ণনা করা যায় যে, ধৈর্যধারণ মোটামুটি দুই প্রকার। এক মানবীয় চাহিদা পরিহার করার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা। দুই, বন্দেগীর অপরিহার্য বিষয়সমূহ পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সামনে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ বর্জন করা ও বন্দেগীর অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সামনে ব্যবস্থা গ্রহণ বর্জন না করে তাহার শুকরিয়াও বিশুদ্ধ হইবে না। হযরত জুনায়েদ (রহঃ)-এর অভিমত মোতাবেক শুকরিয়া হইল আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহকে তাঁহার নাফরমানীর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ না করা।

জড় পদার্থসমূহ ও পশু পক্ষীসমূহ ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। আর ইহারা বিবেকহীন। বিবেক খুব মূল্যবান জিনিস। ইহার দ্বারা মানুষ অন্যান্য সমস্ত কিছু থেকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহা তাহাদের পূর্ণতার উপায়। ইহার মাধ্যমে শেষ পরিণাম চিন্তা করা যায়। এত মূল্যবান সম্পদ থাকার পরও মানুষ আল্লাহ পাকের সামনে ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এত মূল্যবান সম্পদকে তাহার নাফরমানী অর্থাৎ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। ব্যবস্থা অবলম্বন করা আল্লাহ পাকের ভয় পোষণ করার পরিপন্থী। কেননা যখন অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকে তখন তাহাকে এতটুকু সুযোগ দেয় না যে, সে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

আল্লাহর প্রতি যাহার প্রবল আশা রহিয়াছে তাহার অবস্থাও তদ্রূপ। কারণ তাহার আশা সর্বদা তাহাকে খুশীতে ভরপুর করিয়া রাখে। তাহার সময়গুলি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে নিয়োজিত থাকে। সুতরাং তাহার কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ কোথায়?

ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থী। কেননা যে ব্যক্তি স্বীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ করে এবং স্বীয় সর্বকার্যে তাঁহার প্রতি নির্ভর করে সে ব্যক্তি তাওয়াক্কুলকারী। সুতরাং ইহার জন্য অপরিহার্য হইল ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা আর তাঁহার হুকুম পালনে নতশীল হইয়া যাওয়া।

আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করা এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সাথে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার সম্পর্ক অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইহার সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক পরিস্কার ও উজ্জ্বল।

ব্যবস্থা অবলম্বন করা আল্লাহর মহব্বতেরও পরিপন্থী। কেননা প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রেমে নিমজ্জিত থাকে। প্রেমিকের এই অবস্থার চাহিদা হইল এই যে, প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের সামনে স্বীয় সর্বপ্রকার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং প্রেমিকের ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন সুযোগই থাকিবে না। কেননা আল্লাহর প্রেম তাহাকে এই দিক থেকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিশেষ মহব্বতের সামান্য মজাও পাইয়াছে সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকারও পরিপন্থী। ব্যবস্থা অবলম্বন এই ক্ষেত্রে পরিপন্থী হওয়া অধিকতর পরিষ্কার ও উজ্জ্বল বিষয়। ইহাতে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই। এইজন্য যে, যখন কোন ব্যক্তির আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকার যোগ্যতা অর্জিত হইয়াছে। সে আল্লাহ পাকের ভবিষ্যত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। সুতরাং সে নিজে কেন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে? কেননা সে তো আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সন্তুষ্টই হইয়াছে। তোমাদের কি এই খবর নাই যে, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার নূর অন্তর থেকে ব্যবস্থা অবলম্বনের ময়লা আবর্জনা ধৌত করিয়া দেয়? সুতরাং সন্তুষ্ট ব্যক্তি সন্তুষ্টির নূরের প্রভাবে স্বীয় প্রভুর আহকাম পালনে খুশী। সে প্রভুর সামনে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। গোলামের জন্য তাহার মনিবের সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণই উত্তম।

ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার কারণ সমূহের বিবরণ

ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার ও এখতিয়ার পরিহার করার কয়েকটি কারণ রহিয়াছে।

প্রথম কারণ ঃ তোমার এই বিশ্বাস যে, প্রথম থেকেই আল্লাহ পাক তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি যখন তোমার ছিলে না তখনও আল্লাহ পাক তোমার ছিলেন। যখন তোমার অস্তিত্ব ছিল না তখন তো তোমার জন্য তোমার নিজের কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা ছিল না তখনও আল্লাহ পাক তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমার সব বিষয়ের ব্যবস্থাপক ছিলেন। অনুরূপভাবে তোমার অস্তিত্বের পরও তিনি তোমার সব কিছুর ব্যবস্থাপক। তুমি আল্লাহর সাথে এমন হইয়া থাক যেমন তুমি পূর্বে ছিলে। তাহা হইলে তিনিও তোমার জন্য এমন থাকিবেন যেমন পূর্বে ছিলেন। এই জন্যই হুসায়ন হাল্লাজ দোয়া করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য

এমন হইয়া যান যেমনি আপনি আমার অস্তিত্বের পূর্বে আমার জন্য ছিলেন। তাহার দোয়ার সারকথা হইল হে আল্লাহ! আমার অস্তিত্বের পূর্বে আপনি আমার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার অস্তিত্বের পরেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

যখন বান্দার অস্তিত্ব ছিল না যে সে নিজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করিতে পারে এই ক্ষেত্রে তাহার সাহায্য হইতে পারে তখনও আল্লাহর পাকের ইলমে বান্দার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বান্দার অস্তিত্বের পূর্বেই আল্লাহ পাক তাহার জন্য সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, বান্দার অস্তিত্বের পূর্বে তো অনস্তিত্ব ছিল। কোন কিছু ছিল না। সুতরাং কিসের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে? ইহার উত্তর হইল যে, অস্তিত্ব আসার পূর্বে সবকিছুই আল্লাহ পাকের ইলমে মওজুদ ছিল। যদিও তখন পর্যন্ত বাস্তবক্ষেত্রে ইহারা মওজুদ ছিল না। সুতরাং যখন ইহারা আল্লাহ পাকের ইলমের জগতে মওজুদ ছিল তখন তিনি ইহাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা খুব চিন্তা করিয়া দেখার বিষয়। এখানে ইহার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই।

বিবরণ ঃ আল্লাহ পাক সর্বদিক দিয়া তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জিম্মাদার। সর্বাবস্থায় তোমার অস্তিত্ব দানের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়াছেন। অঙ্গীকার গ্রহণের দিনও তোমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। সে দিনে সকল মানুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তখন সকলেই একবাক্যে জবাব দিয়াছিল, কেন নহেন? অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক। তখন তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি তোমার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। তখন তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলে। তোমাকে স্বীয় নূর দেখাইয়াছিলেন। তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে। তোমাকে কথা বলিতে শিখাইয়াছিলেন। তোমার অন্তরে তাঁহার প্রতিপালনের স্বীকৃতির কথা প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। তখন তুমি তাঁহার অদ্বিতীয়তার স্বীকৃতি দিয়াছিলে। অতঃপর তোমাকে বীর্যের আকারে বাপ দাদার মেরুদন্ডে রাখিয়াছিলেন। সেখানেও তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার হেফাজত করিয়াছেন। যেখানে ছিলে তোমার হেফাজত করিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তির মধ্যেই ছিলে সেখান থেকে একের পীঠ হইতে অপরের পীঠে পৌঁছাইয়াছেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে এই ধারাবাহিকতা শুরু হইয়া তোমার পিতা পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছাইয়াছেন। অতঃপর তোমার পিতা হইতে তোমার মাতার জরায়ুতে পৌঁছাইয়াছেন। সেখানে তোমার অস্তিত্বের জন্য

পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। জরায়ুতে এক প্রকার যোগ্যতা রাখিয়া ইহাকে একটি উর্বরা জমির ন্যায় করিয়াছেন যাহাতে তুমি সেখানে হৃষ্টপুষ্ট হইতে পার। ইহাকে আমনত রাখা এমন স্থানে পরিণত করিয়াছেন যাহাতে এইস্থানে রাখিয়া তোমাকে জীবন দান করা যায়। অতঃপর এইস্থানে মাতাপিতা উভয়ের বীর্যের মিলন ঘটাইয়াছেন। ফলে তুমি জন্মলাভ করিয়াছ। ইহাতে আল্লাহ্র বিশেষ হিকমত রহিয়াছে যে, গোটা সৃষ্টি জাতির অস্তিত্ব বৈবাহিক সম্পর্কের মাঝে গচ্ছিত। অতঃপর এই বীর্য থেকে তোমাকে জমাটবাধা রক্তে পরিনত করা হইয়াছে। আর এই জমাটবাধা রক্তে এমন গুন ও বৈশিষ্ট্য রাখা হইয়াছে যাহা দ্বারা তোমার জন্মের পরবর্তী পর্যায়গুলি সুষ্ঠ ও সুন্দর হইয়া উঠে। অতঃপর জমাট বাধা রক্ত গোশতের টুকরায় পরিনত করা হইয়াছে। আর এই টুকরায় তোমার আকৃতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমার ভিত্তি রচনা করা হইয়াছে। অতঃপর তোমার মধ্যে ফুঁক দিয়া রূহ প্রবিষ্ট করানো হইয়াছে। আর মাতৃগর্ভে তাহার হায়েযের রক্ত দ্বারা তোমাকে খাদ্য দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে তুমি ভুমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তোমার খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার পর তোমাকে মাতৃগর্ভে ছাড়িয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে থাকিয়া তোমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সুদৃঢ় ও শক্ত হইয়াছে। হাত পা মজবুত হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে তুমি এমন স্থানে আসার যোগ্যতা অর্জন কর যেখানে তোমার লাভ-লোকসান রহিয়াছে। যাহাতে তোমাকে এমন ঘরের দিকে লইয়া আসিতে পারেন যেখানে তিনি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাকে নিজের সাথে পরিচয় করাইতে পারেন। অতঃপর তিনি তোমাকে ভূপৃষ্ঠে আনয়ন করিয়াছেন। তখন তিনি অবগত ছিলেন যে, তুমি কোন শক্ত খাবার খাইতে সক্ষম নহে এবং তোমার দাঁত নাই। অধিকন্তু তোমার এমন কোন মাড়ি নাই যাহা দ্বারা তুমি খাদ্য খাইতে পার। তাই মাতার বুকে নরম ও মজাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন। মাতার অন্তরে এমন মমতা ভরপুর করিয়া দিলেন যাহা দ্বারা তোমাকে দুধপান করানোর জন্য মাতা ব্যাকুল হইয়া উঠেন। যখন দুধ বাহির হওয়া থামিয়া যায় তখন মাতৃমমতা মাতাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। আর মাতার মধ্যে এমন ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় যাহাতে কখনও ভাটা আসে না। আর মাতা তোমার জন্য এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া পড়েন যাহা কখনও থামিয়া যায় না। অতঃপর মাতাপিতাকে এমন সব কার্যে লাগাইয়া দেন যাহা দ্বারা তোমার জন্য উপকারী জিনিসসমূহ লাভ হয় এবং তাহারা তোমার প্রতি মেহেরবান হন। তোমাকে স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টিতে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্নেহ ও মমতা এমন এক সত্ত্বার স্নেহ ও মমতা যিনি ইহা তোমার প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি প্রেরণ করার জন্য

পিতামাতাকে প্রকাশস্থল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাতে এই সত্ত্বা তোমার কাছে মহব্বতকারী হিসাবে পরিচিত হন। আর তুমি জানিয়া লইতে পার যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রতিপালন ব্যতীত তোমার অন্য কোন প্রতিভু নাই। তাঁহার খোদায়ীত্ব ব্যতীত তোমার অন্য কোন প্রতিপালনকারী নাই। অতঃপর তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তোমার দেখাশুনা করা পিতামাতার অপরিহার্য কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় দয়ার মাধ্যমে ইহা তাহাদের উপর ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। আর তোমার পুরাপুরি বুঝ শক্তি আসা পর্যন্ত তোমার কার্যক্রমের অপরাধ মার্জন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর যৌবনে পদার্পন পর্যন্ত তোমার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ, করুনা ও ইহসান সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। এইভাবে তোমার বার্ধক্য পর্যন্ত বরং জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত স্বীয় অনুগ্রহ ও করুনার মধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন। যখন তুমি মৃত্যু বরণ করিবে ও পরে জীবিত হইয়া কিয়ামতের ময়দানে উঠিবে আর তোমাকে আল্লাহ পাকের সম্মুখে খাড়া করা হইবে এবং স্বীয় আযাব ও শাস্তি হইতে তোমাকে বাঁচাইয়া দিবেন। অতঃপর তোমাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিবেন। তোমার সম্মুখ হইতে স্বীয় পর্দা উঠাইয়া দিবেন এবং স্বীয় বন্ধু ও আশেকদের মজলিসে তোমাকে বসাইবেন। যেমন কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক নিজেই বলিয়াছেন-

"পরহেজগার লোকেরা সর্বশক্তিমান বাদশাহের কাছে সত্য মজলিসে বেহেশত ও ঝর্ণাসমূহে থাকিবে।" অর্থাৎ সর্বস্থানে তোমার প্রতি আল্লাহ পাকের কোন ইহসানের শুকরিয়া আদায় করিতে পারিবে আর কোন নিয়ামতের বর্ণনা সক্ষম হইবে? দেখ আল্লাহ পাক বলিতেছেন-

و ما بكم من نعمة فمن الله *

"তোমাদের কাছে যে সকল নিয়ামত রহিয়াছে এই সব কিছু আল্লাহরই নিয়ামত।"

সুতরাং বুঝা গেল যে, তুমি কখনও তাঁহার ইহসানের বাহিরে যাইতে পার নাই। আর কখনও পারিবেও না। তাঁহার অনুগ্রহ ও করুণা কখনও তোমার থেকে পৃথক হইতে পারে না। যদি তোমার উল্লিখিত পরিবর্তন ও বিবর্তনের কথা আল্লাহ পাকের কুরআন হইতে জানিতে চাও তাহা হইলে আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুন-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ * ثُمَّ

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ *

নিশ্চয়ই আমি আদমকে মাটির সার পদার্থ থেকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর আমি তাহাকে অবস্থানস্থলে বীর্য হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর বীর্য হইতে জমাট বাধা রক্তে পরিনত করিয়াছি। অতঃপর জমাটবাধা রক্তকে গোশতের টুকরায় পরিণত করিয়াছি। অতঃপর গোশতের টুকরাকে হাড় বানাইয়াছি। আর হাড়ে গোশত জড়াইয়াছি। অতঃপর আমি ইহাকে দ্বিতীয় জন্ম দিয়াছি। (অর্থাৎ ইহাতে রূহ প্রবিষ্ট করাইয়াছি।) অতএব আল্লাহ পাক খুব বরকতময়। সর্বপ্রকার প্রস্তুতকারী অপেক্ষা আল্লাহ পাক উত্তম। অতঃপর তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতঃপর কিয়ামতের দিনে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা হইবে।

ফায়দা ঃ আয়াত সমূহের জ্যোতি তোমার প্রতি বিচ্ছুরিত হইবে। ইহার কিরণের প্রভাব তোমার প্রতি পড়িবে। ইহাতে বর্ণিত বিষয় তোমার শির নত করিবে। তোমাকে তাওয়াক্কুল শিক্ষা দিবে। ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করিবার এবং তকদীরের মোকাবিলা না করিবার দিকে তোমাকে পথ প্রদর্শন করিবে। তৌফিক দেওয়া তো আল্লাহর কাজ।

দ্বিতীয় কারণ ঃ নিজের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রমাণ করে যে, সে নিজের লাভের বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা মুমিনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিজের জন্য স্বীয় ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করে তখন আল্লাহ পাক তাহার জন্য আরও উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ *

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ঠ।"

সুতরাং তোমার ব্যবস্থা অবলম্বন এই যে, তুমি যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাক। আর তোমার নিজের মঙ্গল কামনা এই যে, তুমি ইহার ফিকিরই না কর।

এখানে আল্লাহ পাকের নিম্নোল্লেখিত বাণীটি বুঝিয়া লও, আল্লাহ পাক বলেন-

তোমরা ঘরে আস, ইহাদের দরজা দিয়া। সুতরাং ব্যবস্থা অবলম্বনের দরজা

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে ইহাই যে, নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিও না।

তৃতীয় কারণ ঃ তাকদীর গৃহীত ব্যবস্থা মোতাবেক জারী হওয়া জরুরী নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন কার্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে যাহার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। আর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এমন কার্যও অনেক ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয় না। বুদ্ধিমান লোক ঠিকানাবিহীন ঘর বানায় না। সুতরাং তোমার সৌধ পুরা হওয়ার পূর্বেই তাকদীর ইহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে এবং ইহা পুরা হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে। কবির ভাষায়-

☆ ইমারত কখন পুরা হয় যাহা তুমি নির্মাণ করিতেছ।

☆ কিন্তু এখানে হইতেছে অন্য কাজ সে ইহার পতন ঘটাইতেছে।

যখন তুমি কোন বিষয়ের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কর আর তাকদীর ও তোমার গৃহীত ব্যবস্থার পরিপন্থী জারী হয়। সুতরাং তাকদীর যে ব্যবস্থার সহায়তা না করে এমন ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা কি লাভ? ব্যবস্থা তো এমন সত্ত্বা গ্রহণ করিতে পারে তাকদীরের রজ্জু যাহার হাতে রহিয়াছে। কবির ভাষায়-

☆ যখন আমি তাকদীরকে প্রভাবশীল পাইয়াছি।

☆ আর ইহা প্রভাবশীল হওয়াতে কোন রূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

☆ তখন মহান সৃষ্টিকর্তার উপর করিয়াছি নির্ভর।

☆ যে দিকে তাহা জারী হয় সে দিকে নিজে চলিয়াছি।

চতুর্থ কারণ ঃ আল্লাহ পাক নিজেই স্বীয় রাজত্বের ব্যবস্থা গ্রহণের জিম্মাদার। উন্নতির দিক হোক বা অবনতির দিক হোক; দৃশ্যমান বিষয়ের হোক বা অদৃশ্য বিষয়ের হোক সবকিছুর তিনিই জিম্মাদার। আরশ, কুরসী, আসমান, যমীন সবকিছুর ব্যবস্থা তিনিই করেন। যেহেতু তুমি স্বীকার করিতেছ যে, তিনিই এইসব কিছুর ব্যবস্থাপক তবে তোমার অস্তিত্বের তিনিই ব্যবস্থাপক ইহাও স্বীকার করিয়া লও; কেননা এই মহাবিশ্বের তুলনায় তোমার অস্তিত্ব এতছোট যে, তুমি হিসাবেরও তুল্য নহে। যেমন সাত আসমান ও সাত যমীন কুরসীর তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে কোন এক বিশাল প্রান্তরে যেন ক্ষুদ্র একটি চুড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অনুরূপভাবে কুরসী, সাত আসমান ও সাত যমীনের সমষ্টি আরশের তুলনায়ও তদ্রূপ ক্ষুদ্র। সুতরাং আল্লাহর এই মহা বিশ্বে তোমার কি হিসাব হইতে পারে? যেহেতু আল্লাহ পাক এই মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপক। আর তুমি এত ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও তোমার সম্পর্কে তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণের উপর নির্ভর না করিয়া যদি তুমি নিজের চিন্তায় লাগিয়া যাও এবং নিজের জন্য ব্যবস্থা

অবলম্বন করিতে থাক, তাহা হইলে ইহা হইবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতার প্রমাণ। বরং প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার ইহাই যাহা আল্লাহ পাক নিজেই বলিয়াছেন-

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ *

"আল্লাহ পাককে যেভাবে কদর করা তাহাদের দায়িত্ব ছিল তাহারা তাহাকে সেভাবে কদর করে নাই।"

যদি বান্দা স্বীয় প্রভুর পরিচয় লাভ করে তাহা হইলে তাহার সামনে যে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে। যেহেতু তুমি খোদা তাআলার পরিচয় লাভ কর নাই বরং তাহার পরিচয়ও তোমার মধ্যে পর্দা পড়িয়া রহিয়াছে আর ইহাই তোমাকে ব্যবস্থা অবলম্বনের সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

একীনওয়ালা ব্যক্তিদের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এই পর্দা উঠিয়া যায়। ফলে তাহারা নিজেদের সম্পর্কে দেখিতে পায় যে, তাহাদের ব্যবস্থা অন্য কেহ করিতেছে। তাহারা নিজেরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। বরং তাহাদেরকে অন্য কেহ পরিচালনা করিতেছে। তাহারা নিজেরা নিজেদের পরিচালনা করিতে পারিতেছে না। তাহাদিগকে অন্য কেহ গতিশীল করিতেছে। তাহারা নিজেরা নিজকে গতিশীল করিতে পারিতেছে না। অনুরূপভাবে আসমানে বসবাসকারীগণ আল্লাহ্ পাকের কুদরতের প্রকাশ, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিফলন, যাহার কাছে তাঁহার কুদরত সম্পর্কিত হইবে ইহার সাথে কুদরত সম্পর্কিত হওয়া, যাহার সাথে তাঁহার ইচ্ছা সম্পর্কিত হইবে উহার সাথে ইচ্ছার সম্পর্কিত হওয়া প্রভৃতি সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আল্লাহর জন্য কোন মাধ্যমের কোন প্রয়োজন নাই। সবকিছু তাঁহারই হাতে। আসমান-যমীন উভয়স্থানে পরিপূর্ণ ব্যবস্থাগ্রহণ তাঁহারই হস্তে ন্যাস্ত।

সুতরাং আসমান যমীনের ক্ষেত্রে যখন তুমি আল্লাহ্ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছ। অনুরূপভাবে তোমার অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও ইহা স্বীকার করিয়া লও।

কেননা তুমি তো আসমান যমীন অপেক্ষা নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র সৃষ্টি। অতএব বৃহৎ সৃষ্টির পর ক্ষুদ্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই মানিয়া লওয়া উচিত।

পঞ্চম বিষয় ঃ তুমি আল্লাহর মালিকানাধীন। সুতরাং যে জিনিস অন্যের মালিকানাধীন সে জিনিস সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার তোমার

নাই। তুমি যে জিনিসের মালিক সে জিনিস সম্পর্কে তোমার সাথে কোন ব্যক্তি ঝগড়া করার হক রাখে না। অথচ তোমার মালিকানা প্রকৃত মালিকানা নহে। তোমাকে মালিক বানানো হইয়াছে বলিয়া তুমি মালিক। শুধু একটি শরয়ী সম্পর্ক যাহার কারণে তুমি ইহার মালিক, তুমি যে জিনিসের মালিক হইয়াছ তাহা এমন নহে যে তোমার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আল্লাহর মালিকানাধীন কোন জিনিস সম্পর্কে তাঁহার সাথে ঝগড়া বাধাইয়া দেওয়া তো আরও অধিক অনুচিত হইবে। বিশেষ করিয়া আল্লাহ পাক যখন ঘোষণা করিয়াছেন-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ *

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের থেকে তাহাদের জান ও মাল খরিদ করিয়া লইয়াছে।"

সুতরাং জান ও মাল বিক্রিত হইয়া যাওয়ার পর এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও বিতর্ক করা উচিত নহে। কেননা যে জিনিস তুমি বিক্রি করিয়া দিয়াছ; উহা ক্রেতার হাতে সোপর্দ করা আর এই সম্পর্কে কোন ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক সৃষ্টি না করা তোমার অপরিহার্য কর্তব্য। ইহার পরেও ইহা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও স্বীয় ক্ষমতা খাটানোর চেষ্টা করা বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করার শামিল।

একদা আমি আবুল আব্বাস মুরসী (রঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া কোন একটি ঘটনা সম্পর্কে বিচার দায়ের করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, যদি তোমার নফসের মালিক তুমি হও, তাহা হইলে ইহার সাথে তোমার যাহা মনে চায় তাহাই কর। অবশ্য তুমি তাহা পারিবে না। আর যদি মনে কর যে, সৃষ্টিকর্তা ইহার মালিক। তাহা হইলে ইহা মানিয়া লও যে তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিবেন। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন, তবে বিষয়টি আল্লাহর সোপর্দ করা আর এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা পরিহার করার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি রহিয়াছে। আর বন্দেগীর অর্থও ইহাই।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) থেকে এক ঘটনা বিবৃত আছে। তিনি বলেন, এক রাত্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ফলে আমার দৈনন্দিন আমল কাযা হইয়া পড়িয়াছিল। আমি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া খুব লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর তিনদিন এইভাবে ঘুমাইয়া পড়িলাম যে, আমার ফরয পর্যন্ত কাযা হইয়া পড়িল। আমি জাগ্রত হওয়ার পর অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম।

সর্বপ্রকার গোনাহ আমি ক্ষমা করি কিন্তু আমার থেকে মুখ ফিরাইয়া লওয়া অধিকতর মারাত্মক অপরাধ।

তোমার ইবাদত অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহাতো মাফ করিয়া দিয়াছি।

তবে ইহার বিনিময় সঞ্চিত রহিয়াছে।

অতঃপর আমাকে নির্দেশ দেয়া হল যে, হে ইবরাহীম তুমি বান্দা (দাস) হইয়া থাক। তখন আমি বান্দা হইয়া রহিলাম। ফলে আমার অন্তর শান্ত হইয়া গেল

ষষ্ঠ বিষয় ঃ তুমি আল্লাহর মেহমান। কেননা এই দুনিয়া আল্লাহর ঘর। তুমি এখানে আসিয়া মেহমান হইয়াছ। মেজবান (নিয়ন্ত্রনকারী) যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মেহমানের কোন প্রকার চিন্তায় নিমজ্জিত না হওয়া উচিত। কেননা তাহার ব্যাপারে মেজবান তৎপর রহিয়াছে এবং তাহার খানাপিনা ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করায় সে সম্পূর্ণ তৎপর।

শায়খ আবু মাদইয়ান (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, হযরত! আমরা অন্যান্য মাশায়েখদেরকে দেখিতেছি যে, তাহারা জীবিকা নির্বাহের কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আছেন। আর আপনি ইহা অবলম্বন হইতে বিরত থাকিতেছেন, ইহার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, হে ভ্রাতা! ইনসাফের সাথে কথা বল! দুনিয়া আল্লাহর ঘর! আর আমরা তাঁহার মেহমান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মেহমানদারী তিনদিন পর্যন্ত হয়। সুতরাং আমরাও তিনদিনের জন্য আল্লাহ পাকের মেহমান। অধিকন্তু আল্লাহ পাক বলেন, যে তোমার প্রতিপালকের কাছে এক দিবস তোমাদের গণতি হিসাবে এক হাযার বৎসরের সমান। এই হিসাবে তিন দিবসের পরিমাণ মোট তিন হাজার বৎসরের সমান হয়। সুতরাং আমরা তিনহাযার বৎসরের জন্য আল্লাহ পাকের মেহমান সাব্যস্ত হইয়াছি। ইহার একাংশ আমরা দুনিয়াতে অবস্থান করিব আর অবশিষ্ট সময় তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরকালে পুরা করিবেন। আর বেহেশতে চিরদিন রাখার ফয়সালা তাঁহার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ।

সপ্তম বিষয়ঃ- বান্দা সর্ব জিনিসে আল্লাহ পাকের কায়েম রাখার গুণকে দেখিবে। তুমি কি তাঁহার বাণী শুন নাই

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ *

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব। কায়েম রাখনেওয়ালা। সুতরাং আল্লাহ পাক দুনিয়ার কায়েম রাখনেওয়ালা এবং আখেরাতেরও কায়েম রাখনেওয়ালা।

দুনিয়ার কায়েম রাখনেওয়ালা হইলেন রিযক এবং নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে। আর আখেরাতের কায়েম রাখনেওয়ালা হইলেন আমলের বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে। সুতরাং বান্দা যখন স্বীয় প্রভুর কায়েম রাখার গুনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে স্বীয় এখতিয়ার ও ইচ্ছা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করিয়া দিবে এবং নিজকে তাঁহার অনুগত ও হুকুমের অপেক্ষমান মনে করিয়া তাঁহার সামনে নিজকে নত করিয়া রাখিবে।

অষ্টম বিষয় ঃ বান্দা স্বীয় পূর্ণ জীবন আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করায় নিয়োজিত করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে দলীল হইল আল্লাহ পাকের বাণী

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ *

"আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করুন।"

সুতরাং বান্দা স্বীয় পূর্ণ জীবন ইবাদত করার জন্য নিয়োগ করিলে উপায় অবলম্বন করার এবং ইহার ফিকির করার সুযোগও পাইবে না।

শায়খ আবুল হাসান (রঃ) বলেন, তোমার উপর আল্লাহ পাকের হক রহিয়াছে যে, তুমি সর্বদা আল্লাহ পাকের ইবাদত করিবে। আল্লাহ পাক তোমার প্রতিপালক। আর তোমার উপর তাঁহার ইবাদতের হক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার তিনি প্রতিপালন করেন বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতিপালনের চাহিদা। বান্দা থেকে ইবাদতের হিসাব লওয়া হইবে। সুতরাং এই হক সম্পর্কে; এমনকি তাহার প্রতিটি শ্বাস সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে।

সুতরাং বিবেকবান ব্যক্তি আল্লাহর হক আদায় করিয়া নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার এবং স্বীয় সমস্যাসমূহ সমাধান করার সুযোগ কোথায় পাইবে?

বান্দা নিজের সম্পর্কে বেফিকির হওয়া ব্যতীত, নিজের সমস্যা থেকে মুখ ফিরাইয়া স্বীয় পূর্ণ শক্তি আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসের প্রতি ব্যয় করা ব্যতীত, তাঁহার আনুকূল্যের মাধ্যম অধিক অর্জন করা ব্যতীত এবং তাঁহার খেদমত ও তাঁহার প্রদত্ত কার্যে সর্বদা নিয়োজিত থাকা ব্যতীত তাঁহার পূর্ণ অনুগ্রহ পর্যন্ত কেহই পৌঁছিতে পারে না।

সুতরাং তুমি নিজ থেকে যতটুকু দূরত্বে থাকিবে ততটুকু আল্লাহ পাকের কাছে থাকার সুযোগ অর্জিত হইবে। এইজন্যই শায়খ আবুল হাসান (রঃ) বলেন, হে মুক্তির পথে ধাবমান, মহান প্রভুর দরবারের আগ্রহী! যদি তুমি চাও

যে, তোমার অন্তর উর্ধ্ব জগতের রহস্যসমূহের জন্য খুলিয়া যাক; তাহা হইলে স্বীয় বাহ্যিকতার দিকে দৃষ্টি কম্ম কর।

নবম বিষয় ঃ তুমি একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গোলাম। মনিব যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ গোলামের কোন বিষয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করিয়া মনিব যখন সর্বপ্রকার উত্তম গুণাগুণের অধিকারী হন এবং স্বীয় গোলামকে কখনও নিরাশ না করেন। আর এই মনিব হইলেন আল্লাহ্ পাক। আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ন নির্ভর করা এবং নিজকে তাঁহার কাছে সোপর্দ করাই হইল ইবাদতের প্রাণ শক্তি।

এই দুইটি বিষয় বান্দার নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার এবং স্বীয় এখতিয়ারের পরিপন্থী। বরং বান্দার কাজ হইল যে, সে নিজকে মনিবের খেদমতে নিয়োজিত রাখিবে আর মনিব স্বীয় অনুগ্রহে নিজেই তাহার দেখা শুনা করিবেন। তাহার খোঁজ খবর নিবেন। গোলামের দায়িত্ব হইল খেদমত করা। মনিব নিজেই তাহার ভরন পোষনের ব্যবস্থা করিবেন।

এই সম্পর্কে আল্লাহ্ প্যাকের বাণী খুব ভালভাবে বুঝিয়া লও;

وَ أْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ *

"আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করুন ও নিজে ইহার উপর অটল থাকুন। আমি আপনার কাছে রিযক চাই না। আমিই আপনাকে রিযক দিয়া থাকি।" আল্লাহ্ পাকের বাণীর সারকথা হইল যে, তোমরা আমার খেদমত কর; আমি তোমার রিয্ক পৌঁছানের ব্যবস্থা করিব।

দশম বিষয় ঃ তোমার তো কার্যের শেষফল সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর নাই। অনেক সময় এমনও হয় যে, কোন বিষয় উপকারী মনে করিয়া উহা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অথচ দেখা যায় যে, কার্যের শেষ পরিনতি হইয়া থাকে বিপরীত। আবার অনেক সময় বিপদাপদ ও মুছিবতের পথেও উপকার অর্জিত হইয়া থাকে। আবার অনেক সময় উপকার অর্জিত হইবে মনে করিয়া কোন কাজ করা হইলে শেষ পর্যন্ত হয় বিপদ। কখনও কখনও ক্ষতির পথে লাভ আর লাভের পথে হইয়া থাকে ক্ষতি। অনেক সময় মনে করে যে, মেহনত করিয়া কার্যটি সমাধা করিতে পারিবে কিন্তু হইয়া যায় অক্ষম। আবার মনে করে যে, কোন কার্যে সে অক্ষম কিন্তু তাহা অর্জন করিতে পরিশ্রম করিতে পারে। আবার অনেক সময় শত্রুর দ্বারাও উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুর দ্বারাও কষ্ট পাইয়া থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের

পর নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন করা কিভাবে একজন বুদ্ধিমানের জন্য সম্ভব হইতে পারে? অথচ তাহার খবর নাই যে, কোন জিনিসে তাহার সুখ ও শান্তি রহিয়াছে আর কোন জিনিসে তাহার জন্য ক্ষতি রহিয়াছে। তুমি কি আল্লাহ পাকের বাণী শুন নাই-

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ *

"হয়তবা তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ কর অথচ তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। হয়তবা তোমরা কোন জিনিস পছন্দ কর অথচ তাহা তোমাদের জন্য খারাপ।"

অনেক সময় এমন হয় যে, হয়তবা তুমি কোন জিনিসের ইচ্ছা করিয়াছ। কিন্তু আল্লাহ পাক তাহা দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। তখন হয়ত এই কারণে অন্তরে বিষণ্নতা অনুভব করিয়াছ। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তুমি ইহার শেষ পরিণতি জানিতে পারিয়াছ তখন হয়ত তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, আল্লাহ পাক তোমার প্রতি কত অনুগ্রহ করিয়াছেন। আর তোমার তো পূর্বে এই সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সুতরাং যে আগপিছ বুঝিতে না পারে তাহার ন্যায় খারাপ ইচ্ছাকারক আর কে হইতে পারে? যে গোলামের মধ্যে মনিবের প্রতি আনুগত্য নাই সে গোলাম অপেক্ষা অধিক বদবখত আর কে হইতে পারে? কোন এক করি বলিয়াছেন-

☆ অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছি আমি কিন্তু তাহা হইতে দেন নাই আপনি।

☆ সর্বদা আমার উপর রহিয়াছে আপনার আমার থেকেও অধিক মেহেরবানী।

☆ করিয়াছি পাকা পোক্ত ইচ্ছা। এখন থেকে অনুভব করিব না কোন আশংকা অন্তরে।

☆ বরং মনে করিব যে, ইহা আদেশ হইয়াছে আপনার পক্ষ থেকে।

☆ অন্তরে এই ইচ্ছাও আছে যে, আমি যাইব না। দিকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের।

☆ আমার অন্তরে রহিয়াছে মর্যাদা বড়ত্ব আপনার।

জনৈক ব্যক্তির কাহিনী। সে যখন কোন বিপদে পতিত হইত তখন বলিত যে, ইহাতে কোন না কোন মঙ্গল রহিয়াছে। ঘটনা চক্রে এক রাত্রে এক বাঘ আসিয়া তাহার পালিত মোরগ খাইয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাওয়ার পর বলিয়া

উঠিল যে, নিশ্চয়ই ইহাতে কোন না কোন মঙ্গল রহিয়াছে। আর ঐ রাত্রেই তাহার কুকুরের গায়ে আঘাত লাগিল। ফলে কুকুরটি মারা গেল। সে এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর বলিল যে নিশ্চয়ই ইহাতে কোন মঙ্গল রহিয়াছে। অতঃপর তাহার গাধা চিৎকার করা শুরু করিয়া মরিয়া গেল। ইহার সংবাদ শুনিয়াও সে বলিল যে, নিশ্চয়ই ইহাতে কোন না কোন মঙ্গল রহিয়াছে। বারবার বিপদ আসার পরও একই কথা বলার কারণে পরিবারের লোকজন তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িল। ঘটনাচক্রে ঐ রাত্রেই শেষভাগে কিছু লোক সে মহল্লায় আসিয়া ডাকাতি শুরু করিল। কিন্তু এই ব্যক্তির ঘর ডাকাতি থেকে অব্যাহতি পাইল। ডাকাতরা মোরগ, গাধা এবং কুকুরের আওয়াজ যে ঘর হইতে শুনিয়াছে সে ঘরে ডাকাতি করিয়াছে। যেহেতু তাহার ঘরে মোরগ, গাধা এবং কুকুর কিছুই ছিল না সবই মরিয়া গিয়াছে। তাই ডাকাতরা মনে করিল যে এই বাড়ীতে কেহ বসবাস করে না। তাই তাহারা এই ঘরে ডাকাতি করিতে আসিল না। ইহাদের মৃত্যু তাহার রেহাই পাওয়ার উপায় হইয়া গেল। সুতরাং তাহার কার্যের ব্যবস্থাপক মহান আল্লাহ বড়ই হেকমতওয়ালা ও পবিত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ের শেষ ফল বান্দার সামনে প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার জন্য আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের সৌন্দর্য বান্দার বুঝে আসে না। আল্লাহ পাকের বিশেষ বিশেষ বান্দার মাকামের সাথে এই রকম ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নাই। কেননা আল্লাহ পাক যাহাদিগকে বিবেক দিয়াছেন তাহারা কার্যের শেষ ফল প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিয়া লয়। এই ধরণের লোক কয়েক স্তরের হইয়া থাকে।

কতক লোক এমন রহিয়াছে যে আল্লাহ পাকের প্রতি তাহাদের গভীর সুধারণা। আল্লাহ পাকও তাহাদিগকে অবিরাম অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর মধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন। তাই তাহারা আল্লাহর প্রতি নতশির হইয়া রহিয়াছে। কতক লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের আল্লাহর প্রতি সুধারণা রহিয়াছে এই কারণে যে, তাহারা জানে কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের দ্বারা বা ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা বা কষাকষির দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন করা যাইবে না এবং তাহার তাকদীরে যতটুকু বন্টন করা হইয়াছে তদাপেক্ষা অধিক হাসিল করা যাইবে না।

আর কতক লোক আল্লাহ পাকের প্রতি এইজন্য সুধারণা রাখে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক বলেন, বান্দার আমার প্রতি যেরূপ ধারণা আমি বান্দার সাথে সেরূপ থাকি।

সুতরাং যে ব্যক্তি এই আশায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা ও উহার আনুসাঙ্গিক বিষয়সমূহ অবলম্বন করে যে, তাহার সাথে আল্লাহর পক্ষ হইতে এইরূপ আচরণ হউক। তখন আল্লাহ পাক তাহার সাথে তাহার ধারণা মোতাবেক আচরণ করেন। আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্য অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর রাস্তা খুব সহজ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের ধারণা মোতাবেক তাহাদের সাথে আচরণ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ *

"আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে আসানী করার ইচ্ছা করেন। তোমাদের সাথে কাঠিণ্যতার ইচ্ছা করেন না।"

উল্লিখিত স্তরসমূহ অপেক্ষা অধিক উচ্চস্তর হইল নিজকে সোপর্দ করা এই জন্য যে, আল্লাহ পাকই ইহার হকদার। আর নিজকে তাঁহার কাছে এই জন্য সোপর্দ করা যে, সোপর্দ করার উপকারিতার দ্বারা সে নিজেই উপকৃত হইবে। এই ধরণের সোপর্দ করা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ইহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের। কেননা উপরে উল্লিখিত স্তরসমূহ কোন না কোন কারণের (শর্তের) উপর নির্ভরশীল। কেননা উপরে উল্লিখিত প্রথম স্তরের লোকেরা আল্লাহ পাকের অনুগত হইয়াছে নিজের ফায়দার জন্য। তাহা হইল আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও মেহেরবানী তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখা। যদি তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ও মেহেরবানী না হইত তাহা হইলে তাহারা অনুগত হইত না। দ্বিতীয় স্তরের লোকদের অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যবস্থা অবলম্বনে কোন ফায়দা নাই। সুতরাং এই অবস্থায় যদি তাহারা ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করিল তাহা হইলে আল্লাহর প্রতি তাহাদের নিজেদের সোপর্দ আল্লাহর জন্যই হইল না। কেননা ব্যবস্থা অবলম্বন যদি তাহার জন্য উপকারী বলিয়া সে বুঝিতে পারিত তাহা হইলে হয়ত বা সে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করা হইতে বিরত থাকিত।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এই জন্য অনুগত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি এইজন্য সুধারণা পোষণ করা অবলম্বন করিয়াছে যে, তাহার ধারণা মোতাবেক আল্লাহ পাক তাহার সাথে আচরণ করিবেন। সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহার আশংকা হইল যে, যদি আমি এইরূপ না করি তাহা হইলে আমার থেকে উত্তম জিনিসসমূহ ছুটিয়া যাইবে। সুতরাং সে তো উত্তম জিনিসসমূহ লাভের আশায় তাঁহার অনুগত হইয়া রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অনুগত হয় এবং তাঁহার প্রতি এই কারণে সুধারণা রাখে যে,

তিনি তাহার উপাস্য ও প্রতিপালক। এই ব্যক্তি প্রকৃত স্থানে পৌঁছাইয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তি এমন এক কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহার সম্পর্কে রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহর কোন কোন বান্দা এমনও রহিয়াছে যাহার এক তাসবীহ ওহুদ পাহাড়ের সমান।

আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে সকল বান্দাদের থেকে উপায় অবলম্বন বর্জন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন

وَاَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ الخ *

"যখন আপনার প্রতিপালক বনী আদমের পীঠ থেকে গ্রহণ করিয়াছেন। (শেষ পর্যন্ত)"

কেননা আল্লাহ পাককে প্রতিপালক বলিয়া স্বীকার করার অপরিহার্য ফলাফল হইল তাহার পর কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করা। আর এই অঙ্গীকার এমন এক সময় হইয়াছিল যখন মানবের নফস ছিল না। নফসই (মন) হইল দ্বিধা দ্বন্দের উৎপত্তি স্থল। আর ইহাই আল্লাহর সামনে ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করে।

যদি বান্দা পূর্বাবস্থায় থাকিত। বর্তমানে বান্দা ও প্রভুর মধ্যে যে পর্দা পড়িয়াছে তাহা যদি উঠিয়া যাইত। আর বান্দা আল্লাহকে সর্বদা স্বীয় অন্তরে হাযির রাখিত তাহা হইলে আল্লাহর সামনে ব্যবস্থা অবলম্বন করা বান্দার জন্য সম্ভবই হইত না। যেহেতু প্রভু ও বান্দার মধ্যে পর্দা বান্দাকে অন্তরাল করিয়া দিয়াছে সেহেতু তাহার দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে এবং সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হইতেছে। এই জন্য যাহারা আল্লাহর মারেফাত লাভ করিয়াছেন এবং উর্ধ্বজগতের রহস্যসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা আল্লাহর সামনে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। কেননা প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেয়া না। এমনকি সুদৃঢ় অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে হাযির আছে আর তাঁহার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সে কিভাবে আল্লাহর মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে?

হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনা

ফায়দাঃ- বান্দার জন্য আল্লাহ পাক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহার বান্দা নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং স্বীয় এখতিয়ার প্রদর্শন করার মুছিবত খুব ভয়ানক। ইহার বিপদ বড়ই শক্ত। হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাকে তলাইয়া দেখিলে ইহা বুঝা যায়। তিনি নিজের জন্য নিজে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর এই ব্যবস্থা অবলম্বন স্বরূপ গাছের ফল খাইয়াছিলেন। ঘটনার বিবরণ

কুরআনে বর্ণিত রহিয়াছে। শয়তান হযরত আদম (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে-

مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ *

তোমাদের পরোয়ারদিগার তোমাদিগকে এই গাছ থেকে (ফল) ভক্ষণ করিতে শুধু এই কারণে নিষেধ করিয়াছেন যে, (এই গাছের ফল খাইলে) তোমরা ফিরিশতা হইয়া যাইবে অথবা তোমরা তথায় চিরস্থায়ী বসবাসকারী হইয়া যাইবে। শয়তানের এই কথা হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে যে চিন্তার উদ্রেক করিয়াছিল তাহা হইল এই যে, মানুষ ফিরিশতায় পরিণত হওয়ার সুযোগ আর বেহেশতে চিরস্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। বেহেশতে সর্বদা থাকার অর্থ আল্লাহর সান্নিধ্যে সর্বদা থাকা। আর স্বীয় প্রিয়ের কাছে সর্বদা অবস্থান করার সুযোগ পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। অধিকন্তু ফিরিশতায় পরিণত হওয়ার আকঙ্খা তাহার অন্তরে হয়তবা এই জন্য প্রাধান্য পাইয়াছিল যে ফিরিশতার গুণাবলীসমূহ উত্তম অথবা তিনি ফিরিশতাকে উত্তম মনে করিতেন। এইসব দিকে খেয়াল করিয়া গাছের ফল খাইলেন। আর তাহার এই নিজস্ব ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণেই তাহার উপর আপদ আসে। অধিকন্তু আল্লাহ পাকেরও সিদ্ধান্ত ছিল তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার এবং পৃথিবীর বুকে তাহাকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করার। সুতরাং বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে প্রেরণ করার দ্বারা তাহার মর্যাদার অবনিত হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার মর্যাদার উন্নতি হইয়াছে। এইজন্য শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম! হযরত আদম (আঃ)-এর মর্যাদার অবনতির জন্য তাহাকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয় নাই বরং তাঁহাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানের জন্য অবতরণ করানো হইয়াছে। সুতরাং আদম (আঃ) দিন দিন উন্নতির দিকে চলিয়াছেন। কখনও আল্লাহর নৈকট্য ও বিশেষত্বের মধ্যে। আবার কখনও কান্নাকাটির মধ্যে। আবার কখনও পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়। প্রত্যেক ঈমানদারদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব যে, নবী ও রাসূলগণের যখন কোন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তখন তাহার অবস্থায় পরিপূর্নতা আসে। অর্থাৎ তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইয়া যে অবস্থায় পতিত হয় তাহা পূর্বাবস্থা হইতে অধিক পরিপূর্ণ হয়। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের এক ইরশাদ স্বরণ কর।

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى *

হযরত ইবনে আতিয়া (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন

আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথমাবস্থা অপেক্ষা উত্তম। উল্লিখিত বিষয়টি বুঝিয়া লওয়ার পর আরও একটি বিষয় বুঝিয়া লও। তাহা হইল এই যে, বান্দার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ইচ্ছা আল্লাহ পাকের গুন। আল্লাহর ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, তিনি মানবের দ্বারা পৃথিবীকে আবাদ করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা মোতাবেক পৃথিবীতে ভাল ভাল লোকও থাকিবে আর নিজের উপর অত্যাচারীও থাকিবে। আর তাঁহার এই ইচ্ছা পুরা হওয়ার এবং দৃশ্য জগতে ইহার প্রকাশ তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণ ও হেকমতের ফল। সুতরাং হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক এই বৃক্ষের ফল খাওয়া তাহার দুনিয়াতে আগমনের কারণ হওয়া এবং তাহার দুনিয়াতে আগমন তাহার খিলাফতের মর্যাদার প্রকাশ পাওয়ার উপায় হওয়া আল্লাহ পাকের চাহিদা ছিল। এইজন্য শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, ঐ বিপদ কত বরকতময় যাহা খিলাফতের মর্যাদা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে এবং পরবর্তী লোকদের জন্য তাওবা করার কানুন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আকাশ যমীনের সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ পাকের ফয়সালার মাধ্যমে তাহার পৃথিবীতে আগমন নির্ধারিত হইয়াছিল। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً *

"নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করিব।" মোটকথা হযরত আদম (আঃ)-এর বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা, পৃথিবীতে তাহার আগমন এবং খিলাফত ও ইমামতির মর্যাদার দ্বারা সম্মানিত হওয়া প্রভৃতি আল্লাহ পাক কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থার সৌন্দর্য। এই পর্যন্ত আলোচনার পর আমরা এই ঘটনা থেকে এমন কতগুলি ফায়দা ও বৈশিষ্ট্য তালাশ করিব যাহা আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)কে দান করিয়াছেন। যাহাতে আমরা অবগত হইতে পারি যে, আল্লাহ পাকের সাথে বিশেষ বিশেষ লোকদের এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যাহা অন্যান্য লোকদের নাই এবং তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন যাহা অন্যান্যদের জন্য গ্রহণ করেন নাই।

হযরত আদম (আঃ)-এর বৃক্ষের ফল খাওয়ার এবং তাহার দুনিয়াতে অবতরণের ঘটনার মধ্যে কতগুলি ফায়দা রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি ফায়দা হইল বেহেশতের মধ্যে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়ার আল্লাহ পাকের যেসব গুনের সাথে পরিচিত ছিলেন তাহা হইল রিযক প্রদান, দান, এহসান ও অনুগ্রহ। আল্লাহ পাক তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে

তাহাদের প্রতি বিশেষভাবে মেহেরবানী করার পন্থাও গ্রহণ করিয়াছেন। আর এই বিশেষ মেহেরবানীর চাহিদা ছিল যে, তাহারা উভয়ে এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে। আর ইহার ফলশ্রুতিতে তাহারা আল্লাহ পাকের সহিষ্ণুতা, ঢাকিয়া রাখা, ক্ষমা করিয়া দেওয়া, তাওবা কবুল করা ও বান্দাকে কবুল করিয়া লওয়া প্রভৃতি গুনের সাথে পরিচিত হইতে পারেন। সহিষ্ণুতার গুনের সাথে এইভাবে পরিচয় হইয়াছিল যে, আল্লাহ পাক তাহাদের এই কার্যের শাস্তি সাথে সাথে প্রদান করেন নাই। সহিষ্ণু এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, কোন অপরাধের শাস্তি সাথে সাথে দেন না বরং অপরাধীকে অবকাশ দেন; অতঃপর হয়ত মাফ করিয়া দেন অথবা ধর পাকড় করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক ঢাকিয়া রাখা বা গোপন করিয়া রাখার গুণের সাথে তাহাদিগকে এইভাবে পরিচিত করাইলেন যে, তাহারা বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর যখন তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া লজ্জাস্থান প্রকাশ হইয়া পড়িল; তখন আল্লাহ পাক বেহেশতের পাতা দ্বারা তাহাদের লজ্জাস্থান ঢাকিয়া দিলেন। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ *

"এবং তাহারা উভয়ে বেহেশতের পত্র নিজেদের দেহের উপর মিলাইয়া মিলাইয়া রাখিতে লাগিল।" ইহা তাহার ঢাকিয়া রাখার গুণ।

তৃতীয় কথা আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এইকথা অবগত করানোর ইচ্ছা করিলেন যে, তোমরা আমার মকবুল ও পছন্দনীয় বান্দা। আল্লাহ পাকের এই কবুলের মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে দুইটি মর্যাদা স্থান লাভ করিল। এক, আল্লাহ পাকের দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্তন করা ও তাওবা করা। দ্বিতীয়, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে হেদায়েত। সুতরাং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হইল তাহাদিগকে পছন্দ হওয়ার কথা এবং তাহাদের প্রতি পূর্বে অবতীর্ণ অনুগ্রহের কথা হযরত আদম (আঃ)কে স্বরণ করাইয়া দেওয়া। তাই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা তিনি তাহাদের নির্ধারিত করিলেন। আর ফল খাওয়ার পরও তিনি তাহাদের থেকে বিমুখ হইলেন না। এমনকি তাহাদের প্রতি সাহায্য প্রেরণ করাও ক্ষান্ত করিলেন না। বরং এমতাবস্থায় স্বীয় ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যেমন কোন কোন বুযুর্গ বলেন যে, যাহার প্রতি অনুগ্রহ থাকে তাহার অপরাধ ক্ষতিকর হয় না। কোন কোন বন্ধুত্ব এমন রহিয়াছে যে, বন্ধুর বিরোধিতার দ্বারা বন্ধুত্ব কাটিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব হইল এমন বন্ধুত্ব যাহা বন্ধু চিরস্থায়ী রাখে। অপর পক্ষ তাহার অনুকূলে থাকুক বা প্রতিকূলে থাকুক। আল্লাহ পাক বলেন- ثم

اجتباه ربه "অতঃপর তাহার প্রভু তাহাকে পছন্দ করিয়া লইলেন।" তবে ইহার অর্থ এই নহে যে, তিনি তাহাদিগকে এই মাত্র পছন্দ করিয়া লইলেন। আগে করিতেন না। বরং আদম (আঃ)-এর অস্তিত্বের পূর্ব হইতেই তাহাকে পছন্দ করিতেন। তবে তাহার পছন্দ করার বাহ্যিক প্রকাশটা এখন হইয়াছে। আল্লাহ পাক ইহাকেই বলিয়াছেন ثم اجتباه ربه অর্থাৎ তাহাদিগকে তাওবার তৌফিক প্রদান করিয়া তাহাদিগকে পছন্দ করা নামক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى *

"অতঃপর তাঁহার প্রভু তাহাকে পছন্দ করিয়া লইলেন। তাঁহার তাওবা কবুল করিলেন ও হেদায়েত দান করিলেন।"

এই আয়াতে তিন বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। প্রথমতঃ তাহাকে পছন্দ করা, কবুল করা। দ্বিতীয়তঃ তাওবা কবুল করা। ইহার শেষ ফল তাহাকে পছন্দ ও কবুল করা। তৃতীয়তঃ হেদায়েত প্রদান করা, ইহার ফলকথা তাওবা কবুল করা। বিষয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। অতঃপর তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতরণ করাইয়া স্বীয় হেকমতের গুণের সাথে পরিচিত করিলেন। যেমন তাহাদিগকে বেহেশতে রাখিয়া স্বীয় শক্তির প্রাধান্যের সাথে পরিচিত করাইয়া ছিলেন।

পৃথিবী দারুল আসবাব। এখানে কোন না কোন বস্তুর মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হয় স্বীয় জীবন ধারণের উপজীবিকা হিসাবে। তাই হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করার পর তাহাকে হাল চাষ করা, বীজ বপন করা এবং জীবন পরিচালনার জন্য অন্যান্য যে সব বিষয়ের প্রয়োজন তাহা শিক্ষা দেওয়া হইল। কেননা তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বেই তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে,

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى *

"শয়তান যেন তোমাদিগকে বেহেশত থেকে বাহির না করিয়া দেয়। তাহা হইলে তুমি কষ্টে পতিত হইবে।"

আর হযরত আদম (আঃ)-কে জীবনযাপনের জন্য যে সব কার্য শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা সবই কষ্টের কাজ। এই কার্যগুলি শিক্ষা দিয়া আল্লাহ পাক স্বীয় ভবিষ্যত বাণী প্রমাণ করিলেন। উল্লিখিত আয়াতে تشقى শব্দের অর্থ করা হইয়াছে যে, তুমি কষ্টে পতিত হইবে। তুমি বদবখত হইয়া যাইবে। এই অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই।

কষ্টে পতিত হওয়ার অর্থ গ্রহণ করার পক্ষে দলীলও রহিয়াছে, আয়াতে

تشقى শব্দটি এক বচন। তাই এই শব্দ দ্বারা শুধু হযরত আদম (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। দুই বচন ব্যবহার করা হয় নাই। দুই বচন ব্যবহার করা হইলে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া উভয়ে বুঝাইত। কষ্ট পুরুষকে বহন করিতে হয়। নারীর উপর কষ্টের বোঝা চাপে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ *

"পুরুষগণ নারীদের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহ পাক প্রাধান্য দেওয়ার কারনে।"

যদি এখানে হতভাগ্য হওয়ার অর্থ গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে দুই বচন ব্যবহার করা হইত। হতভাগ্য হয় যখন সম্পর্ক ছেদ হয় আর সম্পর্কে পর্দা পড়িয়া যায়। এই ক্ষেত্রে উভয় সমান। এক বচন ব্যবহার করিয়া একজনকে বুঝানোর কোন কারণ নাই। যদি দুই বচনও ব্যবহৃত হইত। তবুও তাহাদের প্রতি সুধারণা পোষণ পূর্বকঃ বাহ্যিক কষ্টের অর্থই গ্রহণ করা হইত।

একটি বড় ফায়দার কথা

হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ তাঁহার অবাধ্যতা ও নির্দেশ অমান্য করার পন্থায় হয় নাই। হয়তোবা তিনি ভুল করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছেন। ফল খাওয়ার সময় নিষেধাজ্ঞার কথা স্বরণ ছিল না। কোন কোন তফসীরকার এই মতও ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক ইহাই বুঝাইয়াছেন-

فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا *

"সে ভুলিয়া গিয়াছে এবং আমি তাহার মধ্যে দৃঢ়তা পাইলাম না।"

অথবা ইহাও হইতে পারে যে, ফল খাওয়ার সময় নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ ছিল। কিন্তু শয়তান আল্লাহর নামে শপথ করিয়া তাহাকে প্রতারিত করিল যে, এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে আল্লাহ পাক নিষেধ করিয়াছেন যাহাতে আপনারা এখানে চিরস্থায়ী না হইতে পারেন অথবা আপনারা ফিরিশতায় পরিণত না হইতে পারেন। কারণ এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার অপরিহার্য ফল হইল ফিরিশতায় পরিণত হওয়া অথবা বেহেশতে চিরস্থায়ী হইয়া যাওয়া। যেহেতু তাহারা আল্লাহ পাকের প্রেমিক ছিলেন। আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে থাকার জন্য পাগলপরা ছিলেন। তাই তাহারা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে থাকার আকাঙ্খা লইয়া ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অথবা ফিরিশতায় পরিণত হওয়ার আশায়। তিনি ফিরিশতায় পরিণত হওয়া পছন্দ করিয়াছিলেন এই জন্য যে, তিনি তো

স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ পাকের কত নিকটের। তাই ফিরিশতাদের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার আকাঙ্খা লইয়া ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি ধারনা করিয়াছিলেন যে, ফিরিশতাগণ উত্তম। অধিকন্তু উলামাদের মধ্যে ফিরিশতা ও নবীগণের প্রাধান্য লইয়া মতবিরোধও রহিয়াছে। এই অবস্থায় যখন এই অভিশপ্ত শয়তান শপথ করিয়া বলিতে লাগিল যে, আমি তোমাদের কল্যণকামী। তখন আদম (আঃ) ধারণাও করিতে পারেন নাই যে, আল্লাহর নামে শপথ করিয়া কেহ মিথ্যা বলিতে পারে। তাই তিনি তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাই হইল যাহা আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "শয়তান তাহাদের উভয়কে ধোকায় ফেলিয়া দিয়াছে।"

ফায়দা ঃ হযরত আদম (আঃ) বেহেশতে থাকা অবস্থায় পানাহার করিতেন কিন্তু উহার ফলে মলমূত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন হইত না। বরং পানাহারের পর তাহার শরীর থেকে ঘাম বাহির হইয়া আসিত। আর সে ঘামে মেশক আম্বরের ন্যায় সুগন্ধ ছিল। নেককার ব্যক্তিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবেন তখন তাহাদের পানাহারের পরও এই অবস্থা হইবে। হযরত আদম (আঃ) ফল ভক্ষণ করার পর তাঁহার উদরে ব্যথা হইয়াছিল। ফলে তাহার মলত্যাগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। তখন তাহাকে বলা হইল যে, হে আদম! এখানে মলত্যাগ করার সুযোগ কোথায়? চৌকির উপর না পালঙ্কের উপর না নহরের কিনারে? এখানে তো কোথায়ও মলত্যাগ করার সুযোগ নাই। মলত্যাগ করার স্থান পৃথিবী।

সুতরাং গোনাহের মাধ্যমের প্রভাব যখন হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাহা হইলে বাস্তবক্ষেত্রে গোনাহের প্রভাব গোনাহগার পর্যন্ত কেন পৌঁছিবে না। বিষয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও।

সতর্ক ঃ এই ঘটনার উদাহরণ তোমার নিজের মধ্যে বুঝিয়া লও। মনে কর তোমাকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা নিষিদ্ধ বৃক্ষের তুল্য। বেহেশত আল্লাহর সান্নিধ্যের তুল্য। তোমার অন্তর হযরত আদম (আঃ)-এর তুল্য। আর হযরত হাওয়া তোমার নফসের তুল্য। যেন উভয়কে বলা হইতেছে যে, তোমরা এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজের দিকে যাইবে না। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, হযরত আদম (আঃ) অনুগ্রহের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন। তাহারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর উভয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কষ্ট উভয়ের হইয়াছিল। কিন্তু তুমি যদি নিষিদ্ধ কাজ কর তাহা

হইলে তুমি আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহাতে তোমার অন্তর কষ্টে পতিত হইবে। আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কষ্ট তোমার অন্তর ভোগ করিবে কিন্তু নফস ভোগ করিবে না। কেননা এই সময় নফস স্বীয় স্বভাব মোতাবেক জিনিসে ডুবা থাকিবে। অর্থাৎ খাহেশ, কুপ্রবৃত্তি এবং গাফলতে ডুবিয়া থাকিবে।

তরতীব ও বয়ান

আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)কে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন সৃষ্টি করার গুণের দ্বারা। তাই তিনি আল্লাহ পাককে يا قدير (হে শক্তিমান) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর নিজের পরিচয় দিয়াছেন ইচ্ছা করার গুণের মাধ্যমে। তাই তিনি তাহাকে يا مريد (হে ইচ্ছাকারী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর নির্দেশ দেওয়ার গুণের মাধ্যমে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। যেমন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন তাহাকে يا حاكم (হে নির্দেশদাতা) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর তাহার জন্য বৃক্ষের ফল নির্ধারিত করিলেন। তখন তিনি তাহাকে يا قاهر (হে পরাক্রমশালী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। কিন্তু ফল খাওয়ার পর সাথে সাথে শাস্তি প্রদান করেন নাই। তখন তিনি তাহাকে يا حليم (হে ধৈর্যশীল) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাকে এই বিষয়ে লজ্জিত করেন নাই। তাই তিনি তাহাকে يا ستار (হে গোপনকারী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর তাহার তাওবা কবুল করিয়াছেন বলিয়া হযরত আদম (আঃ) তাহাকে يا تواب (হে তাওবা কবুল কারী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন যে তিনি বৃক্ষের ফল খাওয়ার পরও আল্লাহ পাক তাহার থেকে বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তখন তিনি তাহাকে يا ودود (হে মহব্বতকারী) বলিয়া ডাকিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন এবং জীবন চলার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজলভ্য করিয়া দিলেন। তখন তিনি তাহাকে يا لطيف (হে মেহেরবান) বলিয়া ডাকিলেন। অতঃপর স্বীয় আহকাম পালন করার শক্তিদান করিলেন। তখন তিনি তাহাকে يا معين (হে সাহায্যকারী) বলিয়া ডাকিলেন। অতঃপর ফল খাওয়া নিষেধ করার, ফল আহার করানোর এবং পৃথিবীতে প্রেরণ করার রহস্যসমূহ তাহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন। তখন তিনি তাহাকে يا حكيم (হে হেকমতওয়ালা) বলিয়া ডাকিলেন। অতঃপর তাহাকে শত্রু এবং ধোকাবাজ শয়তানের উপর জয়ী করিলেন। তখন يا نصير (হে সাহায্যকারী) বলিয়া ডাকিলেন। অতঃপর আল্লাহর বন্দেগী করার গুণ অর্জন করার ক্ষেত্রে তাহাকে সহায়তা করেন। তখন

يا ظهير (হে সহায়তাকারী) বলিয়া ডাকিলেন।

হযরত আদম (আঃ)কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল তসরীফী আহকাম পরিপূর্ণ করার জন্য এবং তাকলিফী আহকামের ক্ষেত্রে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তিনি উভয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন। তসরীফী আহকাম পালন করার ক্ষেত্রেও এবং তাকলিফী আহকাম পালন করার ক্ষেত্রেও। সুতরাং তাহার প্রতি আল্লাহ পাকের বড় অনুগ্রহ ও এহসান।

প্রকৃত আলোচনার দিকে প্রত্যাবর্তন

বান্দার জীবনে যতগুলি পর্যায় আসে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পর্যায় হইল বান্দা হওয়ার পর্যায়। বান্দা হইয়া থাকা তাহার উচিত। অন্যান্য পর্যায় বান্দার এই পর্যায়ের অধীনস্থ। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন কুরআনে পাকে আসিয়াছে-

سُبْحٰنَ الَّذِىٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا *

"ঐ মহান সত্ত্বা পবিত্র। যিনি স্বীয় বান্দা (দাস)কে রাত্রে সফর করাইয়াছেন।"

ما انزلنا على عبدنا *

"আমি স্বীয় বান্দার উপর যাহা নাযিল করিয়াছি।"

كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا *

"আপনার প্রতিপালকের দাস যাকারিয়ার প্রতি তাঁহার রহমতের আলোচনা।"

لما قام عبد الله يدعوه *

"যখন আল্লাহর বান্দা তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে দণ্ডায়মান হইলেন।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বান্দা বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন বাদশাহ নবী হওয়ার বা বান্দা নবী হওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছিল তখন তিনি বান্দা হওয়ার দিকটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা আমাদের বড় প্রমাণ যে, বান্দা হওয়ার পর্যায় সমগ্র পর্যায় অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহর নৈকট্যের যতগুলি পন্থা রহিয়াছে তন্মধ্যে ইহার স্থান সর্বাগ্রে। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আমি তো বান্দা। তাই আমি হেলান দিয়া আহার করি না। আমি তো দাসের ন্যায় আহার করি।

তিনি আরও বলেন যে, আমি সমগ্র বনী আদমের নেতা। আমি ইহা গর্ব করিয়া বলিতেছি না।

শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) বলেন, "আমি গর্ব করিয়া বলিতেছিনা" ইহার অর্থ আমি নেতৃত্বের জন্য গর্ব করিতেছিনা। আমার গৌরব হইল দাস হইয়া থাকার মধ্যে। আর এই জন্য আমার সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন-

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ *

"আমি জ্বীন ও ইনসান জাতি শুধু এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমার ইবাদত করিবে।"

ইবাদত হইল বান্দা হইয়া থাকার বহিঃপ্রকাশ। আর বান্দা (দাস) হইয়া থাকা ইবাদতের প্রাণ। এতটুকু হৃদয়ঙ্গম করার পর এখন ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, বান্দা হিসাবে থাকার প্রাণ হইল স্বীয় এখতিয়ার বর্জন করা এবং তাকদীরের মোকাবিলা না করা। সুতরাং এখান থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে বান্দা হইয়া থাকার সারকথা হইল, আল্লাহ পাক বান্দার জন্য যেহেতু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন সেহেতু বান্দা নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করিবে এবং তাঁহার সামনে স্বীয় সর্বপ্রকার এখতিয়ার বর্জন করিবে। সুতরাং যেহেতু বান্দা হইয়া থাকার পর্যায়ের পরিপূর্ণতা বান্দার পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার উপর নির্ভরশীল; সেহেতু বান্দার উচিত নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা এবং পরিপূর্নভাবে নিজকে আল্লাহর কাছে অর্পন করা যাহাতে সে উচ্চতর মর্যাদা ও উত্তম মনযিল পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।

একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিতে পাইলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) কুরআন তিলাওয়াত করিতেছেন, কিন্তু খুব স্বল্প আওয়াজে অর্থাৎ প্রায় নিরব অবস্থায় পাঠ করিতেছেন। পক্ষান্তরে শুনিতে পাইলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)ও কুরআন পাঠ করিতেছেন কিন্তু খুব জোরে জোরে পাঠ করিতেছেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি এত নিম্নস্বরে পাঠ করিতেছ কেন? তিনি আরজ করিলেন আমি যাহার কাছে কথা বলিতেছিলাম তিনি তো শুনিতে পাইতেছিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এত জোরে জোরে পড়িতেছ কেন? তিনি আরয করিলেন আমার উদ্দেশ্য হইল

নিদ্রিত লোকদের জাগ্রত করা এবং শয়তানকে বিতাড়িত করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আরও সামান্য উচ্চ আওয়াজে পাঠ করেন। আর হযরত ওমর (রাঃ)–কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আওয়াজ অপেক্ষাকৃত নিম্ন করিয়া দেন।

আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) বলেন, এখানে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছা ছিল উভয়কে স্বীয় অভিমত থেকে সরাইয়া দেওয়া এবং স্বীয় অভিমতের দিকে আনয়ন করা।

সতর্কতা ঃ- উল্লিখিত হাদীছে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা তোমার ইবাদত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে তাহাদের কৃতকর্মের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন উভয়ে নিজ নিজ কর্মের কারণ এবং খালেছ ইচ্ছার কথা বর্ণনা করিলেন। ইহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে নিজেদের ইচ্ছা ও এখতিয়ার হইতে পৃথক করিয়া স্বীয় এখতিয়ারের দিকে আনয়ন করিলেন।

তীহ্ ময়দানের ঘটনা

বনী ইসরাঈল যখন তীহ্ প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মান্না ও সালওয়া নামক খাদ্য পাইতে শুরু করিল। আল্লাহ পাক তাহাদের খাদ্য হিসাবে ইহাই নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এই খাদ্য মেহনত ও পরিশ্রম ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা এই ধরনের খাদ্যের অভ্যাসী ছিল না। অধিকন্তু বান্দার জন্য আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাহাদের নসীব হয় নাই। ফলে তাদের স্বভাব মোতাবেক তাহারা পুরাতন অভ্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল যে, হে মুসা (আঃ)! আপনি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের জন্য শাক শবজী, তরিতরকারী, কাকড়ী, রসূন, মুশুরী, পিয়াজ প্রভৃতি জমি হইতে নির্গত করিয়া দেন। তখন হযরত মুসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস লইতে চাও। তাহা হইলে তোমরা শহরে যাও সেখানে তোমাদের চাহিদা মোতাবেক জিনিস মিলিবে। অতঃপর তাহাদের উপর অপদস্থতা ও লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হইল। তাহারা আল্লাহর গোস্বায় পতিত হইল। তাহাদের প্রতি আল্লাহর গোস্বা ও লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় জিনিসসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পছন্দনীয় জিনিসসমূহ অবলম্বন করিয়াছিল। অথচ আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসমূহ

তাহাদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাই আল্লাহ পাক ধমকির সুরে তাহাদিগকে বলিলেন-

اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ *

"তবে কি তোমরা উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করিতে চাও।"

অত্র আয়াতের বাহ্যিক তফসীর এই যে, তবে কি তোমরা মান্না-সালওয়ার পরিবর্তে রসূন, পিয়াজ ও মুশুরী প্রভৃতি চাহিতেছ? মান্না সালওয়া প্রকৃত মজাদার জিনিস এবং মেহনত পরিশ্রম ব্যতীত অর্জিত হয়।

সুতরাং পিয়াজ, রসূন প্রভৃতি কখনও মান্না সালওয়ার সমকক্ষ হইতে পারে না। কেননা তোমাদের কাঙ্খিত জিনিসসমূহ মান্না-সালওয়ার মত মজাদার নয়। অধিকন্তু এইগুলি মেহনত পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত হয়। তাই ইহার সাথে বিপদাপদ লাগিয়াই থাকে। অত্র আয়াতের তত্ত্বকথা হইল তোমরা যাহা অবলম্বন করিয়াছ তাহা নিকৃষ্ট জিনিস। আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য যাহা পছন্দ করিয়াছেন তাহা উৎকৃষ্ট। অথচ তোমরা উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস পাইতে চাহিতেছ?

আল্লাহ পাক বলেন-

اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَاَلْتُمْ *

"তোমরা শহরে যাও। সেখানে তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা লাভ করিতে পারিবে।"

ইহার তত্ত্বকথা এই যে, যেহেতু আসমানী ব্যবস্থা তোমাদের পছন্দনীয় নয় বরং যমিনী ব্যবস্থা পছন্দনীয়। সুতরাং আসমানী ব্যবস্থার পরিবর্তে যমিনী ব্যবস্থার প্রতি চল এবং অপদস্থতা ও লাঞ্চনার মধ্যে নিমজ্জিত হও। কেননা, তোমরা আল্লাহর ব্যবস্থা ছাড়িয়া নিজেদের ব্যবস্থা ও এখতিয়ার গ্রহণ করিতেছ।

যদি এই উম্মত তীহ্ ময়দানে হইত তাহা হইলে বনী ইসরাঈল যাহা বলিয়াছে তাহা অবশ্যই বলিত না। কেননা তাহাদের নূর পরিষ্কার। তাহাদের ভেদ ও রহস্য অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহারা কি বলিয়াছিল? বনী ইসরাঈল হযরত মুসা (আঃ)কে বলিয়াছিল-

اذهب انت و ربك فقاتلا انا ههنا قعدون *

"হে মুসা! আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়া লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব।" আর এই কারণেই তাহারা তীহ্ প্রান্তরে নজরবন্দী হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা বলিয়াছিল যে, হে মুসা! আপনি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন। তিনি যেন আমাদিগকে পিয়াজ, রসুন, মুশুরী, তরকারী প্রভৃতি দান করেন।

প্রথমে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তো তাহারা আল্লাহর অনুগত হইতে অস্বীকার করিয়াছে। আর পরে উল্লিখিত ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় জিনিস পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের পছন্দনীয় জিনিস অবলম্বন করিয়াছে। এইভাবে বারবার তাহাদের দ্বারা এমন সব কাজ হইয়াছে যাহা থেকে বুঝা যায় যে, তাহারা হাকীকত ও তরীকত সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। তাই তাহারা কখনও বলিত যে, ارنا الله جهرة "আমাদের সামনাসামনি পরিষ্কারভাবে আল্লাহকে দেখাইয়া দিন।" কখনও হযরত মুসা (আঃ)কে ফরমায়েশ দিয়া বলিত যে, اجعل لنا الها كما لهم الهة "এইসব লোকদের অনেক উপাস্য রহিয়াছে। অনুরূপভাবে আমাদের জন্য একটি উপাস্য বানাইয়া দিন।" এই ঘটনাটি ছিল দরিয়া পার হওয়ার পরের ঘটনা। নদী পার হইয়া এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল তাহারা নিজেদের প্রতিমার সামনে জমিয়া বসিয়া আছে। তাহাদেরকে মুর্তি পুজা করিতে দেখিয়া তাহারা এই আবেদন করিল অথচ এই কেবল তাহারা আল্লাহর কুদরত দেখিয়া আসিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে তাহারা এমনই ছিল। যেমন হযরত মুসা (আঃ) তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, তোমরা এমন লোক যে, তোমরা মূর্খের ন্যায় কাজ করিয়া বস।" অনুরূপভাবে আল্লাহ্ পাক তাহাদের অন্য এক অবস্থাও বর্ণনা করিতেছেন,

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهٗ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ *

"যখন আমি ছায়াদার ছাদের ন্যায় পাহাড়কে তাহাদের উপর উঠাইয়া ধরিয়াছি। তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল যে, যেন ইহা তাহাদের উপর পতিত হইতেছে। তখন তাহাদের প্রতি নির্দেশ হইল যে, আমি তোমাদিগকে যে হুকুম দিয়াছি তাহা খুব শক্ত করিয়া ধর।"

পক্ষান্তরে এই উম্মত স্বীয় অন্তরের মধ্যে পাহাড়সম সাহস ও মর্যাদা বহন করিতেছে। ঈমানী শক্তির মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব অবলম্বন করিয়াছে। ইহার উপর অটল রহিয়াছে। আর এই বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। গরুর বা ছুরের পুঁজা করা হইতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। আল্লাহ পাক এই

উম্মতকে পছন্দ করিয়াছেন। তাহাদের প্রতি নাযিলকৃত আহকাম তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। নিজেই তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ *

"তোমরা উত্তম উম্মত। তোমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে মানুষের উপকারের জন্য।" অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا *

"এবং অনুরূপভাবে আমি তোমাদিগকে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করিয়াছি।"

ইহা হইতে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, নিজে ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং স্বীয় এখতিয়ার খাটানো বড় শক্ত গোনাহ ও বিপদ। যদি তুমি চাও যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তোমার জন্য ভাল ফয়সালা হউক তাহা হইলে তুমি নিজের জন্য নিজের পছন্দ বর্জন কর। আর যদি চাও যে, তোমার জন্য উত্তম ব্যবস্থা গৃহীত হউক তাহা হইলে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বনের আকাঙ্খা ত্যাগ কর।

যদি তুমি স্বীয় উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছিতে চাও তাহা হইলে তোমার জন্য একটি রাস্তা খোলা রহিয়াছে। তাহা হইল তাহার সামনে তোমার কোন উদ্দেশ্যই থাকিবে না। হযরত বায়েজীদ (রহঃ)কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, আপনারা কি চান? তিনি বলিলেন, আমি ইহাই চাই যে, আমি কিছুই চাহিব না। সুতরাং এই ধরনের লোকেরা আল্লাহ পাকের কাছে আকাঙ্খা ও চাহিদা হইয়া হইয়া থাকে যে তাহাদের কোন ইচ্ছা নাই। কেননা তাহারা জানে যে, ইহাই বড় কেরামত এবং বড় নৈকট্য। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কেরামত প্রকাশ হইয়া থাকে কিন্তু অপ্রকাশ্যভাবে হইলেও ইহাতে নিজের পক্ষ হইতে সামান্য ব্যবস্থা গ্রহণ লুকায়িত থাকে। অথচ প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ কেরামত হইল ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশের সামনে স্বীয় এখতিয়ার সোপর্দ করা। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, দুইটি জিনিস সমস্ত কেরামতের মূল। তন্মধ্যে প্রথম কেরামত হইল ঈমান। যাহার দ্বারা একীন বৃদ্ধি পায় এবং দর্শন লাভ হয়।

দ্বিতীয় কেরামত হইল এমন আমল যাহাতে আনুগত্য থাকে। নিছক দাবী ও ধোকা থেকে বেঁচে থাকা হয়। যাহার উল্লিখিত কেরামতদ্বয় নসীব হইয়াছে ইহার পরও অন্য কোন কেরামত তালাশ করে সে ব্যক্তি ধোকায় পতিত মিথ্যুক অথবা তাহার ইলম ও আমলে ত্রুটি রহিয়াছে। এই ব্যক্তির অবস্থাকে একটি

উদাহরণের মাধ্যমে বুঝা যাইতে পারে যে, বাদশাহ খুশী হইয়া এক ব্যক্তিকে স্বীয় সভাসদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার সুযোগ প্রদান করিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ঘোড়ার খেদমতগার হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বাদশাহের সন্তুষ্টির পোশাক পরিত্যাগ করিল।

কেরামতের সাথে যদি বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত না হয় তাহা হইলে সে কেরামতওয়ালা হয়ত ধোকায় পতিত হইয়াছে অথবা সে অসম্পূর্ণ অথবা সে ধ্বংসের কবলে পতিত হইয়াছে। এখন ভালভাবে বুঝিয়া লও যে, কেরামতের কেরামত হওয়াটা আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর সন্তুষ্টির আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি অপরিহার্য বিষয় হইল, নিজের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা এবং আল্লাহর সামনে স্বীয় এখতিয়ার নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া।

হযরত বায়েযীদ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন যে, তিনি কোন ইচ্ছাই করিবেন না। তাহার এই বক্তব্যের উপর কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিল যে, ইচ্ছা না করার ইচ্ছাও তো ইচ্ছা? সুতরাং তিনি ইচ্ছা মুক্ত হইলেন কিভাবে? প্রকৃতপক্ষে তাহার এই বক্তব্যের উপর এই আপত্তি বে-ইলম লোকদের। কেননা বায়েযীদের (রহঃ) কথার অর্থ ইহা যে, তিনি কোন ইচ্ছা করিবেন না। বান্দাগণ কোন ইচ্ছা না করুক ইহা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। সুতরাং বায়েযীদের ইচ্ছা না করার ইচ্ছা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার মোয়াফেক হইয়াছে।

মোটকথা, হযরত বায়েযীদ (রহঃ) সর্বপ্রকার ইচ্ছার অস্বীকার করেন নাই। বরং যে ইচ্ছা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির পরিপন্থী তাহা করিতে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, যতগুলি জিনিস শরীয়তের পছন্দনীয় এবং শরীয়ত কর্তৃক বিন্যস্ত এই সকল জিনিসে তোমার কোন এখতিয়ার বা ইচ্ছার স্থান নাই। এইগুলি শ্রবণ কর আর পালন করিতে থাক। আর এই পর্যায় ফিকহে রব্বানী আর ইলমে লুদনীর পর্যায়। ইলমে লুদনী আল্লাহ পাক থেকে অর্জিত হয়।

হযরত শায়খ (রহঃ) তাঁহার বক্তব্যে এই কথা বলিয়াছেন যে, যতগুলি জিনিস শরীয়তের পছন্দনীয় তাহা অবলম্বন করা আল্লাহর দাস হওয়ার মর্যাদা অর্জনের পরিপন্থী নয়। আর আল্লাহ পাকের দাসত্বের মর্যাদা লাভের ভিত্তি হইল এখতিয়ার ও ইচ্ছা পরিহার করা। আমরা এই জন্য উল্লেখ করিলাম যাহাতে কোন বিবেকবান ধোকা না খায় এবং ইহা বুঝিয়া না লয় যে, ওজিফা, তাসবীহ

এবং সুন্নতে মুয়াক্কাদা প্রভৃতির ইচ্ছা করার দ্বারা আল্লাহর দাসত্ব লাভের মর্যাদা হাতছাড়া হইয়া যায়। কেননা এই সবের ইচ্ছা করাও তো এক প্রকার এখতিয়ার।

তাহার এই ভুল ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন যে, যতগুলি জিনিস শরীয়তের পছন্দনীয় ও শরীয়ত কর্তৃক বিন্যস্ত ইহাদের কোন একটিও পরিহার করার এখতিয়ার নাই। এইগুলি তো পালন করিতেই হইবে। তোমাকে তো নিজের এখতিয়ার ও ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় জিনিসও ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার কথা বলা হয় নাই।

সুতরাং এই বর্ণনা হইতে হযরত বায়েযীদ (রহঃ)-এর ইচ্ছা না করার ইচ্ছা করার কারণ বুঝা যায়। তাহা হইল বান্দা ইচ্ছা না করিলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট থাকেন। তাই এই ধরনের ইচ্ছার (অর্থাৎ ইচ্ছা না করার ইচ্ছা করা) কারণে বান্দা আল্লাহর অনুগত দাস হওয়ার পরিধি হইতে বাহির হইয়া পড়িবে না। আর বান্দা আল্লাহর দাস হইয়া থাকুক ইহা আল্লাহর চাহিদা।

সুতরাং বুঝা গেল যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিবার রাস্তা হইল ইচ্ছা মিটাইয়া দেওয়া আর চাহিদা বর্জন করা। এমনকি শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, কোন ওলী ততক্ষণ খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যতক্ষণ তাহার মধ্যে এখতিয়ার ও তদবীর (ব্যবস্থা অবলম্বন) অবশিষ্ট থাকে। আমি শুনিয়াছি যে, শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) বলিয়াছেন, বান্দা খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার এই পৌঁছার আকাঙ্খাও পরিত্যক্ত না হয়। অবশ্য এখানে আকাঙ্খা পরিত্যক্ত হওয়ার কথা বলিয়া এমন আকাঙ্খা পরিত্যক্ত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে যাহার সাথে বান্দার আদব-কায়দা জড়িত। কেননা আকাঙ্খা পরিত্যক্ত হয় দুই কারণে। কখনও কখনও কোন কিছুর আকাঙ্খা করাকে আদবের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়। তাই আদব রক্ষার্থে আকাঙ্খা করা পরিহার করা হয়। আবার কখনও কখনও আকাঙ্খা পরিহার করা হয় মন উঠিয়া যাওয়ার কারণে, অন্তর না লাগার কারণে। সুতরাং আল্লাহর ওলীগণ থেকে যে আকাঙ্খা পরিত্যক্ত হয় উহার সম্পর্ক প্রথম প্রকার অর্থাৎ আদবের সাথে।

অথবা আকাঙ্খা এই কারণেও পরিত্যক্ত হয় যে, বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পর প্রত্যক্ষ করিতে পায় যে, সে ইহার যোগ্য নয় তখন সে নিজেকে এই পর্যায় হইতে অনেক নীচ পর্যায়ের বলিয়া মনে করিতে থাকে। এইজন্য মিলনের

আকাঙ্খা তাহার থেকে দূর হইয়া যায়। সুতরাং যদি নিজকে আলোকিত করিতে চাও; তাহা হইলে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা পরিহার কর। আল্লাহর ওলীদের পন্থায় পথ চল। আর তাহারা ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার পন্থায় পথ চলিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরাও তাহা লাভ করিতে পারিবে। কবি বলেন-

چلو تم راہ پر انکی طریقہ دل سے لوان کا

پہنچ جاؤ گے منزل پر یہی وادی کی جانب

তোমরা তাহাদের পথে পথ চল। তাহাদের তরীকা অন্তর দিয়া গ্রহণ কর। তাহা হইলে তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া যাইবে। এই উপত্যকার দিকে।।

এই বিষয়ের উপর আমি কৈশোরে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলাম। আমার কোন এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা রচনা করা হইয়াছিল। (কবিতাটির অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল)

☆ হে বন্ধু! কাফেলা তো তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছে। আমরা তো এখানে বসিয়া রহিয়াছি। এখন তোমরা কি করিবে?

☆ আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিব ইহাতে তোমরা সম্মত আছ কি? হে এলাহি! আপনার সাথে আমার প্রবৃত্তির যে বিরোধিতা হয়েছে তাহা দূরীভূত করিয়া দিন।

☆ বিশ্ব নিখিলের জবান উচ্চস্বরে ঘোষনা করিতেছে যে, যত সৃষ্টি রহিয়াছে সব ধ্বংস হইয়া যাইবে।

☆ নাজাতের পথ ঐ ব্যক্তিরই দৃষ্টিগোচর হইবে যে লোভ-লালসা হইতে বাঁচিয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

☆ যে মাখলুকের আগে আল্লাহকে দেখিবে সে সৃষ্টিকর্তার মোকাবিলায় সৃষ্টিকে পরিহার করিবে।

☆ যে এই রাস্তায় চলে নূর তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। যাহার রূপ এই দিকে সমস্ত ভেদ তাহার কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

☆ উঠ, দেখ সমস্ত মাখলুক তাঁহার নূরে পরিবেষ্টিত এবং প্রভাত নিকটবর্তী। তিনিই ইহা উদয় করিয়াছেন।

☆ তাঁহার দাস হইয়া তুমি তাঁহার নির্দেশের প্রতি অনুগত হইয়া যাও। ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার কর। ইহাতে কোন ফায়দা নাই।

☆ ব্যবস্থা অবলম্বন কি করিবে? ফয়সালাদাতা তো অন্য কেহ। বরং ইহা

অবলম্বনের দ্বারা আল্লাহর হুকুমের সাথে প্রকাশ্য ঝগড়া করিবে।

☆ নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা মিটাইয়া দাও। ভালভাবে শুনিয়া লও যে, ইহা বড় উদ্দেশ্য।

☆ পূর্ববর্তী লোকজন এইভাবেই চলিয়াছিল। ফলে তাহারা উদ্দেশ্য অর্জন করিয়াছিল। বৃদ্ধ হউক বা যুবক হউক এইভাবেই চলিবে। (অর্থাৎ চলা উচিত)

আল্লাহ্ পাকের এমন এমন বান্দাও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্ পাকের শিক্ষা ও আদব লাভ করিয়া নিজেদের ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের নিজেদের জন্য নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্ পাকের শিক্ষা ও আদব প্রদানের নূর তাহাদের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার পরিচয় ও রহস্য তাহাদের পাহাড়সম এখতিয়ার চুরচুর করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহার প্রতি রাজী থাকার পর্যায়ে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা এই পর্যায়ের স্বাদও পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা এই ভয়ে প্রার্থনা করা শুরু করিয়াছে যে, যাহাতে তাহারা রাজী থাকার স্বাদের মধ্যে লিপ্ত হইয়া ইহার দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আমি প্রথম প্রথম নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ অনুসরণ করিয়াছিলাম। আমি কি কি নেক কাজ করিব ইহার পরিকল্পনা করিতাম। আর ইহার জন্য কি কি পথ ও মাধ্যম প্রয়োজন হইবে উহা প্রস্তুত করিবার চিন্তা ভাবনা করিতাম। কোন কোন সময় মনে মনে বলিতাম যে, ময়দান এবং জঙ্গলে গিয়া পড়িয়া থাকিব। আবার কোন কোন সময় ভাবিতাম যে, শহর এবং জনপদে গিয়া পড়িয়া থাকিব। কেননা সেখানে ওলী এবং নেককারদের সংশ্রব পাওয়া যাইবে। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এক ওলীর প্রশংসা করিল। তিনি পশ্চিম দেশের কোন এক পাহাড়ে অবস্থান করিতেছেন। আমি সে পাহাড়ে আরোহন করিলাম। রাত্রে তাহার কাছে পৌঁছিলাম। আর তখনই তাহার খেদমতে হাযির হওয়া সঙ্গত মনে করিলাম। আমি শুনিতে পাইলাম যে, তিনি দোয়া করিতেছেন, হে এলাহি। অনেক মানুষ আপনার কাছে দোয়া করে আপনি যেন মাখলুককে তাহাদের অধীন করিয়া দেন। আর আপনি তাহাদিগকে ইহা দান করেন। তাহারা ইহার উপর রাজী হইয়া যায়। হে এলাহী! আপনার কাছে আমার প্রার্থনা হইল এই যে, সমস্ত মাখলুক যেন আমার প্রতিকূলে হইয়া যায় আর আপনি ব্যতীত আমার কোন আশ্রয় না থাকে। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আমি মনকে বলিলাম, হে

মন! চিন্তা করিয়া দেখ যে এই ওলী কোন সমুদ্র দিয়া চলিতেছেন। অতঃপর আমি ঐ রাত্রে তাহার সাথে সাক্ষাৎ না করিয়া তথায়ই অবস্থান করিলাম। প্রত্যুষে তাহার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম হে জনাব! কি অবস্থায় আছেন। তিনি জবাব দিলেন তুমি নিজের জন্য নিজে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাক এবং নিজে এখতিয়ার খাটাইয়া কাজ কর এই জন্য তোমার যেমন অস্থিরতার আপত্তি রহিয়াছে তদ্রুপ আল্লাহর কাছে নিজকে সোপর্দ করার এবং তাহার প্রতি রাজী থাকার অস্থিরতার আপত্তি আমারও রহিয়াছে।

আমি বলিলাম, হযরত! নিজের এখতিয়ারে কোন কিছু করার এবং নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন করার যে কি মজা তাহা আমি পাইয়াছি এবং এখনও পাইতেছি। কিন্তু আপনি তো আল্লাহর প্রতি নিজকে সোপর্দ করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি রাজী আছেন ইহাতে আপনার অস্থিরতার আপত্তি কেন হইবে? আমার তাহা বুঝে আসে না।

তিনি বলিলেন, আমার এইরূপ বলার কারণ হইল যে, আমার ভয় হইতেছে না জানি আমি এই দুইটি জিনিসের মজায় পতিত হইয়া আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়া পড়ি।

অতঃপর আমি বলিলাম, হযরত! গতরাত্রে আমি শুনিয়াছি যে, আপনি দোয়া করিতেছেন হে এলাহী! অনেক লোক আপনার কাছে দোয়া করে আপনি যেন মাখলুক তাহাদের অধীন করিয়া দেন। আর আপনি তাহাদিগকে তাহা দান করেন। ফলে তাহারা আপনার প্রতি রাজী হইয়া যায়। হে এলাহী! আপনার কাছে আমার আবেদন হইল এই যে, সমস্ত মাখলুক যেন আমার প্রতিকূলে থাকে। আর একমাত্র আপনিই আমার আশ্রয় থাকেন। ইহার কারণ কি? তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, হে আমার বৎস। হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় মাখলুককে আমার অধীন করিয়া দিন। ইহা বলা অপেক্ষা হে আল্লাহ! আপনি আমার হইয়া যান। ইহা বলা উত্তম। খুব চিন্তা করিয়া দেখ যে, সমস্ত মাখলুক যদিও তোমার হইয়া যায় ইহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। সুতরাং মাখলুকের সাহায্য গ্রহণ করা কত কম হিম্মতের কথা।

হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্রের পানিতে ডুবার ঘটনা

হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনান পানিতে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে সে নিজের গৃহীত ব্যবস্থার আশ্রয় লইয়াছিল। আল্লাহ পাক হযরত

নূহ (আঃ) এবং তাহার নৌকার লোকদের জন্য যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কেনান উহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। হযরত নূহ (আঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন বৎস! তুমিও আমাদের সাথে নৌকায় আরোহন কর। কাফেরদের সাথে যাইও না। সে জবাব দিল যে, আমি কোন এক পাহাড়ে উঠিয়া পড়িব। আর সে পাহাড় আমাকে রক্ষা করিবে। তিনি বলিলেন, আল্লাহর আযাব হইতে আজ কেহই বাঁচিতে পারিবে না। তবে যাহার প্রতি তাঁহার মেহেরবানী হয় একমাত্র সে বাঁচিতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে সে নিজের বিবেকের পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। বাহ্যিকভাবে সে যে পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহার বিবেকের পাহাড়ের বাহ্যিক রূপ। অতঃপর তাহার শোচনীয় পরিনতির কথা কুরআনে বর্ণনা করা হইয়াছে।

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ *

"তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি তরঙ্গ প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িল। ফলে সে নিমজ্জিত হইয়া গেল।" বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, সে নিমজ্জিত হইয়াছে বন্যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিমজ্জিত হইয়াছে বঞ্চনায়।

সুতরাং (আল্লাহ পাক যেন বলিতেছেন) হে বান্দা সকল! এই ঘটনা থেকে সামান্য হইলেও শিক্ষা গ্রহণ কর। তাকদীরের তরঙ্গ যখন তোমাকে থাপ্পর মারিবে তখন নিজের বিবেকের বাতিল পাহাড়ের দিকে চলিও না। ইহার ফলে বিচ্ছেদের সাগরে পতিত হইবে। সুতরাং স্বীয় বিবেকের আশ্রয় লইয়া বিচ্ছেদের সাগরে পতিত হইও না। বরং এই সময় তাওয়াক্কুলের নৌকায় আরোহন করিও। জানিয়া রাখ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আশ্রয় লইয়াছে সে সোজা ও সরল পথে উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ঠ। সুতরাং যখন এই রূপ করিবে তখন নাজাতের নৌকা তোমাকে লইয়া নিরাপত্তার জুদী পাহাড়ে গিয়া থামিবে। অতঃপর তুমি এই নিরাপদ পাহাড়ে অবতরণ করিবে নিরাপদ নৈকট্য অর্জনের সাথে আর মিলনের বরকত হাসিলের মাধ্যমে। আর এই বরকত নাযিল হইবে তোমার উপর ও তোমার সাথীদের উপর। বিষয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও; অসতর্ক হইও না। স্বীয় প্রভুর ইবাদত কর। মূর্খ থাকিও না। সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগকরন এবং এখতিয়ার বর্জন খুব জরুরী জিনিস। একীনওয়ালা ইহা অপরিহার্য বিষয় বলিয়া মনে করে। আর ইবাদতকারীরা ইহা অনুসন্ধান করিতে থাকে। আহলে মারেফাত ইহার মাধ্যমে নিজকে সজ্জিত করিয়া তোলে। তাই ইহা উচ্চমর্যাদা দানকারী জিনিস।

আমি কাবা ঘরের পার্শ্বেই এক আরেফ (আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত) ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেন? তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা আমার কদম অতিক্রম করিতে পারে না। (অর্থাৎ কোন কাজ করার পূর্বে আমার ইচ্ছা থাকে না। যখন যাহা হওয়ার আল্লাহর ইচ্ছায় হইতেছে)

কোন এক বুযুর্গ বলেন, যদি জান্নাতবাসীরা জান্নাতে চলিয়া যায় আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলিয়া যায় শুধু আমি একাকী বসিয়া থাকি, তখন জান্নাত জাহান্নামের কোথায় আমার স্থান হইবে। এই পার্থক্য আমার থাকিবে না। সব আমার জন্য বরাবর।

সুতরাং এমন অবস্থা ঐ ব্যক্তির মধ্যেই হইতে পারে যাহার সমস্ত এখতিয়ার ও ইচ্ছা মিটিয়া গিয়াছে। আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সামনে তাহার কোন ইচ্ছা না থাকে। আদিকালের কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরের পর্যায়ে রহিয়াছে।[১] আবু হাফছ হাদ্দাদ (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি ইহা পছন্দ করিয়া আসিতেছি। আর আমাকে যে অবস্থার দিকে লইয়া যাইতেছেন আমি ইহার জন্য নাখোশ নহি।

এক বুযুর্গ আমাকে বলিয়াছেন, আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত চাহিতেছি আমার যেন কোন খাহেশ (চাহিদা) না থাকে। যাহাতে এমন জিনিস যাহার চাহিদা আমার অন্তরে উদ্ভব হয় তাহা পরিহার করিতে পারি। কেননা চাহিদা না থাকিলেই এমন জিনিস পরিহার করা সম্ভব হইবে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলাম যে, আমার মনে কোন জিনিসের চাহিদাই পাওয়া যায় না। যাহা পরিহার করিয়া চাহিদা না করার চাহিদা পূরণ করিতে পারি।

ইহা এমন এক ধরণের অন্তর আল্লাহ পাক স্বয়ং যাহার সাহায্য সহযোগীতা করিতেছেন এবং ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ *

আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোমার কোন জোরজবরদস্তি চলিবে না। ইহার কারণ আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসাবে থাকার ক্ষেত্রে অটল থাকা, আল্লাহকে প্রভু মানিয়া থাকার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাকা। তাঁহার সামনে বান্দাকে কোন এখতিয়ার

১। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাহার তকদীরে যাহা রাখিয়াছেন তাহা অবশ্যই হইবে। আমার ইচ্ছা ইহারই মোতাবেক।

থাকিতে, কোন গোনাহ্ করিতে এবং কোন কলুষতায় জড়াইয়া পড়িতে দেয় না। আল্লাহ্ পাক বলেন, যাহারা স্বীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাহার প্রতি ভরসা করে তাহাদের উপর শয়তানের কোন জোর চলে না। সুতরাং যে সকল অন্তরে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ চলে না উহার মধ্যে নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বনের কুমন্ত্রনা কোথায় থেকে আসিবে এবং তাহার দ্বারা এই অন্তর কিভাবে ময়লাযুক্ত হইবে।

অত্র আয়াতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা ঈমান ও তাওয়াক্কুল ঠিক করিবে তাহাদের উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ চলিবে না। কেননা শয়তান দুইভাবে আসে। হয়তবা সে আকিদার (অর্থাৎ বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করিবে। অথবা বান্দাকে মাখলুকের দিকে ঝুঁকাইয়া মাখলুকের উপর তাহাকে নির্ভরশীল করিয়া তুলিবে। সন্দেহ থেকে মুক্তি লাভ হইবে ঈমানের দ্বারা আর মাখলুকের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া থেকে মুক্তি লাভ হইবে তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে।

সতর্কতা ঃ কখনও কখনও ঈমানদারকে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিপদাপদ ও ঝাঞ্ঝাট পাইয়া বসে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাহা ঈমানদারের মধ্যে বহাল থাকিতে দেন না। যেমন আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন, আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদের অভিভাবক। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া যান। অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদিগকে ব্যবস্থা অবলম্বন করার অন্ধকার হইতে সমর্পনের আলোর দিকে লইয়া যান।" অসত্যের অস্থিরতার উপর সত্যের সুদৃঢ়তাকে বিজয়ী করেন। সুতরাং তিনি অসত্যের স্তম্ভসমূহকে নড়বড় করিয়া দেন। ইহার ইমারত ধ্বংস করিয়া দেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন, বরং আমি মিথ্যার উপর সত্যকে ছুড়িয়া মারি। আর সত্য মিথ্যার মস্তিষ্ক ভাঙ্গিয়া ফেলে। ফলে বাতিল দূরীভূত হইতে থাকে। যদিও ঈমানদারের মধ্যে অস্থিরতা এবং নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বনের বিপদাপদ আসিয়া থাকে। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। বরং আসিবার পরই আবার দূরীভূত হইয়া যায়। কেননা ঈমানের নূর তাহাদের অন্তরে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার নূর তাহাদের অবাধ্য প্রবৃত্তিকে দমাইয়া দিয়াছে। ইহার নূর তাহাদের অবাধ্য প্রবৃত্তিকে দমাইয়া দিয়াছে, ইহার জ্যোতি তাহাদের অন্তর ভরপুর করিয়া দিয়াছে। ইহার প্রভা তাহাদের বক্ষ খুলিয়া দিয়াছে। বরং কখনও কখনও তাহাদের ঈমানী সজাগতায় তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা সংযুক্ত হয়। এই অবস্থায় ব্যবস্থা অবলম্বনের কাল্পনিক আকৃতির জন্ম লাভ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতঃপর যখন সেই তন্দ্রা দূরীভূত হইয়া ঈমানী সজাগতা শক্তিশালী হইয়া উঠে তখন তাহার ব্যবস্থা অবলম্বনের

কাল্পনিক ছবি দূরীভূত হইয়া যায়।

আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ× مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ *

নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহকে ভয় করে যখন কোন শয়তানী খেয়াল তাহাদিগকে স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ তাহারা হুশিয়ার হইয়া উঠে। সুতরাং তখনই তাহারা দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া যায়।

অত্র আয়াতে কয়েকটি ফায়দার কথা রহিয়াছে

প্রথম ফায়দা ঃ اذا مسهم আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, মৌলিকভাবে তাহারা শয়তানী কুমন্ত্রনা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে যদি কখনও এইরূপ হয় (অর্থাৎ শয়তানী খেয়াল স্পর্শ করে। তাহা ঘটনাচক্রে হয়। সুতরাং তাহাদের অন্তরে যে ঈমান আমানত রাখা হইয়াছে অত্র আয়াতে তাহা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা যদি তাহারা সর্বদা শয়তানের কুমন্ত্রনায় গ্রেপ্তার থাকে তাহা হইলে আল্লাহ পাক এইরূপ বলিতেন না। যখন তাহাদিগকে শয়তানী খেয়াল স্পর্শ করে কারণ তাহাদের এইরূপ প্রশংসা করার দ্বারা বুঝা গেল যে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে এই ধারণা ছিল না পরে এই ধারণা আসিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে।

দ্বিতীয় ফায়দা ঃ اذا مسهم আয়াতাংশে مسهم বলা হইয়াছে। امسكهم বা اخذهم বলা হয় নাই। مس (মাস্) শব্দের অর্থ স্পর্শ করা। আর اخذ বা امسك শব্দের অর্থ ধরা। অধিকন্তু স্পর্শ করার অর্থে স্থায়িত্ব নাই। ইহা দীর্ঘায়িত হয় না। সুতাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহাদের অন্তরে শয়তানী খেয়াল জমা হয় না। বরং এমনিতেই সামান্য পরিমাণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। কাফেরদের ন্যায় তাহাদের অন্তরে এই বদখেয়াল দীর্ঘায়িত হয় না। কাফের ও মুসলমানদের এই ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়ার কারণ শয়তান কাফেরের উপর প্রাধাণ্য বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদের অন্তরের পাহারাদার বিবেক যখন সমান্য তন্দ্রায় আসে তখন শয়তান তাহাদের অন্তর থেকে কোন কিছু লইয়া পলায়ন করিতে থাকে। অতঃপর বিবেক যখন জাগ্রত হইয়া উঠে থাকে অন্তরের ক্ষমা প্রার্থনা, লজ্জাবোধ এবং আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতা নামক সেনাবাহিনী মাথাচাড়া দিয়া উঠে তখন শয়তান যাহা লইয়া পলায়ন করিতে থাকে তাহা সম্পূর্ণ ফিরাইয়া আনে এবং সে যাহা লুট করিয়া লয় তাহা উদ্ধার করিয়া আনে।

×। طيف শব্দ যোগে আয়াত গ্রন্থকারের কেরাত মোতাবেক বর্ণিত।

তৃতীয় ফায়দা ঃ طيف শব্দ উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সর্বদা যে অন্তর সজাগ থাকে উহার মধ্যে শয়তান আসিতে পারে না। কেননা শয়তানী খেয়াল অন্তরে তখনই আসে যখন অন্তর গাফেল হইয়া পড়ে। সুতরাং সে ঘুমায় না শয়তানী খেয়াল তাহার কাছেও আসিতে পারে না।

চতুর্থ ফায়দা ঃ আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে طيف শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। مسهم وارد (অর্থাৎ তাহাদিগকে অবতরণকারী কোন জিনিস স্পর্শ করিয়াছে) বা সমার্থক কোন শব্দ বলেন নাই। প্রকৃতপক্ষে طيف শব্দের অর্থ স্বপ্নে দৃষ্ট খেয়াল বা ধারণা। সুতরাং ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। বাস্তবক্ষেত্রে ইহা অস্তিত্বহীন। ইহা একটি কল্পনা মাত্র। আল্লাহ পাক এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে এই ধরণের শয়তানী খেয়ালের দ্বারা তাকওয়াওয়ালা লোকদের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা শয়তান তাহাদিগকে যাহা দেখাইতেছে তাহা স্বপ্নে দৃষ্ট কাল্পনিক জিনিসের সাথে তুলনা করা যায়। আর স্বপ্নে যাহা দেখা যায় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর উহার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পঞ্চম ফায়দা ঃ অত্র আয়াতে تذكروا শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ذكروا শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। এইরূপ করার পিছনে হেকমত এই যে, শুধু যিকর গাফলতি দূর করিতে পারে না যখন অন্তর এইদিকে মনোনিবেশ না করে। অবশ্য 'তাযাক্কুর' (উপদেশ গ্রহণ করা) এবং 'ইতিবার' (শিক্ষা গ্রহণ করা) গাফলতি দূর করিতে পারে যদিও যিক্‌র না পাওয়া যায়। কেননা যিক্‌র হয় জিহবার দ্বারা আর 'তাযাক্কুর' বা উপদেশ গ্রহণ হয় অন্তরের দ্বারা। শয়তানী খেয়াল আসে অন্তরের মধ্যে, জিহবার মধ্যে নয়। সুতরাং ইহা দূরীকারক ও অন্তরে অবতরণ করা উচিত। যাহাতে ইহার প্রভাবে শয়তানী খেয়াল দূরীভূত হয়। আর ইহা তাযাক্কুরের দ্বারা সম্ভব; যিকিরের দ্বারা নয়।

ষষ্ঠ ফায়দা ঃ অত্র আয়াতে تذكر (তাযাক্কুর) শব্দের কর্ম উহ্য রাখা হইয়াছে। এমন বলেন নাই تذكروا الجنة অথবা تذكروا النار অথবা تذكروا العقوبة অথবা এই ধরণের কোন কথা বলেন নাই। এই শব্দের কর্ম উহ্য করিয়া দেওয়ার মধ্যে বড় ফায়দা রহিয়াছে। তাহা এই যে, তাযাক্কুর একীনওয়ালাদের অন্তর থেকে শয়তানী খেয়াল মিটাইয়া দেয়। সমস্ত নবী, রাসূল, আওলিয়া, সিদ্দীক, নেককার এবং সকল মুসলমান তাকওয়াওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য সকলের তাকওয়া এক পর্যায়ের নহে। প্রত্যেকের তাকওয়া তাহার অবস্থা ও স্তর মোতাবেক হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকের তাযাক্কুর (উপদেশ গ্রহণ করা)

তাহার তাকওয়ার স্তর উপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং সকলের তাকওয়া এক নয় আবার সকলের তাযাক্কুরও এক নয়। সুতরাং যদি কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর তাযাক্কুরের কথা উল্লেখ করা হইত তাহা হইলে শুধু এই ব্যক্তি বা শ্রেণীই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইত। অন্যান্যরা বাদ পড়িয়া যাইত। উদাহরণ স্বরূপ- যদি এমন বলা হইত

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا الْعُقُوبَةَ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ *

তাহা হইলে যাহারা সাওয়াবের মাধ্যমে নসিহত হাসিল করে তাহারা বাদ পড়িয়া যাইত। আর যদি এইভাবে বলিত تذكوا سائق الاحسان অর্থাৎ তাহারা প্রথম ইহসান থেকে নসিহত কবুল করে তাহা হইলে যাহারা পরবর্তী এহসান থেকে নসিহত কবুল করে তাহারা বাদ পড়িয়া যাইত। অনুরূপভাবে যে কোন কর্মকে উল্লেখ করিত অনুল্লেখিত কর্ম বাদ পড়িয়া যাইত। আল্লাহ পাক কোন বিশেষ কর্ম উল্লেখ না করার ফলে নসিহত কবুল করার সমস্ত স্তর আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তম ফায়দা : আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে تذكروا فاذا هم مبصرون বলিয়াছেন। কিন্তু تذكروا فابصروا বলেন নাই বা تذكوا وابصروا বলেন নাই বা تذكروا ثم ابصروا বলেন নাই।

অত্র আয়াতে উদ্দেশ্য এই কথা বর্ণনা করা যে, তাহারা দৃষ্টিসম্পন্ন হয় বা তাহারা মনোনিবিষ্ট হয় তাহাদের হুশিয়ার হওয়ার কারণে। অর্থাৎ তাহাদের হুশিয়ার হওয়ার ফল স্বরূপ তাহারা দৃষ্টিসম্পন্ন বা মনোনির্বিষ্ট হইয়াছে। আর আরবী ভাষায় 'ফা' বর্ণটি ব্যবহার হয় সবব বা কারণ বর্ণনা করার জন্য। তাই এখানে 'ওয়াও' বা 'ছুম্মা' ব্যবহার করা হয় নাই। কারণ 'ওয়াও' বা ছুম্মা শব্দ আরবী ভাষায় কারণ বর্ণনার অর্থ প্রকাশ করে না। ছুম্মা ব্যবহার না করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ছুম্মা শব্দটি ব্যবহার করা উদ্দেশ্য পরিপন্থী হয়। কেননা আরবী ভাষায় ছুম্মা শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিলম্ব বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ ছুম্মা শব্দ ব্যবহার করিলে ইহার অর্থ হইবে ছুম্মা শব্দের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়টির অনেক পরে ছুম্মা শব্দের পরে উল্লিখিত বিষয়টি হইয়াছে। কিন্তু অত্র আয়াতে আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হইল এই কথা বুঝানো যে, তাহাদের দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া তাহাদের হুশিয়ার হওয়া হইতে বিলম্ব হয় নাই। বরং তাহারা হুশিয়ার হওয়ার সাথে সাথেই তাহারা দৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ মনোনিবিষ্ট হয়।

যদিও 'ফা' শব্দ ব্যবহার করা একদিক দিয়া যথোপযুক্ত হইয়াছে। তবুও শুধু 'ফা' ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই কেননা শুধু 'ফা' ব্যবহার করিলেও উদ্দেশ্য

হাসিল হয় না বরং উদ্দেশ্য পরিপন্থী হয়। কেননা 'ফা শব্দ ব্যবহার করা হয় কারণ বুঝানোর সাথে সাথে আগে পিছের অর্থ বুঝানের জন্যও। আর অত্র আয়াতে ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, তাহারা হুশিয়ার হওয়ার পরে তাহারা দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। এই জন্য 'ফা' শব্দ ব্যবহার করিয়া সাথে সাথে اذا শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। বলিয়াছেন, فاذا هم مبصرون যেন তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তাহারা সর্বদাই দৃষ্টি সম্পন্ন থাকার গুণে গুণান্বিত থাকে। ইহাতে আল্লাহ পাক তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাদের প্রতি তাহার এহসানের প্রাচুর্যতার কথা প্রকাশ করিতেছেন। উদাহারণ স্বরূপ যেমন একজন বলিল, تذكر زيد المسئلة فاذا هى صحيحة (যায়দের মাসআলাটি স্মরণ হইয়াছে তখন সে তাহা বিশুদ্ধ পাইয়াছে।) অত্র উদাহরণে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে এই কথা স্পষ্ট যে, সে মাসআলাটি বিশুদ্ধ পাওয়ার পূর্বেও ইহা বিশুদ্ধ ছিল। আর এখনও ইহা বিশুদ্ধ পাইয়াছে। আয়াতের অর্থও ইহাই। তাকওয়াওয়ালারাও প্রথম থেকেই দৃষ্টি সম্পন্ন। কিন্তু নফসের মধ্যে শয়তানি খেয়াল আসার পর তাহার অর্ন্তদৃষ্টি লুকায়িত হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর যখন তাহাদের গাফলতির মেঘ দূরীভূত হয় তখন তাহাদের অর্ন্তদৃষ্টি চমকিয়া উঠে।

অষ্টম ফায়দা ঃ অত্র আয়াতে এবং অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত যতগুলি আয়াত রহিয়াছে তাহাতে তাকওয়াওয়ালাদের প্রতি খুব প্রশস্ততা দেখানো হইয়াছে। ঈমানদারদের প্রতি অনেক মেহেরবানী প্রদর্শন করা হইয়াছে। কেননা যদি আয়াতটি এইভাবে বলা হইত যে,

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا لَا يَمَسُّهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ *

অর্থাৎ তাকওয়াওয়ালাদের কখনও শয়তানী খেয়াল স্পর্শ করিতে পারে না।

তাহা হইলে নিষ্পাপ ব্যতীত অন্যান্য সকলে বাদ পড়িয়া যাইত। নবীগণ ও ফিরিশতাগণ নিষ্পাপ। সুতরাং নবীগণ ও ফিরিশতাগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলেই আল্লাহ পাকের রহমতের পরিধি হইতে বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু এইরূপ না বলিয়া তিনি নিজের রহমতের পরিধিকে প্রশস্ত করিতে চাহিলেন। তাই তিনি বলিলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ *

যাহাতে তুমি বুঝিতে পার যে, তাহাদের মধ্যে শয়তানী খেয়ালের আগমন তাহাদিগকে তাকওয়ার দায়রা থেকে এবং তাহাদের উপর এই নামজারী হওয়া থেকে বাহির করিয়া দেয় না। কেননা তাহারা সাথে সাথে হুশিয়ার হইয়া আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

এই আয়াতের ন্যায় অন্যান্য কয়েকটি আয়াত রহিয়াছে যাহাতে আশা করার ক্ষেত্রে বান্দাদের ব্যপকতার বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাওবাকারীদিগকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে ভালবাসেন। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক এইরূপ বলেন নাই-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ لَا يُذْنِبُوْنَ *

যাহারা গোনাহ করে না আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ভালবাসেন। কেননা যদি এইরূপ বলিতেন তাহা হইলে সামান্য কতক লোক মাত্র তাঁহার ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত হইত। আর অধিকাংশ লোক বাদ পড়িয়া যাইত। অধিকন্তু আল্লাহ পাক বান্দাদের সৃষ্টি করার সময় তাহাদের দেহ গঠনে যে দুর্বলতা ও অসতর্কতা রাখিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি কুরআনে পাকে ঘোষণা দিয়াছেন

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خَلَقَ الاِنْسَانَ ضَعِيْفًا *

আল্লাহ পাক তোমাদের বোঝা হালকা করিতে চাহিতেছেন এবং মানুষকে খুব দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোন কোন আলেম এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ কামভাবের উত্তেজনা যখন মানুষের উপর প্রাধান্য পাইয়া যায় তখন সে নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না। অন্য এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন-

هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض و اذا انتم اجنة *

আল্লাহ পাক তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জানেন, যখন তিনি তোমাদিগকে যমীন থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যখন তোমরা মায়ের উদরে কচি শিশু ছিলে।

এই সব আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানুষের উপর গোনাহ প্রাধান্য পাইয়া থাকে। আর আল্লাহ পাকও তাহাদের এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। তাই আল্লাহ পাক তাহাদের জন্য তাওবার দরজা প্রশস্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের সামনে তাওবার রাস্তা দেখাইলেন এবং তাওবা করার দিকে তাহাদিগকে আহবান করিলেন। এমনকি প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন যে, তাওবা কর কবুল করিব। আমার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আমি তোমার দিকে মনোনিবেশ করিব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন-

كل ابن ادم خطاؤون خير الخطائين التوابين *

“প্রত্যেকটি মানুষ অপরাধী। কিন্তু উত্তম অপরাধী হইল তাওবাকারী।”

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, অপরাধ তোমার অস্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। বরং অপরাধই তোমার অস্তিত্ব। অন্য একস্থানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন-

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ *

"তাহারা এমন লোক যখন তাহারা কোন অশ্লীল কাজ করিয়া বসে অথবা নিজের উপর জুলুম করে আর তখনই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের অপরাধের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কে আছেন যিনি গোনাহ মাফ করিতে পারেন এবং তাহারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা করে না। এই অবস্থায় যে তাহারা জানে। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক এইরূপ বলেন নাই যে الذين لا يفعلون الفاحشة তাহারা কোন গোনাহই করে নাই। অন্য একস্থানে বলিয়াছেন- و اذا ما غضبواهم يغفرون এবং যখন তাহারা গোস্বা হয় তখন মাফ করিয়া দেয়। এমন বলেন নাই যে, তাহারা গোস্বাই হয় না।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন- و الكاظمين الغيظ "গোস্বা হজম করনেওয়ালা" এমন বলেন নাই যে, তাহাদের গোস্বাই হয় না। এই সব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বনী আদম অপরাধী হয়। অপরাধী হওয়া কোন অসম্ভব বিষয় নয়। সুতরাং তাহাদের জন্য তাওবার দরজা প্রশস্ত করা হইয়াছে। এখানে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, তোমার প্রতি আল্লাহ পাকের মেহেরবানী হওয়া সন্দেহহীন বিষয়।

নবম ফায়দা ঃ তাকওয়াওয়ালাদের মধ্যে সতর্ক ব্যক্তিদের স্তরের বর্ণনা। কেননা সতর্ক হওয়া একটি ব্যাপক অর্থবাহক শব্দ। আর কি কারণে সতর্ক হইবে তাহা এই শব্দের পরে উল্লেখ করা হয় নাই। তাই যতগুলি কারণে সতর্ক হওয়া সম্ভব অত্র আয়াতে উল্লিখিত শব্দ ইহাদের প্রত্যেকটি শামিল করে।

তাকওয়াওয়ালাদের কোন শয়তানী খেয়াল স্পর্শ করিলেও তাহাদের তাকওয়া তাহাদিগকে স্বীয় প্রভুর নাফরমানীর মধ্যে অটল থাকিতে দেয় না। বরং তাহাদের তাযাক্কুর অর্থাৎ তাহাদের সতর্কতা তাহাদিগকে স্বীয় প্রভুর দিকে ফিরাইয়া লইয়া যায়। তাহাদের তাযাক্কুর অর্থাৎ সতর্কতা বিভিন্ন প্রকারের। কোন কোন লোক তো নাফরমানী থেকে ফিরিয়া আসিলে সওয়াব পাইবে এই আশায় সতর্ক হইয়া যায়। আবার কেহ কেহ আযাবের ভয়ে, কেহ কেহ এই

ভয়ে যে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সুতরাং সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে সতর্ক হইয়া যায়। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, নাফরমানী বর্জন করা বড়ই সওয়াবের কাজ। আবার কেহ কেহ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অতীত নিয়ামতের কথা স্বরণ কলিয়া নাফরমানী করিতে লজ্জা বোধ করে। কেহ কেহ আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুত এহসানের কথা স্বরণ করিয়া তাহার সাথে কুফুরী করিতে লজ্জা বোধ করে। কেহ কেহ আল্লাহর নৈকট্য লাভকে স্বরণ করে। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, আল্লাহ পাক পরিব্যাপ্তকারী। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, আল্লাহ সবকিছু দেখিতে পান। সুতরাং তাঁহার নাফরমানী কিভাবে করা যায়? কেহ কেহ আল্লাহ পাকের ওয়াদার কথা স্বরণ করে। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, গোনাহের স্বাদ অস্থায়ী কিন্তু ইহার শাস্তি স্থায়ী। তাই আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বাঁচিয়া থাকে। কেহ কেহ আল্লাহ পাকের নাফরমানীর পরিনাম ও ইহার ফলে লজ্জিত হওয়ার কথা স্বরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। কেহ কেহ তাঁহার ফরমাবরদারীর উপকারীতা ও ইহার ফলে প্রাপ্য সম্মানের কথা স্বরণ করিয়া ফরমাবরদারীর পথ চলিতে থাকে। কেহ কেহ স্বরণ করে যে, আল্লাহ পাকই সবকিছু কায়েম রাখেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার মর্যাদা ও ক্ষমতার কথা স্বরণ করিয়া নাফরমানী থেকে ফিরিয়া আসে। অনুরূপভাবে যে যে জিনিসের সাথে সতর্ক হওয়া সম্পর্কিত হইতে পারে ইহাদের প্রত্যেকটি তাহাদের সতর্কতার কারণ হইতে পারে। কোন সংখ্যার মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নয়। আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করিলাম যাহাতে তাকওয়াওয়ালাদের অবস্থাসমূহের সাথে তোমার সম্পর্ক হইয়া যায় এবং সূক্ষ্মদর্শীদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে তুমি অবগত হইতে পার।

দশম ফায়দা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত طيف (তায়ফুন) শব্দের অর্থ শয়তানী খেয়াল। অর্থাৎ স্বপ্নের ন্যায় এক প্রকার খেয়াল যাহার স্থায়িত্ব নাই। কিন্তু এই শব্দটি এখানে কুমন্ত্রনা এবং মনের ভীতিমূলক চিন্তার অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে যাহা শয়তান মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে।

মনের ভীতিমূলক চিন্তাকে طيف (তাইফ) এই জন্য বলা হয় যে, এই ধরণের চিন্তা বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে আসিতে থাকে যেন ইহা মনকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আর طيف শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রদক্ষিণ করা। অত্র আয়াতের জন্য কেরাতে এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন অন্য এক কেরাতে আছে। اذا مسهم طائف যখন তাহাদিগকে প্রদক্ষিণকারী স্পর্শ করে। আর কুরআন ব্যাখ্যার বিধানসমূহের মধ্যে এক বিধান এই যে, যদি এক আয়াত

একাধিক কেরাতে পড়া যায় তাহা হইলে এক কেরাত অপর কেরাতের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। অধিকন্তু কুমন্ত্রনাও মনের চারিদিকে চক্কর লাগাইতে থাকে। যখনই একীনের দেয়ালে কোন ছিদ্র পায় তখনই উক্ত ছিদ্র দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করে। আর যদি কোন ছিদ্র না পায় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

অন্তর, একীনের বিভিন্ন পর্যায় এবং উহার চারিদিকে পরিবেষ্টনকারী নূরের উদাহরণ দেওয়া যায় একটি শহর ও দূর্গের দ্বারা যাহার চারিদিক সূদৃঢ় দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং অন্তর শহর ও একীনের পর্যায়সমূহ দূর্গসমূহের সাথে তুল্য। আর ইহার চারিদিকে পরিবেষ্টনকারী নূর দেওয়ালের সাথে তুলনীয়। সুতরাং যে ব্যক্তির অন্তর একীনের দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর স্বীয় একীনও দুরস্ত করিয়া লইয়াছে। তাহার কাছে শয়তান পৌঁছিতে পারে না। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

ان عبادی لیس لك علیهم سلطان *

নিশ্চয় আমার খাছ বান্দাদের উপর তোর কোন নিয়ন্ত্রন চলিবে না।

যেহেতু তাহারা নিজেরা আমার প্রকৃত দাসে পরিণত হইয়াছে। আমার নির্দেশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণও দ্বিধা সংকোচ করে না। আমার গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্যও দ্বন্দ্ব করে না। বরং আমার প্রতি তাওয়াক্কুল করে। নিজকে আমার কাছে সমর্পন করিয়া দিয়াছে। আর এই জন্যই আল্লাহ পাক তাহাদিগকে সাহায্য সহযোগীতা করেন। তাহাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখেন। তাহারা নিজেদের অন্তরসমূহকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়াছে ফলে আল্লাহ পাকও তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া গিয়াছেন। কোন বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, শয়তানের মোকাবিলায় আপনি কিভাবে মুজাহিদা করিয়া থাকেন। তিনি জবাব দিলেন শয়তান আবার কোন বালা? আমরা তো আমাদের সমস্ত শক্তি সাহস আল্লাহর প্রতি ঝুঁকাইয়া দিয়াছি। ফলে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যথেষ্ঠ হইয়াছেন।

তাহার এই জবাবের সারকথা এই যে, আমাদের মুজাহিদা করার প্রয়োজনই হয় না। আমাদের পক্ষ হইতে আল্লাহ পাকই শয়তানকে দূরে সরাইয়া রাখেন।

আমি শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, আল্লাহ পাক যখন فاتخذوه عدوا নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের দুশমন; তোমরা

তাহাকে দুশমন মনে কর। বলিলেন, তখন তাঁহার সতর্কবাণীর অর্থ অনেকে এইরূপ বুঝিয়াছে যে, অত্র আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হইল মানুষ শয়তানের সাথে শত্রুতা পোষণ করিবে। তাই তাহারা শয়তানের শত্রুতায় নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। ফলে ইহা তাহাদিগকে নিজেদের মাহবুব হইতে গাফেল করিয়া দিল। আর অনেকে নিজেদের মাহবুব হইতে গাফেল করিয়া দিল। আর অনেকে এই আয়াতের অর্থ এইভাবে বুঝিল যে, শয়তান তোমাদের দুশমন। সুতরাং আল্লাহ তোমাদের বন্ধু। কারণ কোন কিছুর পরিচয় লাভের একটি সাধারণ নীতি হইল যে, কোন জিনিস ইহার বিপরীত জিনিস দ্বারা চিনা যায়। সুতরাং শয়তানকে দুশমন করিয়া ঘোষণা করার অপরিহার্য অর্থ হইল আল্লাহ বান্দার বন্ধু। তাই তাহারা আল্লাহকে মহব্বত করায় লাগিয়া গেল। ফলে আল্লাহ পাক তাহাদের জন্য যথেষ্ঠ হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি উপরে উল্লিখিত বুযুর্গের কিস্‌সা বর্ণনা করিলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের অবস্থা এই যে, যদি তাহারা শয়তানি থেকে পরিত্রান প্রার্থনা করে তাহাও এই জন্য করে যে, শয়তান থেকে পরিত্রান প্রার্থনা করা আল্লাহর হুকুম। এই জন্য নহে যে, তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষমতা আছে বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষমতা কিভাবে স্বীকার করিতে পারে যখন তাহারা আল্লাহ পাকের বাণী শুনিয়াছে

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ وَ اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ *

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও কথা চলে না। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না। অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا *

নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ *

নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ চলিবে না। অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ *

যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছে তাহাদের উপর তাহার কোন শক্তি চলে না।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন

وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ *

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ঠ।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ *

আল্লাহ পাক ঈমানদারদের অভিভাবক। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া যান।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ *

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং উল্লিখিত বিষয়বস্তুর অনুরূপ বিষয়বস্তু মুমিনদের অন্তর মজবুত করিয়া দিয়াছে এবং প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। যদি তাহারা শয়তানের হাত থেকে পরিত্রান প্রার্থনা করে তাহা হইলে ইহা করিয়া থাকে আল্লাহ পাকের নির্দেশ আছে বলিয়া।

যদি ঈমানী নূরের দ্বারা শয়তানের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে তাহাও আল্লাহ পাকের সহায়তায়। আর যদি তাহার ধোকা-বাজী হইতে নিরাপদ থাকে তাহাও আল্লাহ পাকের সহায়তা ও এহসানের মাধ্যমে।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, কোন এক সফরে থাকা অবস্থায় কোন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিল এবং বলিল যে আমলের তৌফিক পাওয়ার জন্য لا حول و لا قوة الا بالله অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী কোন কথা নাই। আল্লাহর দিকে দৌড়াইয়া যাওয়া এবং তাঁহার কাছে আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ কোন কার্য নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করে সে সোজা রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়।

অতঃপর সে নিজের অবস্থা সম্পর্কে বলিল, بسم الله আল্লাহ পাকের নামের সাহায্যে প্রার্থনা করিতেছি।

فررت الى الله আমি আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হইয়াছি।

اعتصمت بالله আমি আল্লাহর আশ্রয় করিয়াছি।

و لا حول و لا قوة الا بالله গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং ইবাদতে শক্তি পাওয়া একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই হয়।

و من يغفر الذنوب الا الله আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে?

সে আরও বলিল, بسم الله জিহবার কথা যাহা অন্তর থেকে বাহির হইয়া আসে। فررت الى الله ইহা রূহ এবং আত্মার অবস্থা اعتصمت بالله। ইহা বিবেক ও নফসের অবস্থা।

لا حول و لا قوة الا بالله ইহা উর্ধ্ব জগতের এবং নির্দেশ জগতের অবস্থা। و من يغفر الذنوب الا الله এই বাক্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বের এবং ইহাদের নিদর্শনের।

অতঃপর সে দোয়া করিল, হে আল্লাহ! আমি শয়তানের আমল হইতে আপনার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ও প্রতারক।

অতঃপর শয়তানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তোর সম্পর্কে আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই অবগত আছেন যে, তুই পথভ্রষ্ট প্রকাশ্য দুশমন। আমি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান লইয়াছি। তাঁহার প্রতি ভরসা করিয়াছি। আল্লাহর কাছে তোর হাত থেকে পরিত্রান পাওয়ার আশ্রয় চাহিতেছি। যদি তাঁহার নির্দেশ না হইত তাহা হইলে তোর হাত থেকে নিস্তারও চাহিতাম না। তোর হাত থেকে নিস্তার চাহিতে হইবে তুই এমনকি জিনিস? কেননা আল্লাহ পাক তো মহাপরাক্রমশালী, শক্তিমান। সুতরাং তাহার কাছে এমন জিনিস হইতে নিস্তার চাহিতে হইবে যাহা খুব মারাত্মক ও ভয়ানক হয়। আর তুই কি জিনিস? তুই তো অসহায়।

হে শ্রোতা! তুমি হয়ত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ যে তাহাদের অন্তরে শয়তানের এতটুকুও স্থান নাই যে শয়তানের শক্তি ও সামর্থ্য থাকিতে পারে। অর্থাৎ তাহাদের ধারণা যে, শয়তানের কোন এখতিয়ার নাই এবং কোন কিছু করার শক্তিও তাহার নাই।

শয়তানের সৃষ্টি রহস্য

শয়তান এমন এক সৃষ্টি যাহার দিকে গোনাহের কারণ সমূহের এবং কুফর, অসতর্কতা, ও ভুল প্রভৃতির অস্তিত্বের সম্পর্ক করা হয়। যেমন কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে

و ما انسانيه الا الشيطان *

হযরত ইউশা (আঃ) বলিলেন, শয়তান ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে ইহা ভুলাইয়া দেয় নাই।

অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে هذا من عمل الشيطان হযরত মুসা বলিলেন যে, কিবতীকে হত্যা করা শয়তানের আমলের কারণে হইয়াছে। সুতরাং শয়তান সৃষ্টির হেকমত হইল উল্লিখিত কার্যগুলির ন্যায় বিভিন্ন কার্যের ময়লা আবর্জনা তাহার গায়ে মুছা। এই জন্য কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন যে, শয়তান এই জগতকে পরিস্কার করে। সমস্ত গোনাহ অপরাধ এবং অপবিত্র আমলের ময়লা আবর্জনা তাহার দ্বারা 'মুছিয়া ফেলা যায়। আল্লাহ যদি চাহিতেন যে জগতে গোনাহ না হউক তাহা হইলে শয়তানও সৃষ্টি করিতেন না।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, শয়তান পুরুষতুল্য। আর নফস (প্রবৃত্তি) নারী তুল্য। উভয়ের সংস্পর্শে গোনাহ জন্ম লাভ করে। যেমন পুরুষ নারীর সংস্পর্শে তাহাদের মধ্য হইতে সন্তান জন্ম লাভ করে। পিতামাতা কখনও সন্তান সৃষ্টি করে না। তবে তাহাদের মাধ্যমে সন্তান প্রকাশ পায় মাত্র। শায়খ আবুল হাসান সাহেবের এই ইরশাদের মূল কথা এই যে, যেমন যে কোন বিবেকবান এই বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষন করিবে না যে, সন্তান পিতা মাতা জন্ম দিয়াছে; কিন্তু সৃষ্টি করে নাই। যেহেতু উভয়ের মাধ্যমে সন্তান প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সেহেতু সন্তানকে উভয়ের দিকে সম্পর্কিত করা হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে এই সন্তান অমুক পিতা মাতার। অনুরূপভাবে কোন ঈমানদারের এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, গোনাহ নফস ও শয়তানের সৃষ্টি নয়। বরং ইহাদের মাধ্যমে গোনাহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাদের দিকে গোনাহ সম্পর্কিত করা হইয়া থাকে। তবে এই সম্পর্ক সৃষ্টিগত নয় বরং প্রকাশগত। সৃষ্টিগত সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে।

আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবাণীর দ্বারা ইবাদত সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি ন্যায়পরায়নতার গুণের চাহিদায় গোনাহ ও নাফরমানী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিজেই ইরশাদ করিয়াছেন–

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَالِهٰؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا *

হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলিয়া দিন যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। সুতরাং তাহাদের কি হইল যে, তাহারা কথাই বুঝে না।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ *

আল্লাহ পাক সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ *

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি?

অন্য এক স্থানে ইরশাদ করিয়াছেন

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ *

তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন আর যে সৃষ্টি করিতে পারে না উভয় কি সমান সমান? তবে কি তোমরা বুঝিতেছ না? অনুরূপভাবে আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা ঐ দলের কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে যাহারা দাবী করে যে, ভাল ভাল কল্যাণকর জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক। আর নাফরমানী ও অপরাধমূলক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক নহেন। অন্য একটি আয়াতে দেখ আল্লাহ পাক ঘোষণা করিতেছেন-

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ *

আল্লাহ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা যাহা আমল কর তাহাও সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্র আয়াতে ব্যবহৃত " ما " শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ভাল ও খারাপ উভয় প্রকার কর্ম বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ভাল এবং খারাপ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ পাক।

এই দলের পক্ষ হইতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ *

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মন্দ জিনিসের নির্দেশ দেন না। প্রশ্ন হইল যে, অত্র আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক যেহেতু মন্দ জিনিসের নির্দেশ দেন না সুতরাং তিনি ইহা সৃষ্টি করিবেন কিভাবে? এই প্রশ্নের জবাব এই যে, অত্র আয়াতে 'আমর' (নির্দেশ) শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। 'আমর' এক জিনিস আর 'কাযা' (সৃষ্টি) অন্য জিনিস। শরয়ী বিধানের নির্দেশ হইল 'আমর' আর সৃষ্টি সম্পর্কিত হুকুমের নাম 'কাযা'।

আল্লাহ্ পাক যাহা করেন না বলিয়া অত্র আয়াতে বলা হইয়াছে উহার সম্পর্ক আমরের সাথে বা শরয়ী বিধানের সাথে। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যাহা দাবী করিতেছে তাহা হইল সৃষ্টি সম্পর্কিত।

অন্য একটি আয়াতে রহিয়াছে

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَ مَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ *

তোমার কাছে মঙ্গলময় যাহা কিছু পৌঁছে তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আর মন্দ যাহা কিছু পৌঁছে তাহা তোমার নিজের পক্ষ হইতে। অত্র আয়াতের মাধ্যমেও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, এখানেও তো ভাল জিনিসের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে করা হইয়াছে। আর মন্দ জিনিসের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে না করিয়া বান্দার সাথে করা হইয়াছে।

এই প্রশ্নের জবাব এই যে, অত্র আয়াতে বান্দাদিগকে আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছে আমরা যেন ভাল জিনিস তাঁহার সাথে সম্পর্কিত করি। কেননা ভাল জিনিসের সম্পর্ক তাহার সাথে হওয়াই তাঁহার জন্য উপযুক্ত। আর মন্দ জিনিসের সম্পর্ক যেন আমাদের নিজেদের দিকে করি। কেননা আমাদের নিকৃষ্ট অস্তিত্বের সাথে ইহাই সামঞ্জস্য রাখে। আর এইরূপ করা সুন্দর আদবের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনাতেও অনুরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। নৌকা নষ্ট করিয়া দেওয়ার সময় তিনি বলিয়াছেন

فاردت ان اعيبها *

আমি ইচ্ছা করিয়াছি এই নৌকাটি দূষিত করিয়া দেওয়া।

ইয়াতীম শিশুদ্বয়ের দেওয়াল দুরস্ত করিয়া দেওয়ার সময় তিনি বলিয়াছেন

فاراد ربك ان يبلغا اشدهما *

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিয়াছেন যে, এই ইয়াতীম বালকদ্বয় যেন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। লক্ষ্য কর নৌকা দূষিত করার সময় ইচ্ছার সম্পর্ক করিয়াছেন নিজের সাথে। আর প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ প্রদানের সময় ইচ্ছার সম্পর্ক করিয়াছেন আল্লাহর সাথে। সুতরাং দূষিত করা মন্দ কাজ। কাজেই ইহা নিজের প্রতি সম্পর্কিত করিয়াছেন। আর প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ দেওয়া ভাল কাজ। সুতরাং ইহা স্বীয় প্রভুর দিকে সম্পর্কিত করিয়াছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলিয়াছেন.

وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ *

যখন আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি তখন তিনি আমাকে আরোগ্যতা দান করেন। এখানে এই কথা বলেন নাই যে, যখন তিনি আমাকে অসুস্থতা দান করেন তখন তিনি আমাকে আরোগ্যতা দান করেন। বরং অসুস্থতার সম্পর্ক নিজের দিকে করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি। আর আরোগ্য লাভের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আমাকে আরোগ্যতা দান করেন। অথচ আরোগ্যতার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক। অনুরূপভাবে অসুস্থতার সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ পাক।

সুতরাং ما اصابك من حسنة فمن الله এই বাক্যের অর্থ মঙ্গলময় জিনিস আল্লাহর পক্ষ হইতে সৃষ্টিগতভাবে। আর و ما اصابك من سيئة فمن نفسك ইহার অর্থ মন্দ কাজ তোমার পক্ষ হইতে কৃত হওয়া হিসাবে। অর্থাৎ ইহা তুমি সম্পাদন করিয়া থাক। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, الخير بيدك و الشر ليس اليك কল্যাণ তো আপনারই হাতে কিন্তু মন্দ জিনিস আপনার প্রতি সম্পর্কিত নহে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত ছিলেন যে, আল্লাহ পাক ভাল মন্দ উভয়ের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই লাভ-লোকসানের মালিক। কিন্তু প্রকাশ করিবার সময় আদবের প্রতি খেয়াল করিয়া তিনি বলিলেন যে, কল্যাণ আল্লাহর হাতে কিন্তু মন্দ জিনিস তাঁহার প্রতি সম্পর্কিত নয়।

এই পথভ্রষ্ট দলটি আরও একটি প্রশ্ন করিতে পারে যে, আল্লাহ পাক নাফরমানী ও অপরাধমূলক কার্য সৃষ্টি করা হইতেও পবিত্র। কেননা নাফরমানী ও অপরাধ মন্দ জিনিস। আল্লাহ পাক মন্দ জিনিস সৃষ্টি করিতে পারেন না। তিনি ইহা হইতেও পবিত্র। তাহাদের এই প্রশ্নের জবাব এই যে, নাফরমানী ও অপরাধমূলক কাজ বান্দার দিকে সম্পর্কিত হইলে মন্দ হইয়া যায়। কেননা বান্দার নাফরমানী ও অপরাধের অর্থ আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করা। সুতরাং ইহা মন্দ। প্রকৃতপক্ষে যে কাজটি মন্দ তাহা জন্মগত দিক বিচারে মন্দ নয়। বরং ইহাতে মন্দতা আসিয়াছে ইহা করা নিষিদ্ধ বলিয়া। অনুরূপভাবে যে কাজটি করা ভাল তাহা জন্মগত দিক বিচারে করা ভাল এমন কথা নয় বরং ইহার মধ্যে উত্তমতা আসিয়াছে ইহার করার নির্দেশ রহিয়াছে বলিয়া। কিন্তু আল্লাহর দিকে উভয় কাজকে সম্পর্কিত করিলে বলিতে হইবে যে, উভয় আল্লাহর মাখলুক। এই পর্যায় উভয় একই স্তরের ভালমন্দের বিচারের উর্ধ্বে। কবি বলেন-

کفر هم نسبت بخالق حکمت + چون بما نسبت کنی کفر آفت ست

সৃষ্টিকর্তার দিকে সম্পর্ক হিসাবে কুফরও একটি হেকমত। যখন তুমি ইহাকে আমার দিকে সম্পর্কিত করিবে তখন কুফর একটি বিপদ।

অতঃপর যদি তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে বলিতে গিয়া এতটুকু বলে যে, আল্লাহ পাক নাফরমানী ও অপরাধ সৃষ্টি করা হইতে পবিত্র। তাহা হইলে তাহাদের কথা দ্বারা আল্লাহ পাকের একগুণে ক্রটি প্রমাণ হয় তাহা তাহারা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। যেমন তাহারা যদি বলে যে, আল্লাহ পাক নাফরমাণী ও অপরাধ সৃষ্টি করা হইতে পবিত্র। তাহা হইলে তাহাদের মোকাবিলায় আমরা বলিব যে, আল্লাহ পাকের রাজত্বে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হওয়া হইতেও আল্লাহ পবিত্র। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তো কোন কিছু হইতেই পারে না। যদি নাফরমানী ও অপরাধ সৃষ্টি থেকে তিনি পবিত্র হন। আর ইহার সৃষ্টিকর্তা অন্য কেহ হয়। তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীতও অন্য কেহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। সুতরাং ইহার সৃষ্টির সাথে তাঁহার ইচ্ছার সম্পর্ক না হইলেও অসুবিধা নাই। ইহার দ্বারা অপরিহার্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের রাজত্বে তাঁহার ইচ্ছার পরিপন্থীও কোন কাজ হইতে পারে। আর ইহা তাঁহার ক্রটির দলীল। তাহাদের অভিমত মানিয়া লওয়ার পর আল্লাহ পাকের ক্রটি প্রমাণিত হয়। কবি বলেন-

دوستی بے دشمنی ست + حق تعالی زتین چنین خد ما غنی ست

জ্ঞানহীনের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা। আর আল্লাহ পাক এই ধরণের খেদমতের মুখাপেক্ষী নহেন।

খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও; আল্লাহ পাক আমাদিগকে এবং তোমাদিগকে যেন সোজা পথে পরিচালনা করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে যেন সত্য দ্বীনের উপর কায়েম রাখেন।

তদবীরের ফায়দা এবং তকদীরের অনানূকল্য

আল্লাহ পাক বলেন-

وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ * اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

ইবরাহীম ধর্মমত হইতে ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাইয়া রাখে যে মূলতঃ নির্বোধ

হয়। আর আমি তাহাকে দুনিয়াতে মনোনীত করিয়াছি এবং তিনি আখেরাতে অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত। যখন তাহাকে তাঁহার প্রভু বলিলেন, অনুগত হও, তিনি বলিলেন, আমি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হইলাম। তিনি আরও বলিয়াছেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ *

নিশ্চয়ই একমাত্র ইসলামই আল্লাহর কাছে ধর্ম।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ *

তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনি পূর্ব হইতেই তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন।

অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন-

فله اسلموا *

এবং তাঁহার অনুগত হইয়া যাও।

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ *

যদি তাহারা আপনার সাথে বিতর্ক করিতে আসে তখন আপনি বলিয়া দিন আমি স্বীয় মুখ মন্ডলকে আল্লাহ পাকের দিকে অনুগত করিয়াছি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও।

তিনি আরও বলেন-

وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ *

এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে দ্বীন হিসাবে অনুসরণ করে তাহা কখনও গ্রহণীয় হইবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তিনি আরও বলেন-

وَ مَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى *

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে স্বীয় চেহারাকে অনুগত করিয়াছে আর

সে সৎকার্য করে। নিঃসন্দেহে সে মজবুত রশি ধারণ করিয়াছে।

অন্য এক স্থানে বলেন-

تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ *

হে আল্লাহ! আমাকে মুসলমানী অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে নেককারদের সাথে মিলাইয়া দিন।

তিনি বলেন-

و انا اول المسلمين *

এবং আমি প্রথম মুসলমান।

অনুরূপ অর্থবোধক আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে। এখানে একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য যে, ইসলামকে বার বার উল্লেখ করা ইহার উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। ইসলামের রহিয়াছে একটি বাহ্যিক রূপ এবং একটি আভ্যন্তরিন রূপ। ইসলামের বাহ্যিকরূপ হইল ইহার আহকাম পালন করা। আভ্যন্তরিন রূপ হইল ইহার অনানুকূল্য হইতে বিরত থাকা। সুতরাং ইসলাম মানবের দেহের অংশ বিশেষ। অর্থাৎ ইহার সম্পর্ক বাহ্যিক দেহের সাথে। আর অনানুকূল্য হইতে বিরত থাকা এবং নিজকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া অন্তরের অংশ বিশেষ। অতএব ইসলাম মানবের বাহ্যিক আকৃতির তুল্য। আর নিজকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া ইহার অভ্যন্তর। সুতরাং খাঁটি মুসলিম এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের নির্দেশগুলি পালন করিয়া বাহ্যিকভাবে নিজকে তাঁহার অনুগত করিয়া রাখে আর তাঁহার নির্দেশের সামনে স্বীয় অন্তর ঝুঁকাইয়া দেয়। নিজকে সোপর্দ করার প্রকৃত পর্যায় হইল আল্লাহ পাকের আহকামের পরিপন্থীতা হইতে দূরে থাকা এবং ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে নিজকে তাঁহার কাছে অর্পন করিয়া দেওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় ইসলামের দাবী করে তাহার কাছে চাহিদা হইল সে যেন নিজকে সোপর্দ করিয়া দেয়। তাহাকে বলা হইবে যে, যদি তুমি স্বীয় দাবীতে সত্য হও তাহা হইলে দলীল পেশ কর।[১]।

তোমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে যখন আল্লাহ বলিয়াছিলেন "তুমি ইসলাম লও" তখন তিনি বলিয়াছিলেন আমি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ইসলাম লইয়াছি।

১। অর্থাৎ নিজকে সোপর্দ করিয়া দেখাও। (অনুবাদক)

অতঃপর যখন তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার জন্য চরকগাছে বসানো হইয়াছিল। তখন ফিরিশতাগণ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। হে প্রভু। তিনি আপনার পরমবন্ধু। তাঁহার প্রতি যে বিপদ নামিয়া আসিয়াছে আপনি তাহা খুব ভালভাবেই জানেন। আল্লাহ্ পাক তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে নির্দেশ দিলেন হে জিবরাঈল! তুমি তাঁহার কাছে যাও; যদি সে তোমার কাছে সাহায্য চায়; তখন তুমি তাহাকে সাহায্য করিও। আর যদি সাহায্য না চায় তাহা হইলে আমি জানি আর সে জানে। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) শূন্যে ভর করিয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, আপনার কাছে নাই। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে রহিয়াছে।" হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, তাহা হইলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, যেহেতু তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, সুতরাং দোয়া করার কি প্রয়োজন?

লক্ষ্য করুনঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। এমনকি অন্য কাহারও প্রতি তাঁহার ইচ্ছা ঝুঁকেও নাই। বরং আল্লাহ্ পাকের ফয়সালার প্রতি গর্দান ঝুঁকাইয়া দিয়াছেন। স্বীয় ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ পাকের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি, স্বীয় নেগরানীর পরিবর্তে আল্লাহর নেগরানীর প্রতি, স্বীয় দো'আর উপর ভরসা না করিয়া আল্লাহ্ পাকের ইলমের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাঁহার প্রতি অনুগ্রহশীল- মেহেরবান। আল্লাহ্ পাকও তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন-

و ابرهيم الذى وفى *

ইবরাহীম এমন এক ব্যক্তি যে নিজের কথা পুরা করিয়াছে। অধিকন্তু আল্লাহ্ পাক তাহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে মুক্তি দিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেন-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِى بَرْدًا وَّ سَلامًا عَلَى اِبْرٰهِيمَ *

আমি বলিলাম, হে অগ্নি তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও। আলেমগণ বলেন যে, যদি আল্লাহ্ পাক এখানে سلاما 'শান্তিদায়ক' শব্দ ব্যবহার না করিতেন তাহা হইলে অগ্নি এত শীতল ও ঠাণ্ডা হইয়া যাইত যে ঠাণ্ডার প্রভাবে তিনি ধ্বংস হইয়া যাইতেন। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। সীরাতবিদগণ বলেন যে, তখন সমগ্র দুনিয়ার অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। কেননা প্রত্যেক অগ্নি মনে করিতেছিল যে, হয়তবা ইহাকেই

এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার জন্য যে রশি দিয়া বাধা হইয়াছিল অগ্নি শুধু এই রশিগুলি জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ ফায়দার কথা

প্রথম বড় ফায়দা ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রদত্ত উত্তর লক্ষ্যণীয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, আপনার কাছে নাই। লক্ষ্য কর যে তিনি এইরূপ বলেন নাই যে, আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, রিসালাত ও বন্ধুত্বের চাহিদা হইল পরিষ্কারভাবে স্বীয় দাসত্ব ও মুখাপেক্ষীতার কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া। আর দাসত্বের পর্যায়ের অপরিহার্য আনুসাঙ্গিক বিষয় হইল আল্লাহ পাকের প্রতি স্বীয় প্রয়োজনের ও মুখাপেক্ষীতার কথা প্রকাশ করা এবং তাঁহার সামনে মুখাপেক্ষী হইয়া খাঁড়া হওয়া। তাঁহার ছাড়া অন্য সকলের কাছ থেকে স্বীয় ইচ্ছা উঠাইয়া লইয়া একমাত্র তাঁহার কাছেই স্বীয় ইচ্ছা নিবেদিত করা।

সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পক্ষ হইতে এইরূপ জবাব প্রদান করাই উচিত হইয়াছে যে, আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। আপনার নয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় জবাবের মধ্যে উভয় কথা একত্রিত করিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি স্বীয় মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির কাছে স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত না করার ঘোষণা দিয়াছেন।

কোন কোন লোক বলিয়া থাকে যে, সুফী তখনই সুফী হইতে পারে যখন আল্লাহর কাছেও তাহার প্রয়োজন না থাকে। এই ধরণের কথা অনুসরণযোগ্য ও পরিপূর্ণতার অধিকারী কোন ব্যক্তির থেকে হইতে পারে না। অবশ্য অন্য দিকে খেয়াল করিলে তাহাদের এই উক্তির বিশুদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। তাহা এই যে, সুফীর বিশ্বাস হইয়াছে যে, আল্লাহ পাক তাহাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাহার সমস্ত প্রয়োজন পুরা করিয়াছেন। সুতরাং তাহার সমস্ত প্রয়োজন তাহার জন্মের পূর্বে আযলেই পুরা হইবে। অধিকন্তু তাহার এখন প্রয়োজন না থাকা আল্লাহর প্রতি তাহার মুখাপেক্ষীতা না থাকাকে প্রমাণ করে না। বরং প্রয়োজন না থাকা মুখাপেক্ষী হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং এখন প্রয়োজন অবশিষ্ট না থাকিলেও তাহারা আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী।

মোটকথা, বান্দার প্রয়োজন পুরা হউক বা না হোক উভয় অবস্থায় বান্দা আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী।

সুতরাং উল্লিখিত উক্তির প্রবক্তা প্রয়োজন নাই বলিয়া বলিয়াছেন। বান্দা আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয় এমন কথা বলেন নাই। কেননা আল্লাহর প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষী হওয়া বান্দা হওয়ার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

উল্লিখিত উক্তির দ্বিতীয় আর একটি ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, সূফী নিজে আল্লাহকে তালাশ করে। তাহার কাছে কোন প্রয়োজন তালাশ করে না। তৃতীয় আর একটি ব্যাখ্যা ইহা হইতে পারে যে, সুফী সর্বদা আল্লাহ পাকের কাছে নিজকে সর্ম্পন করিয়া রাখে। তাঁহার সামনে নত শির হইয়া থাকে। সুতরাং আল্লাহ পাকের চাহিদাই তাহার চাহিদা। সুতরাং আল্লাহ পাকের কাছে তাহার কোন প্রয়োজন থাকে না।

দ্বিতীয় বড় ফায়দা ঃ হযরত জিবরাঈল (আঃ) যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে প্রশ্ন করিলেন, আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি (আঃ) জবাব দিলেন, আপনার কাছে কোন প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহ পাকের কাছে আছে। কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহার জবাবের অর্থ ইহা বুঝিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিবেন না। তাঁহার অন্তর আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রত্যক্ষ করিতেছে না। তখন তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে পরামর্শ দিলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার কাছেই প্রার্থনা করুন। অর্থাৎ যদি আপনি এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, কোন মাধ্যমের কাছে কোন কিছু চাহিবেন না। আর এই কারণে আমার কাছে কোন প্রকার সাহায্যের কথা বলিতেছেন না। তাহা হইলে আপনি স্বীয় পরোয়ারদিগারের কাছেই প্রার্থনা করুন। কেননা তিনি আমার অপেক্ষাও আপনার অধিক নিকটবর্তী। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জবাব দিলেন, তিনি তো আমার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। সুতরাং ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁহার কাছে চাওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। তাঁহার উক্তির সারকথা হইল আমি খুব চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে আমি তাহাকে তাহার কাছে প্রার্থনা করা অপেক্ষা অনেক নিকটে পাইয়াছি এবং তাঁহার কাছে প্রার্থনা করাকেও একটি মাধ্যম মনে করিতেছি। আমি তাঁহার ব্যতীত অন্য কোন জিনিস অবলম্বন করিতে চাই না। অধিকন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন। সুতরাং তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া তাহাকে স্বরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা তিনি তো ভুলিয়া যান না। সুতরাং তিনি আমার প্রতি খেয়াল না করার

কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্য আমি তাঁহার কাছে না চাহিয়া তাঁহার জ্ঞানই আমার সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ঠ মনে করিয়া বসিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে কোন অবস্থায়ই আমাকে ছাড়িবেন না। আল্লাহকে যথেষ্ঠ মনে করা ইহাকেই বলে। আর ইহারই নাম حسبى الله (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ঠ।) এর হক আদায় করা।

আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) و ابرهيم الذى وفى ইবরাহীম পুরা করিয়া দিয়াছেন। এই আয়াতের তফসীর করিয়াছেন حسبى الله এর সারকথা দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহ পাককে অবলম্বন করার ক্ষেত্রে জমিয়া বসিয়াছেন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি করেন নাই। অবশ্য কোন কোন তফসীরকার এইরূপ তফসীর করিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মেহমানকে আহার দিয়াছেন। স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করিয়াছেন। জলন্ত অগ্নিতে নিজকে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। তাই আল্লাহ পাক তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন 'ইবরাহীম পুরা করিয়া দিয়াছেন।'

তৃতীয় বড় ফায়দা ঃ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ফিরিশতাদের সামনে বলিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। অর্থাৎ আদম এবং আদম সন্তানদের সৃষ্টি করিব। ফিরিশতাগণ বলিল, আপনি পৃথিবীর বুকে এমন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন যাহারা তথায় খুনাখুনি ও ফাসাদ করিবে? আমরা তো আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আপনার গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া আপনার প্রশংসা করিতেছি। তাহাদের এই বক্তব্যের সারকথা আল্লাহ পাক যেন তাহাদিগকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।

তাহাদের এই বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ পাক বলিলেন, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত জিবরাঈলের (আঃ) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের জবাবে যাহা বলিয়াছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই কার্য এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সুদৃঢ় দলীল হিসাবে খাঁড়া হইল। যেন আল্লাহ পাক বলিতেছেন এই সকল ফিরিশতা এখন কোথায় যাহারা আমার নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল যে, তাহারা দুনিয়াতে খুনাখুনি ও ফাসাদ করিবে? তোমরা আমার বান্দা ইবরাহীমকে কেমন পাইয়াছ?

ইহা দ্বারা আল্লাহ পাকের 'আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না' এই বাণীর ব্যাখ্যা হইয়া গেল।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

পালাক্রমে ফিরিশতাগণ দুনিয়াতে আসিতে থাকেন। আবার পালাক্রমে আসমানে পৌঁছিতে থাকেন। তখন আল্লাহ পাক তাহাদের কাছে বান্দাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? আল্লাহ পাক বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকার পরও তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাহারা জবাব দেয় যে, আমরা যখন পৃথিবীতে গিয়াছি তখন দেখিয়াছি যে, তাঁহারা (আছরের) নামাজ পড়িতেছে। আর যখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি তখনও দেখিয়াছি যে, তাহারা (ফজরের) নামাজ পড়িতেছে।

হাদীছের ব্যাখ্যায় আছর এবং ফজরের নামাযের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ উল্লিখিত নামাজদ্বয়ের সময়েই ফিরিশতারা আসা যাওয়া করে।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন যে, বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ফিরিশতাদের কাছে আল্লাহ পাকের জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য এই যে, হে আপত্তিকারকরা! তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ?

অনুরূপভাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে প্রেরণ করার একই উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর মর্যাদা ও বড়ত্ব ফিরিশতাদের সামনে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে কি না তাহাও যেন তাহারা দেখিয়া লয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তো আল্লাহ পাককেই দেখিতেন। অন্য কাহারও দিকে দৃষ্টি দিতেন না। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপাধি ছিল খলীলুল্লাহ। তিনি আল্লাহর খলীল। তাহাকে খলীল বলার কারণ তাঁহার শিরা উপশিরা আল্লাহ প্রেম, তাঁহার বড়ত্ব ও মহত্ব এবং তাঁহার একত্বের বিশ্বাসে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও স্থান ছিল না।

কবি বলেন-

مثل جان مجه مین هو گیا پیوست + هے اسی سے خلیل نعت تری

بولتاهون تو هے میرا کلام + روزه رکهون تو تشنگی هے مری

আমার মধ্যে তুমি প্রাণের ন্যায় সম্পৃক্ত হইয়া গিয়াছ। এই কারণে তোমার উপাধি খলীল।

আমি কথা বলি, তখন তুমিই আমার বক্তব্য।
রোযা রাখি তখন তুমিই আমার পিপাসা।

সতর্কতা এবং ঘোষণা ঃ আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অন্তর স্বীয় সন্তুষ্টির নূর দ্বারা আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার রূহকে অনুগত হওয়ার গুণের দ্বারা গুণান্বিত করিয়াছিলেন। মাখলুকের দিকে দৃষ্টি করা থেকে তাঁহার অন্তরকে বিরত করিয়াছিলেন। যেহেতু তাহার অন্তর অনুগত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ হইয়াছিল তাই অগ্নিকুণ্ড তাঁহার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি অনুগত হওয়ার ফলে পাইয়াছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তা। আর স্বীয় আভ্যন্তরিন অবস্থা দুরস্ত করার দ্বারা পাইয়াছিলেন এত বড় সম্মান ও মর্যাদার আসন।

ইহা হইতে প্রত্যেক মুসলমানের অনুধাবন করা উচিত যে, যদি কেহ পরীক্ষায় পতিত হওয়ার পর আল্লাহ পাকের আনুগত্য অবলম্বন করে তাহা হইলে আল্লাহ পাক কাঁটাকে ফুলে এবং ভয়কে নিরাপত্তায় পরিনত করিয়া দেন।

সুতরাং শয়তান যখন তোমাকে অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে এবং সমস্ত সৃষ্টি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? তখন তোমার জবাব এইরূপ হওয়া উচিত যে, তোমাদের কাছে কোন প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহ পাকের কাছে প্রয়োজন রহিয়াছে। তোমার জবাব শুনিয়া যদি ইহারা বলে যে, তাহা হইলে আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা কর? তখন তোমার এইরূপ জবাব দেওয়া উচিত যে আমার অবস্থা সম্পর্কে তো আল্লাহ পাক সম্পূর্ণরূপে অবগত। সুতরাং তাঁহার অবগতি আমার জন্য যথেষ্ঠ। আমার প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নাই। যদি তুমি এইরূপ কর তাহা হইলে আল্লাহ পাক দুনিয়ার অগ্নিকে তোমার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করিয়া দিবেন। তোমাকে সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করিবেন। কেননা আল্লাহ পাক নবী ও রাসূলগণের মধ্যেমে হেদায়েতের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ঈমানদারগণ তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়াছেন। একীনওয়ালা ব্যক্তিগণ তাহাদের আনুগত্য করা নিজেদের জন্য অপরিহার্য করিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন-

قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا و من اتبعنى *

হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলিয়া দিন। ইহা আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসরণকারীরা বুঝিয়া শুনিয়া আল্লাহর দিকে আহবান করি।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্পর্কে বলিয়াছেন-

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ *

আমি তাঁহার দোয়া কবুল করিয়াছি এবং তাহাকে বিষাদ থেকে মুক্তি দিয়াছি। আমি ঈমানদারদিগকে এইভাবেই মুক্তি দিয়া থাকি। অর্থাৎ যাহারা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাঁহার নূরের প্রেমিক হয়। নিজকে নীচ করিয়া মুখাপেক্ষীতার সাথে আমার কাছে চাহিতে থাকে। বিনয় ও মিনতির পোশাক পরিধান করে আমি তাহাকেও অনুরূপভাবে মুক্তি দিয়া থাকি।

মূল উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উল্লেখিত ঘটনায় রহিয়াছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষা আর সূক্ষ্মদর্শীদের জন্য দিকনির্দেশনা। তাহা এই ভাবে যে কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিয়া নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে বিরত থাকে তখন আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনার প্রতি লক্ষ্য কর তিনি নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই বরং তাহার সমস্যা সমাধান আল্লাহ পাকের দায়িত্বে অর্পন করিয়া তাহার প্রতি নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার এই আনুগত্যের ও নির্ভরতার ফলে তিনি লাভ করিলেন প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডেও শান্তি ও নিরাপত্তা। দুনিয়া ও আখেরাতে অধিকারী হইলেন ইয্যত ও সম্মানের এবং আজ শত সহস্র বৎসর ধরিয়া জগতবাসীর প্রশংসায় হইয়া রহিলেন অমর।

এমনকি আমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আমরা যেন তাঁহার ধর্মমতের বাহিরে না চলি। তিনি আমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন উহার খেয়াল করিয়া চলি। যেমন কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে-

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ *

তোমরা স্বীয় পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মমত অবলম্বন কর। তিনিই পূর্বে তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন।

সুতরাং যাহারা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মমতের অনুসারী হয় তাহাদের জন্য উপযোগী হইল তাহারা যেন ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাকে। ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মমত অবলম্বন করা হইতে নির্বোধ ব্যক্তিই ফিরিয়া থাকে। ইবরাহীমী ধর্মমতের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হইল আল্লাহর কাছে নিজকে অর্পণ করা এবং তাঁহার নির্দেশসমূহ পালন করা।

সারকথা, প্রধান উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর সামনে বান্দার নিজস্ব ইচ্ছার অস্তিত্ব না থাকা।

এই সম্পর্কে আমাদের রচিত কবিতা রহিয়াছে। এই কবিতাতে আল্লাহ পাক বান্দাদের উদ্দেশ্য করিয়া কিছু কথা বলিয়াছেন। কবিতার মর্মকথার অনুবাদ প্রদত্ত হইল-

☆ স্বীয় ইচ্ছা দূর করিয়া দাও হে বান্দা! যদি চাও তুমি হেদায়েতের রাস্তা।

☆ স্বীয় অস্তিত্ব দেখিও না। নিজের উপর নির্ভরতা কর পরিত্যাগ। আঁকড়াইয়া ধর ধৈর্যধারণের সুদৃঢ় আংটা।

☆ কতদিন পর্যন্ত অমনোযোগী থাকিবে আমার থেকে? তুমি তো সর্বদা নিজের প্রেম ও চিন্তায় মগ্ন।

☆ কতদিন তুমি চাহিয়া থাকিবে মাখলুকের পানে?

☆ বনে-জঙ্গলে উদভ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইবে।

☆ কোথায় চলিয়াছ আমার দরবার ছাড়িয়া? কেন তুমি পথভ্রষ্ট হইতেছ রাস্তা ছাড়িয়া?

☆ আমার বন্ধুত্ব অনেক পুরাতন তোমার সাথে। বরযখ যাতে আমাকে ইলাহ বলে স্বীকার করেছিলে এক বাক্যে।

☆ তোমার কি এমন কোন প্রভু আছে যাহার কাছে তুমি কোন কিছু আশা করিতে পার? যে সে তোমাকে হাশরের ময়দানে বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারে?

☆ যত আছে মাখলুক জানিয়া রাখ সবই অক্ষম। এক অক্ষমের কাছে যাঞ্ছা করিতেছে অপর অক্ষম।

☆ সকল মাখলুক আমার থেকেই অস্তিত্ব পাইয়াছে। 'হইয়া যাও' শব্দের মাধ্যমে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে।

☆ আমার ঘরে এবং আমার রাস্তায় থাকিয়া। অন্যের প্রতি তুমি করিয়াছ ভরসা।

☆ ঈমানের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ম করিয়া তুমি দেখ। সমস্ত মাখলুক শেষ পর্যন্ত হইয়া যাইবে ধ্বংস।

☆ চলার পথ-অনস্তিত্ব থেকে শুরু করিয়া অনস্তিত্বের দিকে তুমিও

নিঃসন্দেহে এই পথেই চলিবে।

☆ আমার পোশাক [১] তোমাকে পরিধান করাইয়াছি খুলিয়া ফেলিওনা তাহা। সুতরাং হটাইয়া ফেল মাখলুক থেকে তোমার সমস্ত আশা আকাঙ্খা।

☆ সমস্ত আশা আকাঙ্খা পেশ কর দরবারে আমার- চাহিবনা তোমার কাছে কোন সম্পদ বিনিময়ে ইহার।

☆ দেখ স্বীয় অবস্থান এবং করিয়া রাখ শির নত। তোমার সমস্ত কাঙ্খিত বস্তু হইয়া যাইবে অর্জিত।

☆ বান্দায় পরিনত হও; কেননা মনিব বান্দাকে যাহা দান করে বান্দা তাহাতেই মনিবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

☆ (জানিয়া রাখ আমি এমন এক সত্ত্বা যে) স্বীয় ক্ষমতার দ্বারা তোমার সমস্ত ক্ষমতা মিটাইয়া দিব। তোমার ঔদ্ধত্য ও মূর্খতার শাস্তি প্রদান করিব।

☆ তবে কি আমার রাজত্বে তুমি অংশীদার? যাহার কারণে নির্মল ও স্বচ্ছ সত্যের ক্ষেত্রেও করিয়াছ বিবাদ?

☆ যদি পৌঁছিতে চাও তুমি দরবারে তাঁহার তাহা হইলে স্বীয় নফসের দুশমন হইয়া যাও।

☆ আমিত্ব বর্জন করার সমুদ্রে নিমজ্জিত হও; এবং না দেখ নিজের প্রতি সর্বক্ষেত্রে আমাকে তোমার আপন করিয়া লও।

☆ আমার কাছেই তুমি প্রার্থনা করিতে থাক অনুগ্রহের বারি। অতঃপর দেখ কি এহসান আমি করিতে পারি।

☆ অন্য কাহারও কাছে না কর হেদায়েত তলব- অন্য কেহ কি আছে যে তোমাকে প্রদর্শন করিতে পারিবে পথ?

বিশেষ আলোচনা

ব্যবস্থা অবলম্বন করা (তদবীর) দুই প্রকার। এক প্রকার তদবীর প্রশংসিত। অপর প্রকার নিন্দনীয়। দ্বিতীয় প্রকারের তদবীর বা ব্যবস্থা গ্রহণ তোমার জন্য ক্ষতিকর।

ইহার ক্ষতি তোমার উপরই পতিত হইবে। ইহা আল্লাহ পাকের হক আদায়ের জন্য হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার তদবীরের উদাহরণ কোন গোনাহের কার্য করার জন্য। ব্যবস্থা অবলম্বন করা বা অসতর্ক থাকার কারণে আত্মিকভাবে

১। খিলাফতের পোশাক। অর্থাৎ আমি তোমাকে খলীফা বানাইয়াছি।

ক্ষতিগ্রস্থে পতিত হওয়া। অথবা কোন ইবাদত করিতে গিয়া লৌকিকতা ও খ্যাতি অর্জনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। ইহা নিন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বনকারী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয় অথবা ইহার দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মধ্যে পর্দা পড়িয়া যায়। আল্লাহ পাক যাহাকে বিবেক নামক নেয়ামত দান করিয়াছেন সে এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া লজ্জাবোধ করিবে। আর এই আর এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন তাহাকে আল্লাহর নৈকট্যের পর্যায়ে পৌঁছাইবে না এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালবাসার সহায়ক হইবে না। আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি যত অনুগ্রহ করিয়াছেন তন্মধ্যে বিবেক উত্তম। ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

আল্লাহ পাক সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দুইটি উত্তম জিনিস দান করিয়াছেন। এক, তাহাদের অস্তিত্ব। দ্বিতীয়ত, তাহাদের স্থায়ীত্ব। অর্থাৎ প্রথমে তাহাদিগকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের স্থায়ীত্ব দান করিয়াছেন। প্রত্যেক মাখলুকের জন্য এই দুইটি নিয়ামত অত্যন্ত জরুরী। এক নিয়ামত অস্তিত্ব, দ্বিতীয় নিয়ামত স্থায়ীত্ব। এই বর্ণনার দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও পরিস্কার হইয়া আসে। আল্লাহ বলেন- رحمتى وسعت كل شيئ আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। আয়াতে উল্লেখিত রহমত তাহাই যাহা এই নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছে। যেহেতু উল্লেখিত নিয়ামত দ্বয়ে সমস্ত মাখলুক শরীক রহিয়াছে। তাই আল্লাহ পাক এক মাখলুককে অপর মাখলুক থেকে পৃথক করিতে ইচ্ছা করিলেন। যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা ও চাহিদার গুণে ব্যাপকতা প্রকাশিত হয়। অতএব তিনি কতক মাখলুককে খুব বাড়িয়া যাওয়ার বৈশিষ্ট্য দান করিলেন। যেমন বৃক্ষরাজি, পশুপক্ষী এবং মানব। সুতরাং যে সকল মাখলুক বাড়ে না বৃদ্ধি পায় না উহাদের তুলনায় উল্লেখিত মাখলুক ত্রয়ের মর্যাদা অধিক হওয়াটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার বৈশিষ্ট্য অধিক বিদ্যমান। অতঃপর উল্লিখিত মাখলুকত্রয় বৃদ্ধি পাওয়ার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত। তাই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিয়া ইহাদিগকে বৃক্ষলতা হইতে পৃথক করিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রাণী ও মানুষ সমভাবে অংশীদার। সুতরাং বৃক্ষলতার তুলনায় উল্লিখিত মাখলুকদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ অধিক। অতঃপর আল্লাহ পাক প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষ জাতিকে পৃথক করিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাই তাহাদিগকে বিবেক দান করিলেন। আর এই নিয়ামতের মাধ্যমেই তিনি মানব জাতিকে অন্যান্য মাখলুকের উপর মর্যাদা দান করিলেন। অধিকন্তু ইহার মাধ্যমেই মানুষের প্রতি স্বীয় নিয়ামত প্রদান

পরিপূর্নতায় পৌঁছাইলেন। বিবেকের দ্বারাই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সফলতা লাভ করে। সুতরাং বিবেক নামক এই মহা মূল্যবান নিয়ামতকে পার্থিব জগতের ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা আল্লাহ পাকের কাছে কোন মূল্য রাখে না। ইহা এই নিয়ামতের বড় না শুকরিয়া।

আখেরাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করায় এবং আখেরাতের সংশোধনে বিবেক ব্যবহার করাই সঙ্গত। কারণ ইহার ফলে মহান অনুগ্রহশীলের হক আদায় হয় এবং বিবেকের মধ্যে নূরের সৃষ্টি হয়। সুতরাং মহান আল্লাহ পাকের দান বিবেককে পার্থিবতায় ব্যবহার করিবে না। পার্থিবতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, الدنيا جيفة অর্থাৎ দুনিয়া গন্ধযুক্ত মৃতজন্তু।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যিহাক (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আহার করিয়া থাক? তিনি বলিলেন, গোশত্ এবং দুধ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর তোমাদের আহারকৃত বস্তু কি হইয়া যায়? তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা কি হইয়া যায় তাহাতো আপনিও জানেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মানুষ থেকে যে মলমূত্র বাহির হয় উহাকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার সাথে তুলনা দিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিলেন, আল্লাহ পাকের কাছে দুনিয়ার মূল্য যদি মাছির একটি ডানার সমমূল্যেরও হইত তাহা হইলে তিনি কাফেরদের এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।

সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় বিবেককে দুনিয়ার ন্যায় এত দুর্গন্ধ ও নাপাক জিনিসের মধ্যে ব্যবহার করিয়াছে তাহার উদাহরণ এইরূপ যে এক বাদশাহ কোন এক ব্যক্তিকে স্বীয় তলোয়ার দান করিলেন যাহা খুবই সুন্দর, সুশোভিত এবং খুব মর্যাদাশীল। এইরূপ তলোয়ার শুধু তাহাকেই দান করিলেন। অন্য কাহাকেও দান করিলেন না। তাহাকে তলোয়ার দান করিবার উদ্দেশ্য ছিল সে যেন দুশমনদের হত্যা করে এবং ইহা কোমরে বাঁধিয়া নিজে সজ্জিত হয়। কিন্তু সে তলোয়ার হাতে লইয়া মৃতদেহের দিকে চলিল আর তলোয়ারের দ্বারা মৃত দেহগুলিকে কাটিতে শুরু করিল। আর এইভাবে তলোয়ারের ধার নষ্ট হইয়া গেল। ইহার ঔজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া গেল। বাদশাহ এই ঘটনা জানিতে পারিলেন। এখন তাহার হাত থেকে তলোয়ার ছিনাইয়া লওয়া এবং তাহাকে কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়া উচিত। সে বাদশাহের সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া যাওয়ার

উপযুক্ত। উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে তদবীর (ব্যবস্থা অবলম্বন) দুই প্রকার। এক, প্রশংসনীয়। দুই, ঘৃণিত। যে ব্যবস্থা অবলম্বন তোমাকে আল্লাহ পাকের নিকটতর করিয়া দেয় তাহা হইল প্রশংসনীয়। যেমন, মাখলুকের হক থেকে মুক্তি লাভের জন্য অথবা ইহাদের হক আদায় করিবার জন্য অথবা মাফ করাইবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ্ পাকের কাছে তাওবা করা, অথবা এমন জিনিসের চিন্তাভাবনা করা যাহা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের মূলোৎপাটন করে। কেননা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। অথবা প্রতারক ও প্রবঞ্চক শয়তান থেকে বাঁচিয়া থাকার চিন্তা-ফিকির করা। এইসবকিছু নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, সামান্য সময় চিন্তা ভাবনা করা সত্তর বৎসর ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। দুনিয়াবী তদবীরও (ব্যবস্থা অবলম্বন) দুই প্রকার। এক, দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দুনিয়ার জন্যই। দুই, দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন করা আখেরাতের জন্য। দুনিয়ার জন্য দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন করার অর্থ হইল, দুনিয়াবী জিনিসপত্র, অর্থ সম্পদ ও মালদৌলত সংগ্রহ করা। উদ্দেশ্য ইহার মাধ্যমে স্বীয় নামধাম ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি করা। এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে যতই অগ্রসর হইবে ততই গাফলতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ব্যবস্থা অবলম্বনকারী ধোকা খাইতে থাকিবে। ইহার নিদর্শন হইল, সে শরীয়তের আহকাম পালনে গাফেল হইয়া পড়িবে এবং নাফরমানী বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন হইল- উদাহরন স্বরূপ কোন ব্যক্তি ব্যবসা-বানিজ্য ও কৃষিকার্য প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করিল এই নিয়তে যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা হালাল রোযী আহার করিবে। ভুখা নাঙ্গাকে ইহার একাংশ দান করিবে এবং মানুষের সামনে নিজেদের মান-সম্মান রক্ষা করিবে।

যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া তলব করে তাহার পরিচয় হইল এই যে, সে অধিক উপার্জনে মনোনিবেশ করিবে না। সঞ্চয় করিবে না। মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে সহযোগীতা করিতে থাকিবে। অভাবীদের প্রাধান্য দিবে।

পার্থিবতা বর্জনকারীর নির্দশন দুইটি। তাহার এক নিদর্শন প্রকাশ পাইবে দুনিয়া লাভ না হওয়ার সময়। দ্বিতীয় নিদর্শন প্রকাশ পাইবে পার্থিব ধন সম্পদ অর্জিত হওয়ার সময়। পার্থিব ধন সম্পদ লাভ হওয়ার সময় তাহার নিদর্শন হইল যে, সে যাহা লাভ করিয়াছে তাহা হইতে অভাবীদের দান করিবে।

তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবে। আর পার্থিব ধন সম্পদ লাভ না হওয়ার সময় তাহার নিদর্শন হইল যে, সে ব্যতিব্যস্ত বা অস্থির হইবে না। সুতরাং অভাবীদের দান করা তাহাদের উদ্দেশ্যে সম্পদ কুরবান করাতো সম্পদ লাভ করার নিয়ামতের শুকরিয়া। আর অস্থির না হওয়া সম্পদ না থাকার নিয়ামতের শুকরিয়া।

বিষয়টি এমন ব্যক্তি বুঝিতে পারে যাহার অনুধাবণ ক্ষমতা এবং এই বিষয় সম্পর্কে পরিচয় রহিয়াছে। কেননা, পার্থিব ধন সম্পদ লাভ করা যেমন আল্লাহর নিয়ামত তেমনিভাবে আল্লাহ পাক বান্দাকে ধন সম্পদ প্রদান না করাও এক প্রকার নিয়ামত। বরং শেষোক্ত নিয়ামত প্রথমোক্ত নিয়ামত অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যে সকল জিনিস আমাকে দান করিয়াছেন তাহাতে যে নিয়ামত রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক নিয়ামত রহিয়াছে ঐ সকল জিনিসে যাহা আমার থেকে দূরে রাখিয়াছেন।

হযরত আবুল হাসান শাযলী (রহঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)কে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, কোন সংবাদ আছে কি? অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বাহির হওয়ার নিদর্শন কি? আমি বলিলাম যে আমি জানি না। তিনি বলিলেন, অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বাহির হওয়ার নিদর্শন হইল এই যে, দুনিয়ার ধন সম্পদ হস্তগত হইলে তাহা হইতে ব্যয় করে আর হস্তগত না হইলে স্বস্তিরতার সাথে বসিয়া থাকে। অস্থির হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে- সর্ব প্রকার দুনিয়া তলবকারী ঘৃণিত নয়। বরং ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি যে নিজের জন্য দুনিয়া তলব করে। স্বীয় প্রভুর জন্য তলব করে না। দুনিয়ার জন্যই দুনিয়া তলব করে আখেরাতের উদ্দেশ্যে তলব করে না।

সুতরাং মানুষও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, শ্রেণী যাহারা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়া তলব করে। দ্বিতীয় শ্রেণী যাহারা আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া তলব করে।

প্রাথমিক পর্যায়ের এক সুফী বিত্তশালী এক কামেল সুফীকে বলিল, যে দুনিয়ার সাথে মহব্বত রাখে সে কাপুরুষ। কামেল সুফী জবাব দিল যে, যদি দুনিয়ার সাথে মহব্বত রাখে তাহা হইলে বন্ধুর উদ্দেশ্যেই দুনিয়ার মহব্বত রাখে।

আমি শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আরিফ (আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তি) পার্থিব ধন সম্পদ জমা করিয়া রাখে না। কেননা তাঁহার পার্থিব ধন সম্পদ হয় আখেরাতের জন্য। আর তাহার আখেরাত হয় তাহার রবের জন্য। সুতরাং সাহাবা ও সলফে সালেহীনের দুনিয়ার আসবাব অবলম্বন করারও একই উদ্দেশ্য ছিল। ইহাদের দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাহার সন্তুষ্টি অর্জনের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা। দুনিয়া এবং দুনিয়ার রং-রূপ উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ পাক তাহাদের এই গুণের কথা কুরআনে পাকে উল্লেখ করিয়াছেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا * سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ *

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এবং যাহারা তাঁহার সাথে আছে তাহারা কাফেরদের মোকাবিলায় খুব সুদৃঢ় এবং নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু। আপনি তাহাদিগকে দেখিবেন যে, তাহারা রুকু সিজদা করে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি তালাশ করে। তাহাদের নিদর্শন হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব রহিয়াছে।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক বলেন-

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ *

আল্লাহ পাকের নূর এই সকল ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। আল্লাহ পাক হুকুম করিয়াছেন ইহাদের উচ্চ করিবার জন্য আর ইহাতে আল্লাহ পাকের নাম যিকির করার জন্য এবং এই সকল ঘরে সকাল সন্ধ্যা এমন সব লোক আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে যাহাদিগকে কোনরূপ ব্যবসা বানিজ্য ও লেনদেন আল্লাহর যিকর করা, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা থেকে গাফেল করিতে পারে না। তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যেদিনে অন্তর ও দৃষ্টি পরিবর্তন হইয়া যাইবে।

তিনি অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا *

তাহারা আল্লাহ পাকের কাছে যাহা কিছু ওয়াদা করিয়াছিল তাহা সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে এমন রহিয়াছে যাহারা স্বীয় মান্নত পুরা করিয়াছে। আর অনেকে অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা নিজেদের ওয়াদাতে কোনরূপ পরিবর্তন করে নাই। এই বিষয়ে উল্লেখিত আয়াতসমূহের অনুরূপ আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে।

আর এই শ্রেণীর লোকেরাই উল্লেখিত গুণাবলীর অধিকারী হইতে পারে। কেননা আল্লাহ পাক তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংশ্রব লাভের জন্য এবং কুরআনের বাহক হওয়ার জন্য পছন্দ করিয়াছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন মুসলমান আসবে না যাহার প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় অগণিত এবং স্বরণযোগ্য অনুগ্রহ হইতে পারে। কেননা তাহারা এমন সব লোক যাহারা হেকমত এবং আহকামসমূহ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। হালাল-হারামের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। আহকামের ব্যাপকতা ও বিশেষতা অনুধাবন করিয়াছেন। বিভিন্ন মুলক ও এলাকা জয় করিয়াছেন। মুশরিক ও উদ্ধতদের অধীনস্থ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য ও বাস্তব। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, আমার সাহাবী নক্ষত্র সদৃশ। তাহাদের যে কোন এক জনের অনুসরণ করিবে হেদায়েত পাইয়া যাইবে। আল্লাহ পাক এখানে প্রথমোল্লেখিত আয়াতে তাহাদের অনেক গুনাবলীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এমনকি বলিয়াছেন-

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا *

তাহারা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি তালাশ করে। আল্লাহ পাক তাহাদের অন্তরের সর্বপ্রকার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি তাহার ভিতর বাহির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, দুনিয়া তালাশ তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভ ব্যতীত তাহাদের দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ পাক তাহাদের সম্পর্কে বলেন,

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه *

আপনি ঐ সব লোকদের সাথে জমিয়া বসিয়া পড়ুন যাহারা সকাল সন্ধ্যা স্বীয় প্রভুকে আহবান করে তাঁহার সন্তুষ্টির ইচ্ছায়। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক

পরিস্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে আল্লাহ পাক ব্যতীত তাহাদের কোন ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নাই। অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন, এই সব ঘরের মধ্যে সকাল সন্ধ্যা এমন সব লোক আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে যাহাদিগকে ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্বরণ থেকে ফিরাইতে পারে না। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তাহাদের অন্তর পবিত্র হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নূর পরিপূর্ন হইয়া গিয়াছে। এই জন্য দুনিয়া তাহাদের অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহাদের ঈমানের চেহারার উপর কোন দাগ কাটিতে পারে নাই। যে সব অন্তর আল্লাহর প্রেমে কানায় কানায় ভরপুর এবং আল্লাহর নৈকট্যের নূরে আলোকিত এমন অন্তরে দুনিয়া কিভাবে প্রবেশ করিতে পারে?

আল্লাহ পাক বলেন-

ان عبادی لیس لك عليهم سلطان *

নিশ্চয়ই আমার খাছ বান্দাদের উপর তোর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ চলিবে না। যদি তাহাদের অন্তরের উপর দুনিয়ার প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তাহাদের অন্তরের উপর শয়তানেরও নিয়ন্ত্রণ চলিত। কেননা যে সব অন্তর পার্থিবতা বর্জনের নূর দ্বারা আলোকিত এবং পার্থিবতা প্রেমের ময়লা আবর্জনা থেকে মুক্ত শয়তানের প্রভাব ঐ সব অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং

ان عبادی لیس لك عليهم سلطان *

আয়াতের সারকথা হইল হে শয়তান! আমার খাছ বান্দাদের উপর তোর কোন নিয়ন্ত্রণ চলিবে না এবং অন্য কোন মাখলুকেরও চলিবে না। কেননা তাহারা আমার বড়ত্বের প্রাধান্য ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রাধান্য অন্তরে আসিতে দেয় না। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাহাদের একটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোনরূপ ব্যবসা-বানিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে আল্লাহর স্বরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে না। এই কথা বলেন নাই যে, তাহারা ব্যবসা-বানিজ্য ও বেচা-কেনা করিতেন না। বরং এই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। উল্লেখিত আয়াতে তাহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া اقام الصلوة و ايتاء الزكوة এই বিষয়দ্বয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিত্তশালী হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কেননা বিত্তশালী হওয়া নিষেধ করা যদি উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে যে কাজ করিলে বিত্তশালী হওয়া যায় তাহা করাও নিষেধ করিতেন।

উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বানিজ্য ও বেচাকেনা করা নিষেধ করিতেন। লক্ষ্য কর ایتاء الزکوۃ (যাকাত আদায় করা) এখানে প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। আর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং এখান থেকে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে উল্লেখিত গুণাবলীর ধারকগণের মধ্যে কেহ কেহ বিত্তশালীও ছিলেন। এতদ্বসত্ত্বেও তাহারা প্রশংসার যোগ্য রহিয়াছেন যখন তাহারা স্বীয় প্রভুর হক আদায় করিয়াছেন।

কয়েকজন বিত্তশালী সাহাবার (রাঃ) অবস্থার বিবরণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওতবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রাঃ) যে দিবসে শহীদ হইয়াছেন সে দিবসে তাহার সম্পদের কোষাধ্যাক্ষের কাছে নগদ অর্থ ছিল দেড়লক্ষ দিনার আর দশ লক্ষ দেরহাম। আরিস ও খায়বর এবং ওয়াদিউল কুরা নামক স্থান ত্রয়ের মধ্যস্থলে তাহার কিছু জমি ছিল। ইহার মূল্য ছিল দুই লক্ষ দিনার।

হযরত যুবায়র (রাঃ)-এর পরিত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার। এই হিসাবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পদের মোট মূল্য ছিল চার লক্ষ দিনার। অধিকন্তু এক হাজার অশ্ব এবং এক হাযার গোলামও তাহার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে ছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) মৃত্যুর সময় নগদ তিন লক্ষ দিনার ছাড়িয়া গিয়াছেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) খ্যাতিমান বিত্তশালী ছিলেন। ইহাতো সকলেই জানে। দুনিয়া এই সকল মহাপুরুষদের হাতের মধ্যে ছিল, অন্তরের মধ্যে ছিল না। যখন পার্থিব সম্পদ হাতে থাকিত না তখন সবর করিতেন। আর যখন হাতে আসিত শুকরিয়া আদায় করিতেন। আল্লাহ পাক প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অভাব-অনটনে ডুবাইয়া রাখেন। ফলে তাহারা আন্তরিকভাবে পরিপূর্ণ নূর লাভ করেন এবং তাহাদের অন্তর পবিত্র হইয়া যায়। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করেন। কেননা যদি প্রথমেই তাহারা সম্পদের অধিকারী হইয়া পড়িতেন। তাহা হইলে হয়তবা সম্পদ তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিত। যেহেতু তাহাদের মধ্যে একীন বদ্ধমূল ও স্থায়ী হইয়া যাওয়ার পর তাহারা সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন তাই তাহারা নিজস্ব সম্পদের ক্ষেত্রেও আমানতদার কোষাধ্যাক্ষের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। আর আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত নির্দেশ মোতাবেক আমল করিয়াছেন

তোমরা ঐ সকল সম্পদ থেকে খরচ কর যাহাতে আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে খলীফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিয়াছেন।

সারকথা- তাহারা নিজস্ব সম্পদ মালিকের ন্যায় খরচ করিতেন না বরং মালিকের চাকরের ন্যায় খরচ করিতেন।

আল্লাহ্ পাক মুসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে প্রথম প্রথম কেন নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা এখান থেকে বুঝা যায়। জিহাদ নিষেধ করিয়া আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَ اعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ *

মাফ কর এবং ক্ষমা করিতে থাক। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ না করেন।

ইহার কারণ এই যে, যদি ইসলামের সূচনা যুগেই জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হইত তাহা হইলে হয়তাবা মুজাহিদগণ জিহাদে ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কাফেরদের হত্যা করিতেন আর নিজেদের খারাপ নিয়তের খোঁজও পাইতেন না। হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফেরদের এক আঘাত করার পর কিছুক্ষন বিলম্ব করিয়া দ্বিতীয় আঘাত করিতেন। কেননা সাথে সাথে একের পর এক আঘাত করিতে থাকিলে জিহাদে স্বীয় প্রবৃত্তির দখলের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। তিনি এই ভয়ে এইরূপ করিতেন। তাঁহার এইরূপ করার কারণ ইহা ছিল না যে, তিনি নফসের লুকায়িত ধোকাসমূহ কি কি তাহা জানিতেন। সাহাবাগণ সর্বদা নিজেদের অন্তরের হেফাজত করিতেন। নিজেদের আমল বিশুদ্ধ ও খালেছ করিবার চেষ্টা করিতেন। আর সর্বদা এই ভয় করিতেন যে না জানি তাহাদের আমলের মধ্যে এমন কোন জিনিস মিশ্রিত হইয়া যায় যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হওয়ার পথে অন্তরায় হয়। সুতরাং পার্থিবতা সাহাবাদের হাতে ছিল অন্তরে ছিল না। ইহার প্রমাণ এই যে, সাহাবাগণ দুনিয়া হইতে পৃথক থাকিতেন এবং অন্যকে নিজের উপর প্রাধাণ্য দিতেন। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কুরআনে ঘোষণা করেন-

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *

তাহারা অন্যদিগকে নিজের উপর প্রাধাণ্য দেয় যদিও ক্ষুধায় জর্জরিত থাকে। এই সম্পর্কে তাহাদের এক ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন এক সাহাবীর ঘরে হাদিয়া স্বরূপ ছাগলের একটি মাথা আসিল। তিনি মনে মনে বলিলেন যে, অমুক ব্যক্তি তো আমার অপেক্ষা অধিক হকদার। তখন তিনি অন্য

এক ঘরের নাম বলিয়া দিলেন যে, ঐ ঘরের লোক আমার অপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষী সেখানে লইয়া যাও। অন্য ঘরে লইয়া যাওয়ার পর সে ঘরওয়ালারা অন্য আর এক ঘরের নাম বলিয়া দিল। এইভাবে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে ঘুরিতে ঘুরিতে সাত আট ঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার প্রথম ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ দলীল হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা। তিনি এক জিহাদে স্বীয় সম্পদের অর্ধাংশ আর হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বীয় সমুদয় সম্পদই দান করিয়াছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদ বোঝাই সাতশত উট দান করিয়াছিলেন। আর হযরত উসমান (রাঃ) তবুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সমস্ত খরচ বহন করিয়াছিলেন। অনুরূপ অনেক ভাল ভাল কাজ এবং প্রশংসনীয় অবস্থার কথা তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণিত আছে। আল্লাহ পাক তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন-

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ *

তাহারা এমন সব লোক যাহারা আল্লাহ পাকের কাছে প্রদত্ত ওয়াদা সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন। অত্র আয়াতে-আল্লাহ পাক তাহাদের অন্তরে লুকায়িত সত্যতার খবর দিয়াছেন। সুতরাং ইহা তাহাদের জন্য খুব বড় প্রশংসা এবং গৌরবের কথা। কেননা, বাহ্যিক কর্ম সম্পর্কে মাখলুকের বাহ্যিক জ্ঞান সন্দেহযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং এই সকল আয়াতে তাহাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন অবস্থার পবিত্রতা ও সাফায়ী বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের প্রশংসা ও গৌরব প্রমাণিত হইতেছে। ইহা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তদবীর (ব্যবস্থা অবলম্বন) দুই প্রকার। এক প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন যাহা দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই দুনিয়াবী ব্যবস্থা। যেমন বর্তমান যুগে দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থা। দ্বিতীয় আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনদের অবস্থা। ইহার দলীল হিসাবে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইরশাদ পেশ করা যায়। তিনি ইরশাদ করেন যে, আমি নামাযের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর আসবাবপত্র ঠিক করি। হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহ পাককে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা অবস্থায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাম আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। এ জন্য তাহার নামাযও ফাসেদ হয় নাই; এমনকি নামাযের পরিপূর্ণতায়ও কোন ক্ষতি হয় নাই।

এক প্রশ্ন ও উহার উত্তর

যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করে যে, তোমাদের দাবী তো হইল যে, সাহাবাদের কেহই দুনিয়ার পিছনে পড়েন নাই। তাহারা পার্থিবতা অনুসন্ধানী ছিলেন না। অথচ ওহুদের যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাহাদের সম্পর্কে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দুনিয়া চাহিতেছিলে আর কেহ কেহ আখেরাতের অনুসন্ধানী ছিলে। এমন কি কোন কোন সাহাবা বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত আমরা বুঝিতে পারিতেছিলাম না যে আমাদের মধ্যে দুনিয়ার ইচ্ছা পোষণকারী আছে। আয়াতটি এই যে-

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ *

তোমাদের মধ্যে কতক দুনিয়ার ইচ্ছা পোষণ করিতেছ আর কতক আখেরাত চাহিতেছ।

সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহই দুনিয়ার ইচ্ছা করে নাই এমন কথা বলা কিভাবে সহীহ হইতে পারে?

এই আপত্তির সমাধান শুনার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা বুঝিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইল এই যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভাল ধারণা রাখা প্রতি মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। অনুরূপভাবে তাহাদের উচ্চ মর্যাদা মনে প্রাণে স্বীকার করা এবং তাহাদের সমুদয় উক্তি, বক্তব্য, কাজকর্ম এবং অবস্থা প্রভৃতি উত্তম অর্থে প্রয়োগ করা অপরিহার্য কর্তব্য। এই সব বিষয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশার সাথে সম্পর্কিত হউক বা তাহার ওফাতের পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কিত হউক। ইহার দলীল এই যে, আল্লাহ পাক যখন তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন তখন ইহা কোন যুগ বা কালের সাথে সীমাবদ্ধ করেন নাই। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 'আমার সাহাবী নক্ষত্রের ন্যায়।' তাহাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ কর হেদায়েত পাইয়া যাইবে। ইহাও কোন কালের সাথে সম্পর্কিত না করিয়া ব্যাপক রাখিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁহার ওফাতের পর উভয় সময়ে তাহাদের থেকে যে সব উক্তি, বক্তব্য, কাজকর্ম এবং অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে এইগুলিকে উত্তম অর্থে প্রয়োগ করা অপরিহার্য কর্তব্য। এখন উল্লেখিত আপত্তির সমাধান শুন। ইহার সমাধান দুইভাবে পেশ করা যাইতে পারে।

এক ঃ তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দুনিয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলে ইহার অর্থ তোমারা আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলে। অর্থাৎ এই সকল লোক গনিমতের মাল অর্জনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাল অর্জনের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল আখেরাত। কেননা এই মাল খরচ করিয়া এবং দান করিয়া নেক আমল অর্জন করা ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহাদের দুনিয়ার ইচ্ছা করার এই অর্থ। নিছক দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়া নয়। আর কতক সাহাবা ছিলেন যাহাদের ইহাও উদ্দেশ্য ছিল না। তাহারা শুধু জিহাদের মর্যাদা অর্জন করাকেই যথেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। গনীমতের মালের দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই এবং মনোযোগও দেন নাই। সুতরাং তাহাদের কতকজন ছিলেন মর্যাদাবান ও পরিপূর্ণ। আর কতক ছিলেন তাহাদের অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান ও অধিক পরিপূর্ণ। কেহই অসম্পূর্ণ ছিলেন না।

দুই ঃ মনিব স্বীয় খাছ গোলামকে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। কিন্তু ঐ গোলামের সাথে আদবের সহিত আচরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কেননা মনিবের সাথে তাহার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। মনিব স্বীয় গোলামকে যাহা বলিবেন আমরাও তাহাকে তাহাই বলিব এমন হইতে পারে না। কেননা মনিব গোলামকে যাহা ইচ্ছা বলিবেন যাহাতে মনিবের খেদমতে গোলামের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আর তাহার সাহস এবং ইচ্ছায় উন্নতি হয়। কিন্তু আমরা গোলামকে কিছু বলিতে হইলে তাহার প্রতি আদবের খেয়াল করিয়া বলিতে হইবে। কুরআন অনুসন্ধান করিলে অনুরূপ অনেক ঘটনা চোখে পড়িবে। উদাহরণ স্বরূপ সূরায়ে 'আবাসা'তে উল্লেখিত বিষয়বস্তু। এমনকি হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কোন বিষয় গোপন করিতে চাহিতেন তাহা হইলে সূরায়ে 'আবাসা'কে অবশ্যই গোপন করিয়া ফেলিতেন।

মোটকথা, উপরের আলোচনা দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করার অর্থ এই নহে যে, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও আখেরাত উদ্দেশ্য হইলেও পার্থিব মাধ্যম ব্যবহার করা যাইবে না। বরং যে ব্যবস্থা অবলম্বন নিষিদ্ধ তাহা হইল পার্থিবতা লাভের উদ্দেশ্যে পার্থিব মাধ্যম গ্রহণ করা। নিষিদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বন করার নিদর্শন এই যে এই ব্যবস্থা নাফরমানীর সহায়ক হিসাবে প্রকাশ পাইবে এবং হালাল হারামের প্রতি খেয়াল না রাখিয়া কার্যসম্পাদন করিবে। কোন জিনিস প্রশংসনীয় বা ঘৃণিত হওয়া উক্ত জিনিসের ফলাফলের ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। যদি ইহার ফল ভাল হয় তাহা

হইলে জিনিসটি প্রশংসনীয়। আর যদি ইহার ফল খারাপ হয় তাহা হইলে জিনিসটি ঘৃণিত। সুতরাং ঘৃণিত ব্যবস্থা হইল যাহা অবলম্বন করার ফলে বান্দা আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে গাফেল হইয়া পড়ে। মনিবের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে শিথিল হইয়া পড়ে এবং তাহার নির্দেশ পালনে বিরত থাকে। আর প্রশংসিত ব্যবস্থা অবলম্বন তদ্রূপ নয়। বরং ইহা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য প্রদান করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছায়। অনুরূপভাবে পার্থিবতা মূলতঃ প্রশংসিতও নয় আবার ঘৃনিতও নয়। বরং ঘৃণিত পার্থিবতা হইল যাহা বান্দাকে মনিব হইতে গাফেল করিয়া দেয় এবং আখেরাতের পাথেয় উপার্জনে বিরত রাখে। যেমন কোন কোন আরেফ বলেন যে, তোমাকে যাহা আল্লাহ্ থেকে গাফেল করিয়া রাখে তাহা তোমার জন্য অশুভ জিনিস। যদিও তাহা তোমার স্ত্রী হয় বা ধন সম্পদ হয় বা তোমার সন্তানাদি হয়।

প্রশংসিত পার্থিবতা হইল যাহা তোমার জন্য আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যে সহায়ক হয় এবং তোমাকে মনিবের খেদমতের উদ্দেশ্যে উৎসাহী এবং যোগ্য করিয়া তোলে। মোটকথা যাহা ভাল কাজের মাধ্যম হয় তাহাই প্রশংসিত। আর যাহা খারাপ কার্যের মাধ্যম হয় তাহা ঘৃণিত। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়া দুর্গন্ধযুক্ত একটি মৃত পশুর তুল্য। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, দুনিয়া অভিশপ্ত। আর দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে তাহাও অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর যিক্র আর যে সব জিনিস উহার সাথে সম্পর্কিত এবং আলেম ও ইলমে দ্বীনের অন্বেষণকারী। তাহারা অভিশপ্ত নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে মানবের নির্গত মলের সাথে উদাহরণ দিয়াছেন। এই সকল হাদীছের চাহিদা এই যে, দুনিয়া ঘৃনিত এবং মানুষও যেন ইহা ঘৃণা করে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়াকে গালি দিও না। ইহা ঈমানদারের জন্য খুব ভাল বাহন। ইহাতে আরোহন করিয়া কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে পারে এবং অকল্যাণ হইতে বাঁচিতে পারে। এর মধ্যে সাম স্য হইল যে, দুনিয়াকে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশপ্ত বলিয়াছেন। তাহা হইল যেই দুনিয়া বান্দাকে আল্লাহ্ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। এই জন্যই তিনি দুনিয়াকে অভিশপ্ত বলিয়া সাথে সাথে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে "কিন্তু আল্লাহ্ পাকের যিকি্র আর যে সব জিনিস ইহার সাথে সম্পর্কিত এবং আলেম ও ইলমে দ্বীন অন্বেষণকারী" অর্থাৎ এইগুলি অভিশপ্ত

দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। পক্ষান্তরে যেই দুনিয়া সম্পর্কে বলিয়াছেন যে দুনিয়াকে গালি দিও না। ইহা ঐ দুনিয়া যাহা তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য পর্যন্ত পৌঁছায়। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহা ঈমানদারের জন্য খুব ভাল বাহন। সুতরাং বাহন হিসাবে ইহার প্রশংসা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা ধোকাবাজি ও গোনাহের স্থান। এই হিসাবে ইহার ঘৃণা করা হইয়াছে। সুতরাং এখান থেকে তুমি অনুধাবন করিতে পরিয়াছ যে, ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করার এই অর্থ নহে যে যে কোন মাধ্যম গ্রহণ করা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরাইয়া লইতে হইবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে মানুষ ধ্বংস হইতে থাকিবে এবং অন্যের উপর বোঝা হইয়া যাইবে এবং মাধ্যম, ওসিলা প্রভৃতির ভিতর আল্লাহ পাকের যে হেকমত রহিয়াছে সে সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ থাকিবে। ইহা কখনও উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা একজন ইবাদতকারীর নিকট দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তিনি এই ইবাদতকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কোথায় থেকে খানাপিনা কর? সে বলিল যে, আমার ভ্রাতা আমার কাছে খাদ্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিলেন, তোমার ভ্রাতা তোমার চেয়ে অধিক ইবাদতকারী। অর্থাৎ তোমার ভ্রাতা বাজারে থাকা সত্ত্বেও তোমার চেয়ে বেশী ইবাদতকারী। কেননা সে তো ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমার সাহায্যকারী। ইবাদতের জন্য তোমাকে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

সারকথা- আসবাব (উপায়) অবলম্বন করা কিভাবে অস্বীকার করা যাইতে পারে? অথচ কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে- احل الله البيع و حرم الربوا আল্লাহ পাক বেচাকেনা হালাল করিয়াছেন আর সুদ হারাম করিয়াছেন।

অন্য এক স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে- و اشهدوا اذا تبايعتم যখন তোমরা বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী নির্ধারিত করিয়া লও।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ যে সকল আহার্য বস্তু খায় তম্মধ্যে সর্বাধিক হালাল যাহা মানুষ নিজ হাতে উপার্জন করে।

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খাইতেন। তিনি আরও বলেন, ধোকাবাজি না করিয়া নিজ হাতে যাহা কামাই করে তাহা সবচেয়ে ভাল কামাই। অন্য এক হাদীছে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, যে মুসলমান ব্যবসায়ী আমানতদার, সত্যবাদী সে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকিবে।

এই সকল আয়াত ও হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে সর্বপ্রকার

আসবাবকে (উপায়) কিভাবে অস্বীকার করা যায়? তবে যাহা বান্দাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করিয়া দেয় এবং তাঁহার আহকাম পালনে বিরত রাখে তাহা অবশ্যই ঘৃনিত। এমনকি যদি কেহ সর্বপ্রকার আসবাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকে। পার্থিব কোন মাধ্যমই গ্রহণ না করে। ইহার পরও আল্লাহ থেকে গাফেল থাকে ইহাও ঘৃনিত।

উপায় অবলম্বনকারী ও উপায় বর্জনকারীর বিপদাপদ

বিপদাপদ শুধু উপায় অবলম্বনকারীর উপরই আসে না বরং উপায় পরিত্যাগকারীর উপরও পতিত হয়। কিন্তু আল্লাহ পাকের ক্রোধ হইতে ঐ ব্যক্তিই বাঁচিতে পারে যাহার প্রতি তাঁহার মেহেরবানী হয়। বরং কখনও কখনও উপায় পরিত্যাগকারীর প্রতি অপেক্ষাকৃত কঠিন বিপদ আপতিত হইয়া থাকে। কেননা, উপায় অবলম্বনকারীর প্রতি আপতিত বিপদ তো ইহা যে সে পার্থিবতায় প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সে নিজেদের ভিতর বাহির এক রকম বলিয়া দাবী করে না। নিজের দুর্বলতা ও অপরাধ স্বীকার করে। যাহারা পার্থিবতা থেকে পৃথক হইয়া ইবাদতে লাগিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নিজের অপেক্ষা উত্তম মনে কর। উপায় পরিত্যাগকারীর বিপদ হইল তাহার মধ্যে আত্মগর্ব জন্ম লওয়া, লৌকিকতা, বানোয়াট অথবা মাখলুকের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা যাহাতে তাহাদের থেকে সম্পদ ও অর্থ বাগাইয়া লইতে পারে। কখনও কখনও তাহার প্রতি আপতিত বিপদ এমনও হয় যে, সে মাখলুক নির্ভর হইয়া পড়ে। ইহার নিদর্শন এই যে, যদি মানুষ তাহাকে সম্মান না করে তাহা হইলে সে তাহাদের দুর্নাম করিতে থাকে। তাহাদিগকে সুদৃষ্টিতে দেখে না। যদি তাহার সেবা না করে তাহা হইলে তাহাদের প্রতি নাখোশ হইয়া পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি গাফেল অবস্থায় পার্থিব উপায় অবলম্বনে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার অবস্থা উল্লেখিত উপায় পরিত্যাগকারীর অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল।

আল্লাহ পাক আমাদের নিয়ত দুরস্ত করিয়াছেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে আমাদিগকে এই সকল বিপদাপদ হইতে দূরে রাখেন।

অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের আলোচনা থেকে তুমি হয়তবা বুঝিয়া লইয়াছ যে উপায় অবলম্বনকারী আর উপায় বর্জনকারী সমপর্যায়ভুক্ত। তোমার এইরূপ বুঝার ভিত্তি হয়তবা ইহা যে উভয়ের প্রতি বিপদ আপতিত হয় আর চেষ্টা করিলে উভয়ে ইহা হইতে বাঁচিয়াও থাকিতে পারে। সুতরাং উভয় পক্ষ সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু তোমার এই ধারনা সহীহ নহে। কারণ প্রকৃত বিষয়টি এইরূপ নয়। যে ব্যক্তি নিজকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে এবং

স্বীয় ওয়াক্ত তাঁহার ইবাদতে নিয়োজিত করিয়াছে আল্লাহ পাক কখনও এই ব্যক্তিকে পার্থিব উপায়ে নিমজ্জিত ব্যক্তির সমকক্ষ করিবেন না। যদিও তাহার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে। সুতরাং উপায় অবলম্বনকারী আর উপায় বর্জনকারী উভয়ে যদি আল্লাহর মারেফাত অর্জনে একই পর্যায়ের হইয়া থাকে তবুও উপায় বর্জনকারী উত্তম।

এক বুযুর্গ উপায় অবলম্বনকারী আর উপায় বর্জনকারীর উদাহরণ এইভাবে পেশ করিয়াছেন যে যেন তাহারা এক বাদশাহের দুই গোলাম। বাদশাহ এক গোলামকে বলিলেন যে, তুমি উপার্জন কর আর উপার্জনের অর্থে জীবিকা নির্বাহ কর। দ্বিতীয় গোলামকে বলিলেন যে, তুমি আমার দরবারে থাকিয়া আমার খেদমত কর। আমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করিব। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় গোলামের মর্যাদা মনিবের কাছে অনেক বেশী। তাহার সাথে মনিবের এইরূপ আচরণ তাহার প্রতি মনিবের বিশেষ অনুগ্রহের প্রমাণ। অধিকন্তু পার্থিব উপায় অবলম্বন করার পর নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল ইবাদত নসীব হওয়া বড়ই দুষ্কর ও দুরূহ। কেননা ইহাতে বিভিন্ন প্রকার লোকের সাথে সময় কাটাইতে হয় এবং অসতর্ক ও উদ্ধত লোকদের সাথে মিলামিশা করিতে হয়। কেননা ইবাদতকারীদের দর্শন ইবাদতের জন্য বড় সাহায্যকারী এবং গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ গোনাহের বড় কারণ হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মানুষ স্বীয় বন্ধুর দ্বীনের উপর চলে। সুতরাং চিন্তা করিয়া বন্ধুত্ব করিও। কোন এক কবি এই বিষয়ে একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল-

☆ মানুষকে জিজ্ঞাসা করিও না কিন্তু তাহার বন্ধুকে দেখ।

☆ কেননা বন্ধু বন্ধুর অনুসারী হয়।

☆ যাহার মধ্যে দোষ ও খারাপী রহিয়াছে তাহার থেকে তাড়াতাড়ি পৃথক হইয়া পড়।

☆ মিলিয়া মিশিয়া কল্যানাবলম্বী হও। খারাপ হইও না।

নফসের (আত্মার) এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যে, যাহার সাথে মিলিত হয় উহার অনুরূপ গ্রহণ করে। উহার অনুকরণ করে। উহার গুণে গুণান্বিত হয় এবং উহার সাদৃশ্য হয়।

গাফেলদের সংশ্রব নফসের গাফলতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কেননা নফসের মধ্যে জন্মগতভাবে গাফলতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং গাফলতি

বৃদ্ধির কোন কারণ অর্থাৎ গাফেলদের সংশ্রব যখন নফসের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন নফসের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। হে ভ্রাতা! তুমি নিজের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ যখন তুমি ঘর হইতে বাহির হও আর যখন ঘরে ফিরিয়া আস উভয় সময় তোমার অবস্থা এক রকম থাকে না। ঘর থেকে যাওয়ার সময় তোমার উপর অন্তরের নূরের প্রাধান্য থাকে। তোমার বক্ষ প্রশস্ত থাকে। অন্তরে ইবাদতের উদ্যম থাকে। দুনিয়ার প্রতি থাকে তোমার অনাসক্তি। কিন্তু ফিরিয়া আসার সময় তোমার মধ্যে এই শক্তি থাকে না। তোমার উন্নত আভ্যন্তরিন অবস্থাও থাকে না। আর এই উন্নত অবস্থা বিদ্যমান না থাকা এবং দূরীভূত হওয়ার কারণ শুধু সংশ্রবের পঙ্কিলতা এবং পার্থিবতার অন্ধকারে অন্তর নিমজ্জিত হওয়া। গোনাহ্ করার কারণ দূর হওয়া এবং যদি গোনাহ্ বন্ধ হওয়ার ফলে গোনাহের প্রভাবও উঠিয়া যাইত তাহা হইলে গোনাহের কারণ ও গোনাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর আল্লাহর দিকে অন্তরের ভ্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হইত না। বুঝা গেল গোনাহ্ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পরও গোনাহের প্রভাব বিদ্যমান থাকে। ইহা অগ্নির সাথে তুলনা করা যায়। আগুনের দহন থামিয়া গেলেও দহনের প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যেমন দাহিত বস্তু শেষ পর্যন্ত কাল রং বিশিষ্ট অঙ্গার হইয়া অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং উপায় (আসবাব) অবলম্বনকারী উপায় বর্জনকারীর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্মল হইতে পারে না। এই অবস্থায় তাহার জন্য দুইটি জিনিস অত্যন্ত জরুরী। এক, ইলম। দুই, তাকওয়া। ইলমের দ্বারা সে হালাল হারাম জানিতে পারিবে। আর তাকওয়ার দ্বারা গোনাহে পতিত হওয়া থেকে বাঁচিবে। ইলমের প্রয়োজন এই জন্য যে বেচাকেনা, লেনদেন, চুক্তি, নগদ অর্থের লেনদেন প্রভৃতির সাথে যে সব আহ্কাম সম্পর্কিত তাহা জানা তাহার জন্য একান্ত জরুরী। সাথে সাথে ইহাদের মধ্যে কোনটি ওয়াজিব, কোনটি ফরয উহা জানাও একান্ত অপরিহার্য। যাহাতে কোন আহকাম তাহার থেকে ছুটিয়া না যায়।

সতর্কতা ঃ উপায় অবলম্বনকারীর জন্য কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী।

এক ঃ ঘর থেকে বাহির হওয়ার পূর্বে সে দৃঢ়ভাবে নিয়ত করিয়া লইবে যে, যদি কোন ব্যক্তি আমাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় বা কোন দিক দিয়া আমাকে অস্থির করিয়াও তোলে তখন আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। কেননা বাজার এমন একটি স্থান যেখানে ঝগড়া-বিবাদ ও বাক-বিতণ্ডা হইয়াই থাকে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা কি আবু যমযমের মত হইতে পার না? তাঁহার অভ্যাস ছিল যে সে ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় দোয়া করিত, হে আল্লাহ! আমি স্বীয় ইয্যত সম্মান মুসলমানদের জন্য সদকা করিয়াছি।

দুই ঃ ঘর হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে ওজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া আল্লাহ পাকের কাছে এই দোআ করিয়া লওয়া উচিত যে, এই ভ্রমনে আল্লাহ পাক যেন তাহাকে নিরাপদ রাখেন। কেননা সে তো জানে না যে, তাহার জন্য কি কি নির্ধারিত রহিয়াছে। কেননা যে বাজারে যায় সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে যুদ্ধে যায়। সুতরাং মুসলমানদের উচিত সে যেন আল্লাহর রজ্জুকে আকঁড়াইয়া ধরে এবং তাওয়াক্কুলের লৌহ বর্ম পরিধান করে যাহাতে শত্রুর অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ বাজারে শয়তানের পুরা দখল থাকে। সুতরাং শয়তানের এবং তাহার জ্বীন ইনসান অনুচরদের ধোকা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করা অত্যাবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়াছে। সে সোজা রাস্তা পাইয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিয়াছে আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ট।

তিন ঃ যখন ঘর হইতে বাহির হও। তখন পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি, ঘরবাড়ী এবং ঘরবাড়ীর আসবাবপত্র আল্লাহ পাকের কাছে সোপর্দ করিয়া যাওয়া উচিত। যাহাতে ইহাদের উপর আল্লাহ পাকের হেফাজত আরও অধিক হয় এবং নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিবে-

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ *

আল্লাহ পাক উত্তম হেফাজতকারী এবং সর্বাধিক মেহেরবানী করনেওয়ালা। হাদীছের মধ্যে অন্য একটি দোয়াও বর্ণিত হইয়াছে। তাহাও পাঠ করিবে-

اللهم انت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الاهل و الولد و المال *

হে আল্লাহ! আপনি সফরের সাথী এবং পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি এবং ধন-সম্পদের যিম্মাদার।

কেননা, আল্লাহর কাছে অর্পণ করা হইলে পুনরায় ইহাদিগকে ভাল অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়ার আশা করা যায়। এই সম্পর্কে একটি ঘটনা রহিয়াছে। তাহা হইল এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করিল। তাহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। যখন সফরে রওয়ানা করিল তখন আল্লাহ পাকের কাছে দোআ করিল, হে আল্লাহ! এই নারীর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমি তোমার কাছে সোপর্দ করিলাম। ঘটনাচক্রে তাহার সফরকালীন সময়ে তাহার স্ত্রী ইন্তিকাল করিল। সফর থেকে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। লোকজন বলিল, সে তো গর্ভবতী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিয়াছে। রাত্রে দেখিতে পাইল যে, কবরস্থান হইতে একটি আলোক রশ্মি বাহির হইয়া আসিতেছে। সে আলোক রশ্মি

অনুসরণ করিয়া কবরস্থানের দিকে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইল যে, আলোক রশ্মিটি তাহারই স্ত্রীর কবর হইতে বাহির হইতেছে। একটি ছোট্ট শিশু তাহার মৃতা স্ত্রীর স্তন থেকে দুধ পান করিতেছে। তখন অদৃশ্য থেকে কে যেন আওয়াজ দিয়া বলিতেছে যে তুমি তো সফরে যাওয়ার সময় শিশুকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করিয়া গিয়াছিলে। তাই এখন তুমি তাহাকে পাইয়াছ। যদি তুমি উভয়কে সোপর্দ করিয়া যাইতে তাহা হইলে উভয়কে পাইতে।

চার ঃ যখন ঘর হইতে বাহির হইবে তখন নিম্নোক্ত দোআটি পাঠ করা তাহার জন্য মুস্তাহাব।

بسم الله توكلت على الله لا حول و لا قوة الا بالله *

আল্লাহর নামে চলিলাম। আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিলাম। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্যে গোনাহ থেকে বাঁচা যাইবে না এবং তাঁহার সাহায্য ব্যতীত ইবাদতেও শক্তি পাওয়া যাইবে না।

এই দোআ পাঠ করার ফলে শয়তান নিরাশ হইয়া যায়

পাঁচ ঃ মানুষকে সৎকার্যের আদেশ করিবে। আর অসৎকার্য থেকে বাধা দিবে। যেহেতু আল্লাহ পাক তাহাকে শক্তি ও তাকওয়া নামক দুইটি নিয়ামত দান করিয়াছেন। সে সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যের নিষেধ করাকে উল্লেখিত নিয়ামতদ্বয়ের শুকরিয়া বলিয়া মনে করিবে। অধিকন্তু সে যেন আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদ স্বরণ করে। আল্লাহ পাক বলেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ *

এমন লোক যে যদি আমি তাহাদিগকে যমীনে শক্তি প্রদান করি; তাহা হইলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, সৎকার্যের আদেশ করিবে এবং অসৎ কার্য হইতে বিরত রাখিবে এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত কাজের শেষফল।। সুতরাং যে ব্যক্তির জন্য সৎকার্যের আদেশ করা আর অসৎকার্যের নিষেধ করা সম্ভব এবং ইহা করিতে গিয়া তাহার জীবনের বা ইয্যত সম্মানের বা ধন সম্পদের উপর কোন বিপদ না আসে তাহা হইলে সে এই কার্যের জন্য সামর্থ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। আর এই কার্য সম্পাদন করা এমন ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হইয়া যায়। আর যদি সৎকার্যের আদেশ ও অসৎ কার্যের নিষেধ করিতে গিয়া কোন বিপদের আশংকা থাকে তখন তাহার উপর থেকে ওয়াজিব রহিত হইয়া যায়। তখন অসৎ কার্য থেকে নিষেধ না করিতে পারিলে

শুধু অন্তর দ্বারা খারাপ বুঝাই যথেষ্ঠ

ছয় ঃ চলার সময় নিরবতা ও গাম্ভীর্যতার সাথে চলিবে। আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন-

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا *

আল্লাহ্ পাকের খাছ বান্দারা এমন লোক যাহারা যমীনের উপর নরমভাবে চলে। আর যখন জাহেল লোকেরা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা বলে সালাম।

নিরবতা ও গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করা শুধু চলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রতিটি কার্যে নিরবতা অবলম্বন করা এবং প্রতিটি বিষয়ে স্বাতন্ত্রতা অবলম্বন করা উচিত।

সাত ঃ বাজারে গিয়া আল্লাহ্ পাককে স্বরণ রাখিবে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, গাফেল লোকদের মধ্যে যিকর করণেওয়ালার মর্যাদা জিহাদের ময়দান হইতে পলায়নকারীদের তুলনায় জিহাদে রত মুজাহিদের মর্যাদার অনুরূপ। বাজারে আল্লাহর যিকরকরনেওয়ালার উদাহরণ মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তির উদাহরণ।

পূর্ববর্তী কোন কোন মানুষের অভ্যাস ছিল যে, তাহারা খচ্চরের উপর আরোহন করিয়া বাজারে যাইত আর আল্লাহ্ পাকের যিকর করিয়া ফেরত আসিত। তাহাদের বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্য একমাত্র ইহাই ছিল।

আট ঃ বেচাকেনা এবং উপার্জনের সময় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ব্যাপারে গাফেল থাকিবে না। কেননা এই সব ব্যস্ততার কারণে যদি নামায দুর্বল হয় তাহা হইলে আল্লাহ্ পাক গোস্বা হইয়া যান এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে সে বরকত হারাইবার যোগ্য হইয়া পড়ে। বান্দার এই ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ পাক বান্দাকে দেখিতে থাকিবেন যে, বান্দা স্বীয় ফিকিরে পড়িয়া স্বীয় প্রভুর হক আদায়ে অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছে। সলফে সালেহীনদের মধ্যে কাহারও কাহারও এমন অভ্যাস ছিল যে, তাহারা হাতুড়ী হাতে নিজের কাজ করিতেছিলেন। কাজ করিবার জন্য হাতুড়ী উপরে উঠাইয়াছেন। আর এই দিকে মুয়ায্যিন আযান শুরু করিয়াছে। মুয়ায্যিনের আযানের শব্দ শুনিয়া হাতুড়ি পিছনের দিকেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর সামনে আনেন নাই। তাহারা এইরূপ করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের দিকে আহবান শুনার পর তাহারা কোন কাজে লিপ্ত আছেন বলিয়া সাব্যস্ত না হয়।

যখন মুয়ায্যিনের আওয়াজ শুনে তখন সে যেন আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ স্বরণ করে- يا قومنا اجيبوا داعى الله হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর প্রতি আহবানকারীর কথা মান্য কর। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْ لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْيِيْكُمْ *

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা মান্য কর যখন তোমাদিগকে এমন জিনিসের দিকে আহবান করা হয় যাহা তোমাদের হায়াতের কারন হয়।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন- استجيبوا لربكم স্বীয় প্রভুর কথা মান্য কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকা অবস্থায় স্বীয় জুতা মোবারক ঠিক করিতেন এবং খাদেমের কাজে সহায়তা করিতেন। কিন্তু যখন আযানের আওয়াজ হইত তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন। তখন তাহার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইত যে, তিনি যেন আমাদিগকে চিনেনই না।

নয় ঃ শপথ করিবে না। নিজের জিনিসপত্রের সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করিবে না। এই সম্পর্কে খুব শক্ত ধমকি আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ব্যবসায়ীরা দুশ্চরিত্র গোনাহগার হয় তবে যে নেক কাজ করে এবং সত্য কথা বলে সে এইরূপ নয়।

দশ ঃ গীবত এবং চোগলখুরী (পরনিন্দা) করিবে না। আল্লাহ্ পাকের হুশিয়ারী বানী স্বরণ রাখিবে- و لا يغتب بعضكم بعضا তোমাদের মধ্যে একে অপরের গীবত করিবে না। তবে কি তোমরা ইহা পছন্দ কর যে, স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশত খাইবে?

নিঃসন্দেহে ইহা তোমাদের পছন্দ হইবে। তবে এ কথাটিও স্বরণ রাখিবে যে, গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীর সমতুল্য। সুতরাং যদি তাহার সামনে কেহ কাহারও গীবত করে তাহা হইলে তাহার উচিত গীবতকারীকে গীবত বলা থেকে বাধা প্রদান করা। যদি গীবতকারী তাহার বাধা না শুনে তাহা হইলে সে যেন ঐ মজলিশ থেকে উঠিয়া অনত্র চলিয়া যায়। মাখলূকের কাছে লজ্জিত হওয়ার ভয় যেন তাহাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মজলিশ ত্যাগে বিরত না রাখে। কেননা আল্লাহ্ সম্বন্ধে লজ্জা করা উচিত। মানুষের সন্তুষ্টি তলব করা অপেক্ষা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের সন্তুষ্টি তলব করা অধিক উপযোগী। আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেন, و الله و رسوله احق ان يرضوه আল্লাহ ও তদীয় রাসূল

অধিক হকদার যে, মানুষ তাহাদেরকে রাজী করে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গীবত করা ইসলাম ধর্মে থাকা অবস্থায় ছত্রিশবার যিনা করা অপেক্ষাও মারাত্মক।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, উপায় অবলম্বনকারী দরিদ্র ব্যক্তির চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি কোন দরিদ্রের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহা হইলে সে যদি সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে বড় জ্ঞানীও হয় তবুও তাহাকে সম্মান ও ইয্যত কর না। এক, জালেমদের থেকে দূরে থাকা। দুই, আখেরাতওয়ালাদের প্রাধান্য দেওয়া। তিন, অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। চার, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা।

বাস্তাবিকই হযরত শায়খ খুব সত্য বলিয়াছেন। কেননা জালেমদের থেকে দূরে থাকিলে দ্বীন নিরাপদ থাকে। কারণ জালিমদের সংশ্রব ঈমানী নূরকে অন্ধকারে পরিণত করিয়া ফেলে। তাহাদের থেকে দূরে থাকা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রেহাই পাওয়া। আল্লাহ পাক বলেন-

فَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ *

জালেমদের প্রতি ঝুঁকিও না। তাহা হইলে তোমাদিগকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করিবে।

হযরত শায়খ বলিয়াছেন, আখেরাতওয়ালাদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা। ইহার অর্থঃ ওলী বুযুর্গদের কাছে বেশী বেশী আসা যাওয়া করিবে। তাহাদের থেকে বরকত ও ফয়েজ হাসিল করিবে। যাহাতে তাহার অবলম্বিত উপায় অনিষ্টকারী বিষয়সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে আর এই সকল মহামনিষীদের বরকত ও প্রভাব তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। অনেক সময় তাহাদের দ্বারা তাহার অবলম্বিত উপায়েও সাহায্য সহযোগীতা পৌঁছে। তাহাদের প্রতি আস্থা ও ভালবাসা তাহাকে গোনাহ হইতে দূরে রাখে।

হযরত শায়খ অভাবী ও ক্ষুধার্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কথা বলিয়াছেন। কারণ, বান্দার কাছে আল্লাহ পাকের যে নিয়ামত রহিয়াছে উহার শুকরিয়া আদায় করা বান্দার জন্য ওয়াজিব। সুতরাং আল্লাহ পাক যখন তোমার প্রতি উপায় অবলম্বনের দ্বার প্রশস্ত করিয়াছেন তখন তুমি তাহাদের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখ যাহাদের জন্য এই দ্বার বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আল্লাহ পাক অভাবীদের দ্বারা বিত্তশালীদের আর বিত্তশালীদের দ্বারা অভাবীদের পরীক্ষা করেন। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا *

আমি তোমাদের কতককে অপর কতকের জন্য পরীক্ষা বানাইয়াছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করিবে? এবং আপনার প্রতিপালক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

অভাবী ও দরিদ্রের অস্তিত্ব আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে বিত্তশালীদের জন্য বড় নিয়ামত। কেননা, বিত্তশালীদের জন্য অভাবী ও দরিদ্ররা এমন কতক লোক যাহারা বিত্তশালীদের বোঝা বহন করিয়া আখেরাত পর্যন্ত লইয়া যায়। অর্থাৎ বিত্তশালীরা যদি নিজেদের মাল আসবাব পরকালে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদের এই ইচ্ছা অভাবী ও দরিদ্রদের দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে।

আল্লাহ পাক যদি গরীব লোক সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে বিত্তশালীদের দান সদকা কিভাবে কবুল হইত? আর তাহাদের দান গ্রহণকারী লোক কোথায় পাইত? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ হইতে দান করে। আর আল্লাহ পাক হালাল সম্পদই কবুল করেন। যেন সে তাহার দানকৃত সম্পদ আল্লাহ পাকের হাতে রাখিয়াছে। আর আল্লাহ পাক তাহা পালন করিতে থাকেন যেমন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বাছুর বা উট শাবক পালন করিয়া থাকে। এমনকি ইহার এক এক লোকমা ওহুদ পাহাড়ের সমান হইয়া যায়। * অর্থাৎ ইহার সওয়াব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইজন্যই দাতার দান গ্রহণকারী কোন লোক না পাওয়া কেয়ামতের একটি অন্যতম নিদর্শন।

হযরত শায়খ (রহঃ) তাহাদিগকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করিবার জন্য বলিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, উপায় অবলম্বনকারী দরিদ্র যখন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে লাগিয়া থাকার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তখন তাহার জন্য কমপক্ষে এতটুকু তো অপরিহার্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করার ক্ষেত্রে যেন কোনরূপ অলসতা তাহার থেকে প্রকাশ না পায়। কেননা, তাহার এই বাধ্যবাধকতা তাহার জন্য নতুন নূর এবং অন্তদৃষ্টির কারণ হইবে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, একাকী নামায পড়া অপেক্ষা জামাতের সাথে নামায পড়া পঁচিশ গুণ অধিক সওয়াব রাখে। অন্য এক হাদীছে সাতাশ গুণ অধিক সওয়াবের কথা আসিয়াছে। যদি

---

* من تضدق بصدقة من كسب طيب و لا يقبل الله تعالى الا طيبا كان كانما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربى احدكم فلوة او فيلة حتى ان اللقمة لتعود مثل جبل احد

দোকান বা ঘরে নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করা হইত তাহা হইলে সমস্ত মসজিদ খালি পড়িয়া থাকিত। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন-

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ * يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ

* رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله *

"আল্লাহর নূর এই সকল ঘরের মধ্যে আছে আল্লাহ পাক যেগুলিকে উচ্চ করার হুকুম দিয়াছেন। এইসব ঘরে তাঁহার নামের যিকির করা হয় এবং সকাল সন্ধ্যা এমন সবলোক এই সব ঘরে তাঁহার তাসবীহ পাঠ করে যাহাদিগকে কোন ব্যবসা বানিজ্য এবং কোন বেচাকেনা আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, জামাতের সাথে নামায পড়ার ফলে নামাযীর অন্তরে একতা সৃষ্টি হয়। একে অপরকে সাহায্য সহযোগীতা করার সুযোগ হয়। তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদিগকে একস্থানে সমবেত দেখা সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জামাতের উপর আল্লাহর হাত। এই ক্ষেত্রে মূলকথা এই যে, যখন লোকজন সমবেত হয় তখন তাহাদের অন্তরের বরকত উপস্থিত লোকদের সামনে প্রকাশিত হয়। তাহাদের নূর আশে পাশের লোকের কাছে প্রসারিত হয়। লোকজন জামাতভুক্ত হইয়া একত্রিত হওয়ার উদাহরণ সৈন্যদলের ন্যায়। সেনাদলের একত্রিত ও সমবেত হওয়া তাহাদের জয়ী হওয়ার কারণ হয়। নিম্নোক্ত আয়াতও এই অর্থই বহন করে-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ *

"আল্লাহ পাক এমন সব লোকদিগকে ভালবাসেন যাহারা আল্লাহর রাস্তায় সারিবদ্ধ হইয়া জিহাদ করে যেন তাহারা একটি সুদৃঢ় অট্টালিকা।"

সংযোজন ঃ হে ঈমানদার! তুমি কোন কাজে ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অবৈধ জিনিসমূহের প্রতি দৃষ্টি ফেলিও না বরং সর্বদা দৃষ্টি নীচু করিয়া রাখিও। ইহা তোমার অপরিহার্য কর্তব্য। আর আল্লাহ পাকের ইরশাদ স্মরণ রাখিও-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ * ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ *

"হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নীচু করিয়া চলে, এবং নিজেদের লজ্জাস্থান

হেফাজত করে; ইহা তাহাদের জন্য বড় পবিত্র কথা।"

দৃষ্টি আল্লাহ পাকের বড় নিয়ামত। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতের না শুকরিয়া করা উচিত নয়। অধিকন্তু ইহা একটি আমানতও বটে। সুতরাং ইহার খেয়ানত করা উচিত নয়। আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদ স্মরণ রাখা উচিত।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ *

"আল্লাহ পাক চোখের খেয়ানতের কথা জানেন এবং বক্ষদেশে যাহা গোপনীয় রহিয়াছে তাহাও জানেন।"

আল্লাহ পাক আরও বলিয়াছেন-

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى *

"তবে কি তাহার খবর নাই যে, আল্লাহ পাক দেখেন?"

যখন কোন অবৈধ জিনিসের দিকে দেখার ইচ্ছা কর তখন অন্তরে এই কথা জাগ্রত কর যে, আল্লাহ পাক তোমাকে দেখিতেছেন। যখন কাহারও দৃষ্টি কোন অবৈধ জিনিসের প্রতি পড়ে আর যদি সে স্বীয় দৃষ্টি নীচু করিয়া ফেলে তখন আল্লাহ পাক তাহার অর্ন্তদৃষ্টি প্রশস্ত করিয়া দেন। ইহা তাহার এই আমলের একটি বড় বিনিময়। সুতরাং যে ব্যক্তি দৃশ্য জগতে তাহার দৃষ্টি সংকীর্ণ করিবে আল্লাহ পাক অদৃশ্য জগতে তাহার দৃষ্টি প্রশস্ত করিয়া দেন। কোন এক মনীষীর বাণী, কোন ব্যক্তি যখন কোন হারাম জিনিস দেখিয়া দৃষ্টি নীচু করিয়া ফেলে আল্লাহ পাক তাহার অন্তরে এক নূর সৃষ্টি করেন। এই ব্যক্তি এই নূরের স্বাদ পাইতে থাকে।

মূল উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের অভিমত এই যে, যেহেতু আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা রহিয়াছে সুতরাং বান্দার নিজের জন্য নিজের পক্ষ হইতে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আল্লাহ পাকের প্রতিপালনের গুণের সাথে দ্বন্দ্ব করার নামান্তর। তাহাদের এই অভিমতের বিশ্লেষণ এইভাবে হইতে পারে যে, যদি কোন প্রকার বিপদাপদ তোমার প্রতি আপতিত হয় আর তুমি তাহা অপসারিত করার চেষ্টা কর অথবা তোমার থেকে রিযক অপসারিত করিয়া লওয়া হয় আর তুমি তাহা পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা কর অথবা যদি তুমি কোন বিষয় সম্পর্কে জান যে, আল্লাহ পাক ইহার যিম্মাদার, তোমার জন্য ইহার ব্যবস্থাপক তিনিই: এমতাবস্থায়ও তুমি ইহা সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করিতে থাক তাহা

হইলে তোমার এই ধরণের কার্য আল্লাহ পাকের প্রতিপালন গুণের সাথে দ্বন্দ্ব করা হইতেছে বলিয়া বুঝা যাইবে এবং তোমার এই পদক্ষেপ সত্যিকারের বান্দা হওয়ার পরিধি বহির্ভূত কাজ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ কর। আল্লাহ পাক বলেন-

اَ وَ لَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ *

"তবে কি মানুষ ইহা দেখে নাই যে, আমি এক ফোটা বীর্য হইতে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি? অতঃপর এখন সে অকস্মাৎ প্রকাশ্য ঝগড়াকারী হইয়া পড়িয়াছে।"

অত্র আয়াতে মানুষকে ভৎর্সনা করা হইয়াছে। কেননা সে স্বীয় সৃষ্টি মূল সম্পর্কে অসতর্ক হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তার সাথে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছে। স্বীয় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ হইয়া সৃষ্টিকর্তার সাথে দ্বন্দ্ব ও মোকাবিলা শুরু করিয়াছে। যে এক ফোটা বীর্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার সৃষ্টিকর্তার সাথে দ্বন্দ্ব করা, তাঁহার ভাঙ্গাগড়ার বিরোধিতা করা কিভাবে উচিত হইতে পারে? সুতরাং আল্লাহ পাক তোমার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাক। নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাক। আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবান হউক। অদৃশ্য জগত অবলোকন করার ক্ষেত্রে অন্তরের সামনে বড় পর্দা হইল নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার পিছনে যে কারণ রহিয়াছে তাহা হইল নিজের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ স্বপ্রিয়তা। যদি তুমি নিজের সম্পর্কে ফানা হইয়া (অর্থাৎ স্বীয় অস্তিত্ব মিটাইয়া দিয়া) বাকা বিল্লাহের (অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব দেখার) পর্যায় অর্জন কর তাহা হইলে তো তোমার কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনই পড়িবে না। এমন বান্দা কত নিকৃষ্ট যে আল্লাহর কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ আর আল্লাহর সাহায্য অর্জন সম্পর্কে অসতর্ক। তবে কি তুমি আল্লাহ পাকের এই বাণী শ্রবণ কর নাই যে আল্লাহ পাক বলেন, قل كفى بالله হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলুন, আল্লাহই যথেষ্ট। সুতরাং আল্লাহর ব্যবস্থাপনা বিরাজমান থাকার পরও যে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে কিভাবে আল্লাহকে যথেষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিল? যদি সে আল্লাহকে নিজের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিত তাহা হইলে তাহার এই বিশ্বাস তাহাকে নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে বিরত রাখিত।

সতর্কতা ও ঘোষণা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর মারেফাত তলবকারীরাই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফাঁদে পতিত হয়। আর এই রাস্তায় তাহাদের একীন সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল হওয়ার পূর্বে তাহারা ইহার শিকার হইয়া থাকে। কেননা অসতর্ক এবং বদ চরিত্র লোকেরা তো কবীরা গুনাহ, শরীয়ত পরিপন্থী কার্যে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষেত্রে শয়তানের পরামর্শ মানিয়াই থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজনটাই কি? তাহাদিগকে এই ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার সাথে সাথে তাহারা ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের জন্য ইহা খুব বড় একটা ফাঁদ হয় নাই। বরং আল্লাহর মারেফাত তলবকারীদের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফাঁদ বিছাইয়া দেওয়া হয়। কেননা শয়তান ইহা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তায় তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা এবং স্বীয় সমস্যা সমাধানের প্রতি মনোনিবেশ করা ধারাবাহিক ও নিয়মিত ইবাদতকারীকে তাহার নিয়ম মাফিক ইবাদত ও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরাইয়া দেয়। শয়তান কোন কোন সময় নিয়মিত ইবাদতকারীকে দুর্বল পাইয়া তাহার অন্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ ঢালিয়া দেয় আর এই পরামর্শে পথভ্রষ্টতার বীজ লুকায়িত থাকে যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। শয়তানের এই সর্ব ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দানের পিছনে উদ্দেশ্য হইল ইবাদতকারীর ইবাদতের নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ সময়ে তাহাকে ইবাদত করিতে না দেওয়া। কেননা শয়তান বড় হিংসুক। হিংসুক চরমপর্যায়ের হিংসা শুরু করে যখন ইবাদতকারীর ইবাদতের সময় নির্ভেজাল থাকে। তাহার আভ্যন্তরিন অবস্থা ভাল থাকে। অর্থাৎ জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। আর শয়তান এমতাবস্থায় ব্যবস্থা অবলম্বনের বিভিন্ন পরামর্শের মাধ্যমে তাহার অন্তর ভেজালযুক্ত করিয়া দেয়। তাহার ইবাদতের সময়ের স্বচ্ছতা নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং সে ইবাদতে একাগ্রচিত্ততা হারাইয়া ফেলে। অধিকন্তু ব্যবস্থা অবলম্বনের ধোকা খুব সূক্ষ্ম হয়। ব্যবস্থা অবলম্বনের কুমন্ত্রনা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তাহার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া আসে। ইহার কুমন্ত্রনা অনুধাবন করা মুশকিল। সুতরাং কোন ব্যক্তির যদি পরিবেশ এমন হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আরজ বা আগামীকল্যের উপজীবিকার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হয়। আর সে ব্যবস্থা অবলম্বনের হাত থেকে মুক্তি পাইতে চায় তাহা হইলে এই অবস্থায় তাহার উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। উপায়টি এই যে সে তখন বদ্ধমূল একীন করিবে যে, আল্লাহ

পাক তাহার রিযিকের যিম্মাদার। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها "যমীনের উপর চলে এমন কোন জন্তু নাই আল্লাহ পাক যাহার রিযকের যিম্মাদার নহেন।" রিযিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে পৃথকভাবে রিযিকের অধ্যায়ে করা হইবে। ইনশাআল্লাহ।

যদি কাহারও এমন কোন শত্রু থাকে যাহার মোকাবিলা করার শক্তি তাহার নাই। আর এই শত্রুর জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় ব্যবস্থা অবলম্বনের হাত থেকে বাঁচিয়া থাকার উপায় সে বদ্ধমূল একীন করিবে যে, সে যাহাকে ভয় করিতেছে তাহার সমস্ত অবস্থা আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রনে রহিয়াছে। তাহার কোন কিছু করার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ পাক তাহাকে যাহা করার সুযোগ প্রদান করেন সে তাহাই করিতে পারিবে। ইহার অতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবে না। আর সাথে সাথে আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি লক্ষ্য করা চাই। আল্লাহ পাক বলেন-

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ *

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট।"

অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন-

اَ لَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ * وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ *

"তবে কি আল্লাহ বান্দার জন্য যথেষ্ট নহে? তাহারা আপনাকে খোদা ব্যতীত অন্যদের ভয় প্রদর্শন করিতেছে।"

আল্লাহ পাক আরও বলিয়াছেন-

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا * وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ *

"ঈমানদারেরা এমন যে যখন তাহাদিগকে অন্যান্য লোকেরা বলিল যে, মক্কাবাসীরা তোমাদের সাথে লড়িবার জন্য প্রচুর সৈন্য ও হাতিয়ার সংগহ করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভয় কর। তখন তাহাদের ঈমান আরও বাড়িয়া গেল এবং তাহারা জবাব দিল যে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। তিনি আমাদের উত্তম অভিভাবক। অতঃপর তাহারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ঘরে ফিরিয়া আসিল। অথচ তাহাদিগকে কোন অনিষ্টতা স্পর্শও করে নাই। তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছিল। আল্লাহ পাক মহাঅনুগ্রহকারী।"

অনুরূপভাবে সে যেন স্বীয় অন্তর ও কর্ণ উভয় আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদের দিকে ঝুঁকাইয়া রাখে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي *

"হযরত মুসা (আঃ)-এর মাতার প্রতি নির্দেশ করা হইল যে, যখন তুমি মুসা সম্পর্কে ভীত হইয়াছ; তখন তুমি তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর; তাহার সম্পর্কে ভয় করিবে না আবার ব্যতিব্যস্তও হইবে না।" অতএব আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করাই অধিক উপযুক্ত। আর তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি আশ্রয় দিয়া থাকেন। আল্লাহ পাক বলেন-

و هو يجير و لا يجار عليه *

"আল্লাহ পাক আশ্রয় প্রদান করেন। তাঁহার কাছে অপরাধীকে অন্য কেহই আশ্রয় প্রদান করে না।"

আল্লাহ পাকের কাছেই হেফাজত প্রার্থনা করা উচিত। তাঁহার কাছে হেফাজত প্রার্থনা করিলে তিনি হেফাজত করেন। তিনি নিজেই বলেন-

وَ اللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ *

"আল্লাহ পাক উত্তম হেফাজতকারী। তিনি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী।"

আর যদি তোমার নিম্নোক্ত কারণে ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তাভাবনা করিতে হয় যে, তুমি কাহারও কাছে ঋণী। ঋণ আদায় করিবার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে যে সময় নির্ধারিত হইয়াছিল তাহা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার ঋণ আদায় করার মত কোন পয়সা নাই। মহাজনও ধৈর্যধারণ করিতেছে না। এমতাবস্থায় তুমি বদ্ধমূল বিশ্বাস করিবে যে, আল্লাহ পাক তো স্বীয় অনুগ্রহে তোমার প্রয়োজনের সময় তোমাকে করজ দিতে পারে এমন ব্যক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তো এখনও মওজুদ আছেন। সুতরাং তিনি স্বীয় মেহেরবাণীতে এখন তোমার করজ পরিশোধের ব্যবস্থাও করিয়া দিতে পারেন। কুরআনে করীমে রহিয়াছে-

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ *

"সৎকর্মের বিনিময় সৎকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়"

এই আয়াতের সারকথা হইল, আল্লাহ পাক তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাঁহার প্রতি সুধারনা পোষন কর। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তগত জিনিসের ব্যাপারে স্থিরচিত্ত থাকে আর আল্লাহ পাকের হস্তগত

জিনিসের ব্যাপারে স্বস্থিরতা বোধ করে না তাহার জন্য বড়ই পরিতাপ।

আর যদি তোমার এই কারণে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় যে, তুমি স্বীয় সন্তানাদি ঘরে রাখিয়া আসিয়াছ। কিন্তু তাহাদের ভরন-পোষন চলিতে পারে এই পরিমাণ সম্পদ তোমার হাতে নাই। এই সময় তুমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ কর যে, তোমার মৃত্যুর পরও আল্লাহ পাক তাহাদের ভরনপোষনের ব্যবস্থা করিবেন। সুতরাং তিনি তোমার জীবদ্দশায় এবং তোমার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় তাহাদের ভরন-পোষনের ব্যবস্থা করিবেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

اللهم انت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الاهل *

"হে আল্লাহ! আপনি সফরে আমাদের সাথী এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পরিবার পরিজনের যিম্মাদার।" সুতরাং তোমার উপস্থিতিতে তুমি যে খোদার প্রতি ভরসা রাখিতেছ তোমার অনুপস্থিতেও তাঁহার প্রতি ভরসা রাখ। এক বুযুর্গের কথা শুন। তিনি বলেন, আমি যে খোদার মুখাপেক্ষী যাহার কাছে আমি ধরনা দেই। তাহাকেই আমার পরিবার পরিজনের হেফাজতকারী রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি তাহাদের সর্বাবস্থার খবর রাখেন। তাহাদের অবস্থা এক পলকের জন্যও তাহার কাছে গোপনীয় নয়। তাঁহার অনুগ্রহ আমার অনুগ্রহ অপেক্ষা প্রশস্ত। হে শ্রোতা! আল্লাহ পাক তোমার অপেক্ষা অনেক বেশী অনুগ্রহশীল। যাহারা অন্যের (আল্লাহর) দায়িত্বে রহিয়াছে তুমি তাহাদের সম্পর্কে চিন্তা করিও না।

যদি তুমি অসুস্থ হও। আর অসুস্থতা সম্পর্কে তোমার ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অধিকন্তু তুমি ধারণা করিতেছ যে, এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমার এই অসুস্থতা বিদ্যমান থাকিবে। তাই এই সম্পর্কে তোমার ভয় হইতেছে। এমতাবস্থায় তুমি বিশ্বাস কর যে, প্রত্যেক বিপদের স্থায়ীত্বকাল নির্ধারিত। যেমন কোন প্রাণীর হায়াতও নির্ধারিত। নির্ধারিত সময়ের পর ইহা মরিয়া যায়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক বিপদ নির্ধারিত সময়ের পর কাটিয়া যায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার নির্ধারিত সময় পুরা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা শেষ হইবে না। আল্লাহ পাক বলেন-

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ *

"যখন তাহাদের হায়াত পুরা হইয়া যায় তখন তাহারা এক নিমিষের জন্য পিছনে যায় না আবার সামনেও বাড়ে না।"

এই সম্পর্কে একটি ঘটনা

এক শায়খের একটি পুত্র সন্তান ছিল। পিতা মৃত্যুবরণ করিল। পুত্র জীবিত। পিতা জীবিত থাকিতে ঘরে অর্থ কড়ির কোন অভাব ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর ভাটা পড়িল। পিতার অনেক বন্ধু বান্ধব অর্থাৎ মুরীদ ছিল। তাহারা ছিল ইরাকের অধিবাসী। পুত্র ভাবিল যে, এই অবস্থায় তাহার পিতার বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। তবে কাহার কাছে যাইবে? অবশেষে একজনের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিল। সকলের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বাধিক প্রতাপশালী। অতঃপর সে ঐ ব্যক্তির কাছে গমন করিল। এই ব্যক্তি স্বীয় পীরের পুত্রকে দেখিয়া খুব সম্মান প্রদর্শন করিল। অতঃপর বলিল, হে আমার সম্মানিত! আমার সম্মানিতের পুত্র! কিজন্য আপনার আগমন? পীরের পুত্র বলিল, আমি পার্থিব সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া চলি। এখন আপনার কাছে আসিয়াছি এই জন্য যে, আপনি দেশের বাদশাহের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করিবেন। যাহাতে তিনি আমার একটি ব্যবস্থা করেন। আর ইহার দ্বারা আমার রোজগারের ব্যবস্থা হইয়া যায়। পীরের পুত্রের আবেদন শুনিয়া সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত শির নত করিয়া বসিয়া রহিল। অতঃপর শিরোত্তলন করিয়া বলিল আমার জন্য ইহা সম্ভব নয়। আমি সন্ধ্যাকে সকাল করিতে পারিব না। আমি কোথায়। আর আপনি কোথায়? আপনি তো ইরাকের বিচারকের পদ লাভ করিবেন। এই বুযুর্গ মোরাকাবা করিয়া দেখিয়াছে যে কিছুকাল পর এই বালক ইরাকের বিচারকের পদ লাভ করিবে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাহাকে বিচারক নিয়োগ করিবার যে সময় নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা এখনও আসে নাই। এই জন্য সে বলিয়াছে যে, সে সন্ধ্যাকে সকালে পরিণত করিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে জিনিসটি তাহার হস্তগত হওয়ার জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে উক্ত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাহা তাহার হাতে তুলিয়া দেওয়া কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?

তাহার কথা শুনিয়া পীর পুত্র অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল। সে এই বুযুর্গের কথা বুঝিল না। ঘটনাচক্রে ইরাকের বাদশাহের পুত্রকে পড়া-লেখা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিল। বাদশাহ একজন উপযুক্ত শিক্ষক খোঁজ করিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় কোন এক ব্যক্তি শায়খের পুত্রের সন্ধান বলিয়া দিল। বাদশাহ তাহাকে স্বীয় পুত্রের শিক্ষক নিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পর সে বাদশাহের অনুচর নিয়োজিত হইল। এইভাবে তাহার পদোন্নতি হইতেছে। চল্লিশ বৎসর পর বাদশাহ ইন্তিকাল করিলেন। বাদশাহের পুত্র বাদশাহ হইল। সে স্বীয় ওস্তাদকে বিচারক নিয়োগ করিল।

হে শ্রোতা! তোমার এক স্ত্রী ছিল বা এক বাঁদী ছিল। সে সর্বদিক দিয়া তোমার স্বভাব চরিত্রের মোয়াফেক ছিল। তোমার সমস্ত প্রয়োজন পুরা করিত। তোমার ঘরের কাজ কারবার সম্পাদন করিত। কিন্তু এখন সে মরিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে তোমার চিন্তা-ভাবনা করিতে হইতেছে। এই সম্পর্কে তোমার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং এই অবস্থায় তোমার বদ্ধমূল একীন করা একান্ত প্রয়োজন যে আল্লাহ পাক তোমাকে ইহা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়া এখনও শেষ হয় নাই। বা ইহাতে কোনরূপ ঘাটতিও পড়ে নাই। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে ইহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী ও জ্ঞানবতী অন্য একটি স্ত্রী বা বাঁদীর ব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ শক্তি রাখেন। সুতরাং জাহেল হইও না।

যে সব কারণে ব্যবস্থা অবলম্বনের ফিকিরে পড়িতে হয় তাহা অগনিত। ইহাদের সবগুলির বিবরণ প্রদান করা মুশকিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক তোমাকে জ্ঞান দান করিলে তুমি নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবে যে, কোন বিষয়ের সমাধান কিভাবে করিতে হয়।

সতর্কতা ঃ বান্দার ব্যবস্থা অবলম্বনের ফিকির নফসের মধ্যে পয়দা হয়। কলব যদি নফসের সংশ্রব ও আশংকা হইতে নিরাপদ থাকে তাহা হইলে ইহাতে ব্যবস্থা অবলম্বনের ফিকিরও আসিতে পারে না।

আমি শায়খ আবুল আব্বাস মুরসীর (রহঃ) কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেন, আল্লাহ পাক ভূমণ্ডলকে পানির উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। তখন ভূমণ্ডল পানির উপর এইদিক ওইদিক হেলিতেছিল। আল্লাহ পাক অতঃপর ভূমির উপর পাহাড় সৃষ্টি করিলেন। আর পাহাড়ের মাধ্যমে ভূমণ্ডলের অটল ও অনড় করিলেন। আল্লাহ পাক স্বীয় কালামে পাকে নিজেই ইরশাদ করেন-

والجبال ارساها *

"এবং পর্বতমালাকে সংস্থাপন করিয়াছেন।"

অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক নফস (প্রাণ) সৃষ্টি করার পর ইহা নড়াচড়া করিতেছিল। তখন তিনি বিবেকের (আকলের) মাধ্যমে ইহাকে অনড় ও স্থির করিলেন। এই পর্যন্ত হযরত শায়খ আবুল আব্বাসের (রাঃ)-এর বক্তব্য। সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ বিবেক ও প্রশস্ত নূর রহিয়াছে। তাহার প্রতি পরোয়ারদিগারের পক্ষ হইতে শান্তি অবতীর্ণ হয়। আর তাহার নফসের অস্থিরতা দূরীভূত হইয়া যায়। আসবাব প্রদানকারী মহান আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরতা পয়দা হয়। তাহার নফস স্থির হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লাহর আহকামের সামনে সে নতশির হইয়া যায়। তিনি তাহার জন্য যে ফয়সালা করেন তাহা নির্দ্বিধায়

মানিয়া লয়। আল্লাহর সাহায্য ও অদৃশ্যের নূর হইতে তাহার সহায়তা হইতে থাকে। সে তাকদীরের মোকাবিলা করা হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। স্বীয় প্রভুর হুকুম মান্য করে। সে একীন করে যে আল্লাহ্ পাক সবকিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তবে কি তোমার প্রভু তোমার জন্য যথেষ্ট নহেন? সে ইহার বিশ্বাসী হইয়া পড়ে। এইভাবে সে নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত সম্বোধিত ব্যক্তির যোগ্য হইয়া পড়ে।

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَ ادْخُلِىْ جَنَّتِىْ *

"হে তুষ্ট নফস! স্বীয় প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট আর তিনিও তোমার দিকে সন্তুষ্ট। সুতরাং আমার বান্দাদের অন্তর্গত হইয়া যাও এবং আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।"

এই আয়াতে নফসের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রথম গুণ ঃ নফস তিন প্রকার। এক- আম্মারা, দুই- লাওওয়ামা, তিন- মুতমাইন্না। আল্লাহ পাক স্বীয় গ্রন্থে একমাত্র নফসে মুতমাইন্না ব্যতীত অন্য কোন নফসকে সম্বোধন করেন নাই। নফসে আম্মারা সম্পর্কে বলিয়াছেন-

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ *

"নফস খারাপ কার্যের বেশী বেশী নির্দেশ দেয়।"

নফসে লাওওয়ামা সম্পর্কে বলিয়াছেন-

لَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ *

"আমি নফসে লাওওয়ামার শপথ করিয়া বলিতেছি।"

আর নফসে মুতমাইন্নাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ *

"হে নফসে মুতমাইন্নাহ।"

দ্বিতীয় গুণ ঃ নফসে মুতমাইন্নাহর আলোচনা করিয়াছেন ইহার উপাধি উল্লেখ করিয়া। অবশ্য আরবী ভাষাভাষীদের পরিভাষায় উপাধি ব্যবহার করা হয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য। তাহাদের কাছে উপাধি গৌরবের বিষয়।

তৃতীয় গুণ ঃ আল্লাহ্ পাক এই নফসের প্রশংসা করিয়াছেন যে, এই নফস

তুষ্টতার গুণে গুণান্বিত। ইহার প্রশংসাতে এই গুণের উল্লেখ করাতে বুঝা গেল যে এই নফস অনুগত এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হইয়া থাকে।

চতুর্থ গুণ ঃ আল্লাহ পাক ইহার গুণ উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা মুতমাইন্নাহ। মুতমাইন নীচু ভূমিকে বলা হয়। যাহা তুষ্টতা ও নম্রতার সাথে নীচ হইয়া থাকে। সুতরাং মুতমাইন নফস বলা হয় এমন নফসকে যাহা নিজে নিজে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ পাক এই নফসের প্রশংসা করিয়াছেন যাহাতে ইহার উচ্চ মর্যাদার কথা বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে; আল্লাহ পাক তাহার মর্যাদা উচ্চ করিয়া দেন।

পঞ্চম গুন ঃ বলা হইয়াছে,

اِرْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

"হে নফসে মুতমাইন্নাহ! তুমি স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।"

অত্র আয়াতে ইংগিত করা হইয়াছে যে নফসে আম্মারা আর নফসে লাওওয়ামা সম্মানের সাথে প্রত্যার্বতন করার অনুমতি নাই। ইহা একমাত্র নফসে মুতমাইন্নার নসীব হইয়াছে। কেননা নফসে মুতমাইন্নাহ্ তো তুষ্ট থাকার গুণে গুণান্বিত। ইহার প্রতি নির্দেশ হইয়াছে যে, খুশী ও পছন্দের সাথে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। কেননা আমার দরবারে তোমার আগমন এবং আমার বেহেশতে তোমার সর্বদা অবস্থান আমি মঞ্জুর করিয়াছি। ইহাতে তুষ্ট থাকার গুণ অর্জন করার প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন না করে আর ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তুষ্ট থাকার গুণ অর্জন করার পর্যায়ে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে না।

ষষ্ঠ গুণ ঃ আয়াতে ارجعى الى ربك। বলা হইয়াছে- ارجعى الى الله। বলা হয় নাই। অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর বলা হইয়াছে। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর- বলা হয় নাই। আল্লাহ বলার স্থানে তোমার প্রতিপালক বলা হইয়াছে। অথচ আল্লাহ এবং তোমার প্রতিপালক অভিন্ন। আল্লাহ না বলিয়া তোমার প্রতিপালক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আল্লাহর দিকে নফসে মুতমাইন্নাহের প্রত্যাবর্তন তাঁহার প্রতিপালন গুণের অনুগ্রহ

হিসাবে। তাঁহার উপাস্য হওয়ার গুণের প্রভাবে নয়। অধিকন্তু এইরূপ বলার পিছনে উদ্দেশ্য হইল ইহাকে নিজের অন্তরঙ্গ করা এবং স্বীয় অনুগ্রহ মেহেরবানী প্রকাশ করা।

সপ্তম গুণ ঃ আয়াতে راضية বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর আহকামের প্রতি এবং আখেরাতেও তাঁহার প্রতি অর্থাৎ তাঁহার বদান্যতা ও বখশিশের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। ইহাতে বান্দাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, তুষ্ট ও সন্তুষ্ট থাকা ব্যতীত আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন অর্জিত হইবে না। ইহাতে এই ইঙ্গিতও করা হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আখেরাতে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হইতে পারিবে না। লক্ষ্য কর راضية প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর مرضية পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। راضية অর্থ- নফস আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। আর مرضية অর্থ- আল্লাহ নফসের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

এই ক্ষেত্রে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বান্দা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার ফল হইল আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু অন্য এক আয়াতে ইহার বিপরীত বুঝা যায়। যেমন কুরআনে অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে,

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ *

"আল্লাহ পাক তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারা আল্লাহর পাকের প্রতি সন্তুষ্ট।"

অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ফল হইল বান্দা আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া।

এই আপত্তির সারকথা এই যে, এক আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে সন্তুষ্টি বান্দার পক্ষ থেকে আগে হয়। অন্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে,, সন্তুষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগে হয়। এই আপত্তির নিরসন খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া অপরিহার্য। প্রত্যেক আয়াত স্ব স্ব অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং رضى الله عنهم و رضوا عنه আয়াতের সারকথা এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রথমে অস্তিত্ব লাভ করে। অতঃপর বান্দার সন্তুষ্টি। আর বাস্তবও ইহার অনুকূলে। কেননা আল্লাহ পাক প্রথমে সন্তুষ্ট না হইলে বান্দা কি করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে? কেননা বান্দার পূর্ণতা হাকিকী ও মৌলিক নহে। আল্লাহ পাকের পূর্ণতা হাকিকী এবং

মৌলিক আর মৌলিক জিনিসের অস্তিত্ব আগে হয়। সুতরাং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আগে অস্তিত্বশীল হওয়া অপরিহার্য। কবি বলেন-

اگر ازجنتبِ معشوق نباید گشتی + طبب عاشق بیچاره بجائے نرسید

যদি প্রেমাস্পদের পক্ষ হইতে কোন ঘুরাফিরা (উদ্যোগ) না হয়। তাহা হইলে অসহায় প্রেমিকের তলব কোন স্থানে পৌঁছিবে না।

আর দ্বিতীয় আয়াতের সারকথা, এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ পাকের প্রতি দুনিয়াতে সন্তুষ্ট থাকিবে তখন পরকালে আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইহাতো পরিষ্কার কথা।

অষ্টম গুণ ঃ আল্লাহ পাক নফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে مرضية শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই নফসের যতগুলি প্রশংসা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা সর্বোচ্চ প্রশংসা।

আল্লাহ পাক বলেন-

رضوان من الله اكبر *

"আল্লাহ পাকের সামান্যতম সন্তুষ্টিও বড়।"

বেহেশতীদের নিয়ামতসমূহের কথা বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক উপরোক্ত কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। সারকথা বেহেশতীদের নিয়ামতের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বোচ্চ নিয়ামত।

নবম গুণ ঃ আল্লাহ পাক নফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে বলিয়াছেন-

فادخلی فی عبادی *

"হে নফসে মুতমাইন্নাহ। তুমি আমার খাছ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাও।"

আল্লাহর পাকের এই বাণীতে ইহার জন্য খুব বড় সুসংবাদ এই যে, ইহাকে খাছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আহবান করা হইতেছে। যাহাদিগকে নফসে মুতমাইন্নাহর অন্তর্ভূক্ত হইতে আহবান করা হইতেছে তাহারা কেমন বান্দা হইবে? স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, তাহারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা। তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাকের সাহায্য সহযোগিতা হইয়াছে। তাহারা ঐ সকল বান্দা নহে যাহাদের প্রতি আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট। আল্লাহ পাক এই সকল বিশেষ বান্দাদের সম্পর্কে শয়তানকে বলিয়া দিয়াছেন-

ليس لك عليهم سلطان *

"তাহাদের উপর তোমার কোন শক্তি খাটিবে না।"

শয়তান বলিল,

الا عبادك منهم المخلصين *

"আপনার মুখলেছ বান্দাদের প্রতারিত করিব না।"

এখানে বিশেষ বান্দা বলিয়া ঐসকল বান্দাদিগকে বুঝানো হয় নাই যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে-

ان كل من فى السموات و الارض الا اتى الرحمن عبدا *

"আসমান ও যমীনে যাহারা আছে তাহাদের সকলেই পরম দয়ালুর (আল্লাহ পাকের) কাছে বান্দা হইয়া আসিতে হইবে।"

নফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক দুইটি ইরশাদ করিয়াছেন। এক, তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাও।

দুই, তুমি আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

উভয় ইরশাদের মধ্যে প্রথম ইরশাদ শুনিয়া নফসে মুতমাইন্নাহ অধিক খুশী হইয়াছে। কেননা প্রথম ইরশাদে বান্দাকে আহবান করা হইয়াছে জান্নাতের দিকে।

দশম গুণ ঃ আল্লাহ পাক و ادخلى جنتى বলিয়াছেন, ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নফসে মুতমাইন্নাহের যে সব আলোচনা হইয়াছে, এই সব গুণের কারণে ইহা আল্লাহর খাছ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার এবং জান্নাতে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। দুনিয়াতে জান্নাত হইল আল্লাহ পাকের আনুগত্য। আর আখেরাতের জান্নাত হইল বেহেশ্ত। যাহা সকলের কাছে পরিচিত।

কতগুলি উপকারী আলোচনা

উল্লিখিত আয়াত দুইটি গুণের ধারক। প্রত্যেকটি গুণের চাহিদা হইল ব্যবস্থা অবলম্বন পরিত্যাগ করা। এই দাবীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ আল্লাহ পাক নফসে মুতমাইন্নাহের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল তুষ্ট থাকা, অস্থিরচিত্ত না হওয়া। অপরটি রাজী থাকা।

নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা ব্যতীত উল্লেখিত গুণদ্বয়

অর্জিত হইতে পারে না। কেননা কোন ব্যক্তি তখনই তুষ্ট ও স্থিরচিত্ত হইবে যখন সে আল্লাহ পাকের সুব্যবস্থার প্রতি ভরসা করিয়া তাঁহার সামনে নতশির হইয়া যাইবে। তাঁহার নির্দেশ মান্য করিবে। তাঁহার অনুগত থাকিবে। আর তাঁহার প্রভুত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে। তাঁহাকে একমাত্র উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করিবে। তাঁহার সম্পর্কে সংশয়যুক্ত হইবে না। আল্লাহ পাক প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবেকের নূর দিয়াছেন। এই নূর তাহাকে দৃঢ়পদ রাখিবে। অধিকন্তু সে আল্লাহ পাকের আহকামের সামনে নিজকে দেহমনে অর্পন করিয়া রাখিবে। অবস্থার বিবর্তনে নিজকে তাঁহার সামনে সোপর্দ করিয়া রাখিবে।

উপকারী আলোচনা

বান্দার ব্যবস্থা অবলম্বন ও তাহার এখতিয়ার সৃষ্টি করার মধ্যে রহস্য ও ভেদ হইল আল্লাহ পাকের প্রতাপশালীতার গুণের প্রকাশ করা। সুতরাং আল্লাহ পাক যখন বান্দাদিগকে স্বীয় প্রতাপশালীতার গুণের সাথে পরিচিত করাইতে ইচ্ছা করিলেন তখন বান্দাদের এখতিয়ার ও ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের থেকে পর্দার অন্তরালে রহিলেন। তখন তাহাদের দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল। কেননা যদি বান্দারা আল্লাহ পাকের সম্মুখে থাকিত এবং আল্লাহ পাককে দেখিতে পাইত তাহা হইলে তাহাদের জন্য কখনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও এখতিয়ার খাটানো সম্ভব হইত না। যেমন উর্ধ্বজগৎবাসীর জন্য সম্ভব হয় না। সুতরাং বান্দা যখন স্বীয় এখতিয়ার খাটানো এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করা শুরু করিল তখন আল্লাহ পাক বান্দার এই কার্যের মোকাবিলায় স্বীয় প্রতাপ নিয়োজিত করিলেন এবং তাহাদের এখতিয়ার ও ব্যবস্থা অবলম্বনের স্তম্ভগুলি ভাঙ্গিয়া চুরচুর করিয়া দিলেন। এইভাবে তাঁহার ইচ্ছা প্রাধান্য লাভ করিল। সুতরাং তিনি যখন এইভাবে বান্দাদিগকে স্বীয় ইচ্ছার প্রাধান্যের পরিচয় করাইলেন তখন তাহাদের একীন হইল যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী। সুতরাং আল্লাহ পাক তোমার মধ্যে যে ইচ্ছার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এইজন্য করেন নাই যে, তোমার ইচ্ছা তোমার নিজস্ব কোন জিনিস। বরং এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার উপর বিজয়ী থাকে এবং তুমি বুঝিতে পার যে, তোমার ইচ্ছা কিছুই নয়। অনুরূপভাবে তোমার ব্যবস্থা অবলম্বনও এই জন্য সৃষ্টি করেন নাই যে, তুমি সর্বদা ব্যবস্থা অবলম্বনে নিমজ্জিত থাকিবে। বরং এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তুমিও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে আর তিনিও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা চলিবে আর তোমার ব্যবস্থা চলিবে না। এক

বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আপনি কিভাবে আল্লাহকে চিনিতে পারিয়াছেন? তিনি জবাব দিলেন, ইচ্ছা রহিত করার দ্বারা।

অনুচ্ছেদ ঃ ইতিপূর্বে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলাম যে, রিযিকের তদবীর সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় কায়েম করিব। কেননা, অধিকাংশ অন্তরে যে সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তাধারার উৎপত্তি হয়- ইহাদের অধিকাংশ হইয়া থাকে রিযিক সম্পর্কে। ইতিপূর্বে সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বনের আলোচনা হইয়াছে আর এখন রিযিক সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের আলোচনা হইতেছে।

রিযিকের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তাধারা হইতে অন্তর মুক্ত থাকা আল্লাহ পাকের একটি বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ পাক যাহাকে ইহার তাওফীক দিয়াছেন, একমাত্র সেই এই পর্যায় অর্জন করিতে পারে।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছে তাহার অন্তর স্বস্থিরতা লাভ করিয়াছে। সে স্বীয় তাওয়াক্কুল মজবুত করিয়া লইয়াছে।

এমনকি এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, রিযিকের ব্যাপারটি মজবুত করিয়া ধর আর অন্যান্য বিষয়গুলি যাইতে দাও। তাহার উক্তির সারকথা তিনি স্বীয় শিষ্যদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, রিযিক সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা মজবুত করিয়া লও; তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ে খুব একটা মেহনত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না। কোন এক বুযুর্গ বলেন যে, সর্বাধিক ভারী চিন্তা হইল আহারের চাহিদা হওয়া। প্রথমোক্ত বুযুর্গ যাহা বলিয়াছেন উহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ পাক মানুষকে এমন জিনিসের সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষী করিয়াছেন যাহা দ্বারা মানুষের দৈহিক গঠন ঠিক থাকে এবং তাহার দেহে শক্তি বৃদ্ধি হয়। কেননা মানব দেহে স্বভাবজাত যে উষ্ণতা আছে তাহা শরীরের বিভিন্ন অংশকে দুর্বল করিয়া দেয়। আর যখন তাহার দেহে খাদ্য পৌঁছে তখন পাকস্থলী ইহা মন্থন করে। ইহার সার অংশটুকু দেহের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করে। অতঃপর এই সার পদার্থটুকু দেহের অংশে পরিণত হয় আর দুর্বলতার পরিপূরক হইয়া যায়। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করিলে বান্দাকে খাদ্যের মুখাপেক্ষী না করিয়াও পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রাণীদিগকে খাদ্যের মুখাপেক্ষী করার এবং খাদ্যের জন্য অস্থির বানানোর ইচ্ছা করিলেন। আর নিজে এই সব প্রয়োজনের উর্ধ্বে থাকার কথা প্রকাশ করিতে চাহিলেন।

আল্লাহ পাক বলেন-

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ *

"হে নবী! আপনি তাহাদিগকে বলুন; তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অভিভাবক মানিয়া লইব? যিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি অন্যান্যদিগকে আহার করান কিন্তু তাঁহাকে কেহই আহার করায় না।"

এখানে আল্লাহ পাক দুইটি গুণের মাধ্যমে নিজের প্রশংসা করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি হইল তিনি অন্যান্যদিগকে আহার করান। কেননা যত বান্দা রহিয়াছে সকলেই তাঁহার অনুগ্রহ ও এহসান লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার প্রদত্ত রিযিক আহার করে।

দ্বিতীয়টি হইল তিনি আহার করেন না। কেননা তাঁহার খাদ্যের কোন প্রয়োজন হয় না। তিনি ইহার প্রয়োজন হইতে অনেক উর্ধ্বে বরং তিনি 'ছামাদ'। 'ছামাদ' এমন সত্ত্বাকে বলা হয় যাহার খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহ পাক প্রাণীদিগকে খাদ্যের মুখাপেক্ষী বানাইয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য জিনিসকে অর্থাৎ জড়কে খাদ্যের মুখাপেক্ষী করেন নাই। ইহার কারণ আল্লাহ পাক স্বীয় গুণাবলী হইতে কয়েকটি গুণ প্রাণীকে দান করিয়াছেন। সুতরাং যদি তাহাদের ক্ষুধা না লাগে এবং তাহারা খাদ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয় তাহা হইলে তাহারা নিজের সম্পর্কে কি দাবী করিয়া বসে বা অন্যান্যরা তাহাদের সম্পর্কে কি বলিয়া ফেলে খোদাই জানেন। আল্লাহ পাক তো খুব হেকমতওয়ালা এবং খবরদার। তাই তিনি তাহাদিগকে খাদ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী করিতে চাহিলেন। যাহাতে খাদ্যের প্রতি তাহাদের বার বার মুখাপেক্ষী হওয়ার ফলশ্রুতিতে তাহার নিজের সম্পর্কে বড় কিছু দাবী না করিতে পারে অথবা অন্যান্যরা তাহাদের সম্পর্কে ভারী কিছু না বলিতে পারে।

আরো একটি উপকারী আলোচনা

আল্লাহ পাক প্রাণী জগতকে (প্রাণী মানুষ হউক বা মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রানী হউক) মুখাপেক্ষী বানাইতে ইচ্ছা করিলেন যাহাতে ইহারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করিতে পারে বা তাহাদের মাধ্যমে অন্যান্যরা আল্লাহর পরিচয় লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ যদি মানুষ নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে তাহা হইলে সে এই চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভে সক্ষম হইবে। অথবা যদি কেহ তাঁহার অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে তাহা হইলে তাহার অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করনেওয়ালা আল্লাহর পরিচয় লাভে সক্ষম হইবে। তুমি কি দেখ না যে, মুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার বড় উসিলা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

يَايُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ *

হে মানুষ সকল। তোমরা সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ পাক মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি প্রশংসিত। সুতরাং বান্দার আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছার জন্য এবং তাঁহার সামনে হাযির থাকার জন্য বান্দার মুখাপেক্ষীতাকে মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন। এই পর্যন্ত যাহা বর্ণনা করা হইল তাহা হইলে হয়ত বা তুমি নিম্নে উল্লেখিত হাদীছের মর্মার্থ অনুধাবন করিতে পারিবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজকে চিনিতে পারিয়াছে সে স্বীয় প্রভুকেও চিনিতে পারিয়াছে।

হাদীছের ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মুখাপেক্ষীতা, দারিদ্রতা, অপদস্থতা, অভাবঅনটনের অবস্থায় নিজের পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছে যে, সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর মুখাপেক্ষী। নিশ্চয় সে আল্লাহকেও চিনিতে পরিয়াছে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা কত সম্মানিত, মর্যাদাবান, বিজয়ী, অনুগ্রহকারী?

তিনি তো সমগ্র প্রাণী জগতকেই মুখাপেক্ষী বানাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া মানব জাতিকে অধিকতর মুখাপেক্ষী করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়োজনও অধিক। অধিকন্তু প্রয়োজন বিভিন্নমুখী। মানুষ তাহার ইহজীবন ও পরজীবন উভয় জীবনে সংশোধনের জন্য মুখাপেক্ষী। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ *

"আমি মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জীবনে খুব কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি।"

যেহেতু মানুষ জাতি আল্লাহ পাকের কাছে অধিক সম্মানিত। তাই অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় তিনি মানুষকে অধিক মুখাপেক্ষী করিয়াছেন। তাহার প্রয়োজন অনেক রাখিয়াছেন। অন্যান্য প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, মানুষের ন্যায় তাহারা এত মুখাপেক্ষী নহে। যেমন অন্যান্য প্রাণীরা দেহের পালক ও লোমের কারণে ইহারা পোশাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করার প্রতি মুখাপেক্ষী নহে। অথচ মানুষ এই দিকে মুখাপেক্ষী। যেহেতু ইহারা গর্তে অথবা গাছের আড়ালে স্বীয় বাসা করিয়া লইতে পারে, তাই তাহারা ঘর প্রস্তুত করার প্রতি মুখাপেক্ষী নহে। অথচ মানুষ ইহার মুখাপেক্ষী।

আরও একটি ফায়দার কথা

আল্লাহ পাক মানুষকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই তিনি

মানুষকে বিভিন্ন জিনিসের মুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন। ইহার মাধ্যমে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন যে মানুষ বিবেক খাটাইয়া এবং নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা নিজের প্রয়োজনসমূহ পুরা করে, না আল্লাহ পাক তাহার জন্য যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন উহার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

আরও একটি ফায়দার কথা

আল্লাহ পাক বান্দার প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই তিনি বান্দাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ডুবাইয়া রাখেন। আবার তিনিই তাহার প্রয়োজন পুরা করেন। ফলে বান্দা নিজের মধ্যে এক প্রকার মজা অনুভব করিতে থাকে। তাহার অন্তরে আরাম ও শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। সুতরাং তাহার এই অবস্থা তাহার মধ্যে প্রয়োজন পুরাকারীর প্রতি মুহব্বতের নুতন উদ্যেগ সৃষ্টি করে। তাই সে আল্লাহকে মহব্বত করিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহকে মহব্বত কর। কেননা তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদিগকে রিযিক প্রদান করেন। সুতরাং নেয়ামত যতই নুতন হইতে থাকে, মহব্বত ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আরও একটি ফায়দার কথা

আল্লাহ পাক চাহিয়াছেন যে বান্দারা তাঁহার শোকরিয়া আদায় করুক। তাই তিনি প্রথমে বান্দাদিগকে বিভিন্ন প্রয়োজনে লিপ্ত করেন। অতঃপর তিনি নিজে থেকেই তাহাদের প্রয়োজনসমূহ পুরা করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে বান্দারা তাঁহার শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁহার অনুগ্রহ ও সদাচারণের কথা স্মরণ করার মাধ্যমে তাঁহাকে চিনে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন-

كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُوْرٌ *

"তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত রিযিক হইতে আহার কর এবং তাঁহার শুকরিয়া আদায় কর। তাঁহার শহর পবিত্র এবং তিনি প্রতিপালক, ক্ষমাশীল।"

আরও একটি ফায়দার কথা

আল্লাহ পাক ইচ্ছা করিয়াছেন, বান্দাদের মুনাজাতের (আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করার) দরজা প্রশস্ত করিবেন। অর্থাৎ বান্দার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যে, বান্দা বেশী বেশী আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্য তিনি বান্দাকে পানাহার ও অন্যান্য নেয়ামতের মুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন। আর বান্দা যখন আহার্য্যবস্তু ও অন্যান্য

নেয়ামতের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় তখন সে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মনোনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ফলে বান্দা আল্লাহ পাকের কাছে মুনাজাত করার সৌভাগ্য লাভ করে। আর আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে নেয়ামত লাভ করিতে থাকে।

যদি মুখাপেক্ষীতা বান্দাকে মুনাজাতের দিকে না লইয়া যাইত তাহা হইলে সাধারণ লোক ইহার হাকীকতই বুঝিত না। যদি বান্দা প্রয়োজনে না পড়িত তাহা হইলে কিছু খোদা প্রেমিক ব্যতীত অন্য কেহ মুনাজাতের প্রতি মনোনিবেশই করিত না। সুতরাং বান্দা প্রয়োজনে আটকা পড়া তাহার মুনাজাতের কারণ হইয়াছে। আর আল্লাহর সাথে মুনাজাতের সৌভাগ্য লাভ করা বড়ই উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের কথা। হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত মূসা (আঃ) মিশর ত্যাগ করিয়া সিরিয়া আগমনের সময় পথিমধ্যে এক কুয়ার কাছে আসিয়াছিলেন পানি পান করার জন্য। তথায় দেখিতে পাইলেন যে, দুইটি কিশোরী পুরুষদের ভীড়ে কুঁয়া হইতে পানি সংগ্রহ করিতে পরিতেছে না। হযরত মূসা (আঃ) পানি সংগ্রহে কিশোরীদ্বয়কে সহায়তা করিলেন। অতঃপর গাছের ছায়ার নীচে বসিয়া যে দোআ করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে কুরআনে আসিয়াছে-

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ *

মূসা (আঃ) কিশোরীদ্বয়ের খাতিরে তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইলেন। অতঃপর ছায়ার দিকে গেলেন এবং দোআ করিলেন-

হে প্রতিপালক! আপনি আমার জন্য যে রিয্ক অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি নিঃসন্দেহে ইহার প্রতি মুখাপেক্ষী।

হযরত আলী (রাঃ) এই সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম; হযরত মূসা (আঃ) নিজের আহারের জন্য একটি রুটি ব্যতীত অন্য কিছুই চাহেন নাই। তখন তাঁহার শারিরীক অবস্থা এত দুর্বল ছিল যে, পেটের চামড়া পিঠের সাথে লাগিয়া গিয়াছিল। এখানে খুব লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, তিনি কিভাবে আল্লাহ পাকের কাছে আবেদন করিয়াছিলেন। কেননা তাহার বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ রিয্কের মালিক নহে। আর একজন ঈমানদার এমনই হওয়া উচিত যে, ছোট বড় সবকিছুই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিবে। এমনকি এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমি নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের কাছে সবকিছুই আবেদন করি। এমনকি আটাতে যে লবনটুকু দিতে হয় উহার

আবেদনও করিয়া থাকি। সুতরাং মুমিনের কোন জিনিসের প্রয়োজন হইলে তাহা আল্লাহ পাকের কাছেই প্রার্থনা করিবে। আর যে জিনিস চাইবে, তাহা স্বল্প ধারনা করিয়া যেন উহা চাওয়া হইতে বিরত না থাকে। যদি স্বল্প জিনিস আল্লাহর কাছে না চায় তাহা হইলে উহা চাওয়ার জন্য তাহার দ্বিতীয় কোন প্রভু তো নাই যাহার কাছে চাইতে পারিবে। যাহা চাইবে যদিও উহার পরিমান স্বল্প হয় তবুও যেহেতু এই জিনিস আল্লাহর সাথে তাহার মুনাজাতের উসিলা হয় তাই জিনিস পরিমানে স্বল্প হইলেও মর্যাদার দিক দিয়া ইহা অনেক হইয়া পড়িয়াছে। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, দোয়া করার সময় এমন চিন্তা না হওয়া চাই যে, তাহার কাজ পুরা হইয়া যাক। ইহার দ্বারা প্রভুর মধ্যে আর দোয়াকারীর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। বরং প্রভুর সাথে একাগ্রচিত্তে চুপেচুপে কথা বার্তা হইতেছে; ইহা দোয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে কয়েকটি ফায়দার কথা রহিয়াছে।

প্রথম ফায়দা ঃ মুমিনের স্বল্প জিনিসের প্রয়োজন হউক বা অধিক জিনিসের প্রয়োজন হউক। উভয় ক্ষেত্রে স্বীয় প্রভুর কাছেই আবেদন জানানো উচিত। তাঁহার কাছেই চাওয়া উচিত। এই সম্পর্কে আমরা এই মাত্র আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয় ফায়দা ঃ হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাককে 'রব' নামে ডাকিয়াছেন। আর যখন তিনি আল্লাহ পাককে ডাকিতেছিলেন তখন 'রব' নামে ডাকার পরিস্থিতিই বিরাজ করিতেছিল। কেননা 'রব' এমন সত্ত্বাকে বলা হয় যিনি তোমাকে স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা লালন-পালন করেন এবং স্বীয় এহসানের দ্বারা তোমাকে রিয্ক প্রদান করেন। সুতরাং এই নামে ডাকিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ পাক তাহার প্রতি অনুগ্রহশীল হন এবং মেহেরবানী প্রদর্শন করেন। কেননা তিনি এমন এক সত্ত্বা যাহার উপকার ও অনুগ্রহের বৃষ্টি কখনও বন্ধ হয় না।

তৃতীয় ফায়দা ঃ হযরত মুসা (আঃ) নিম্নোক্ত শব্দগুলির সমন্বয়ে দোয়া করিয়াছেন,

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ *

"হে প্রভু! আপনি আমার জন্য যে রিয্ক অবতীর্ণ করিয়াছেন নিঃসন্দেহে আমি উহার প্রতি মুখাপেক্ষী।"

কিন্তু انى الى الخير فقير (আমি রিযিকের মুখাপেক্ষী' বলেন নাই। যদি তিনি এইরূপ বলিতেন তাহা হইলে তাহার কথায় ইহা বুঝা যাইত না যে, আল্লাহ্ পাক তাহার রিয্ক অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন-

رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ *

যাহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাহার আস্থা রহিয়াছে আর তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে ভুলেন নাই। যেন তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, হে পরোয়ারদেগার! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনি আমাকে বেকার ছাড়েন নাই এবং অন্যকেও বেকার ছাড়েন নাই। আপনি আমার রিয্ক নাযিল করিয়া দিয়াছেন। এখন আপনার অবতীর্ণ রিয্ক হইতে আপনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে আপনার অনুগ্রহে আমার কাছে প্রেরণ করুন। তাহার এই আবেদনে দুইটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল যে, রিয্কের তলব করা। দ্বিতীয় আল্লাহ্ রিয্ক অবতীর্ণ করিয়াছেন; এই কথার স্বীকারোক্তি। কিন্তু কখন অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। কি কারণে অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং কিসের মাধ্যমে অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করেন নাই।

অত্র আয়াত থেকে উদ্দেশ্য বান্দার রিয্ক তলব করা এবং আল্লাহ্ পাক বান্দার রিয্ক অবতীর্ণ করিয়াছেন এই কথার স্বীকারোক্তি করা কিন্তু রিযকের সময়, কারণ এবং মাধ্যম নির্ধারিত নয়। আর তাহার নির্ধারিত না হওয়ার কারণ বান্দাকে ব্যাকুল বানানো। কেননা ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার দ্বারাই বান্দা কবুল হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন-

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ *

"যখন ব্যাকুল ও অস্থির বান্দা তাঁহাকে ডাকে তখন আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে আছে যে, তাহার ডাক শুনে?"

আর যদি রিযিক লাভের সময়, কারণ ও মাধ্যম বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে বান্দা ব্যাকুল ও অস্থির হইত না। সুতরাং আল্লাহ্ পাক পবিত্র হেকমতওয়ালা, কুদরতওয়ালা এবং সর্বজ্ঞানী।

চতুর্থ ফায়দা ঃ অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের কাছে আবেদন করা, তাঁহার কাছে চাওয়া আল্লাহর অনুগত খাঁটি বান্দা হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ অনুগত খাঁটি বান্দা ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার কাছে আবেদন করিয়াছিলেন,

চাহিয়াছিলেন। ইহা থেকে বুঝা যায় যে, চাওয়া বা আবেদন করা খাঁটি অনুগত বান্দা হওয়ার পরিপন্থী নহে। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, যদি চাওয়া বা আবেদন করা খাঁটি অনুগত বান্দা হওয়ার পরিপন্থী না হয়, তাহা হইলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেন আবেদন করেন নাই? যখন নমরূদের লোকেরা তাহাকে চড়ক গাছে ঝুলাইয়া তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল আর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহার সামনে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন- "আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি"? তখন তিনি জবাব দিয়াছিলেন, " আপনার কাছে নয়; হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে আছে।" তখন জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, তাহা হইলে আল্লাহর কাছেই দোয়া করুন। তখন তিনি বলিলেন, আমার সম্বন্ধে তাঁহার জানা আছে। সুতরাং আমার সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার দোয়া করার প্রয়োজন নাই। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তো আল্লাহর জানার কারণে আল্লাহর কাছে চাওয়া থেকে বিরত রহিয়াছেন। ইহার কারণ কি? হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আবেদন ও চাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণ এই যে, নবীগণ পরিস্থিতি মোতাবেক আমল করিয়া থাকেন। কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাক তাহাদের থেকে কি আমল চাহিতেছেন তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে এ চাহিদা মোতাবেক আমল করেন। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই অবস্থায় আল্লাহ পাকের চাহিদা হইল তাঁহার কাছে কোন কিছু না চাওয়া। বরং তাঁহার অবগতির উপর নির্ভর করা। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে তিনি আল্লাহ পাকের চাহিদা যাহা বুঝিতে পারিয়াছেন সে মোতাবেকই আমল করিয়াছেন। আল্লাহ পাকের এই চাহিদার কারণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে এই পরিস্থিতিতে পতিত করার পিছনে আল্লাহ পাকের যে রহস্য লুকায়িত ছিল তাহা এখন ফিরিশতাদের সামনে প্রকাশ করিয়া দেওয়া। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের সাথে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, তিনি দুনিয়াতে স্বীয় প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতে চান। তখন ফিরিশতারা বলিয়াছিল যে, আপনি কি দুনিয়াতে এমন জাতি নিয়োগ করিবেন যাহারা তথায় ফেতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবী করিবে? আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, আপনার তাসবীহ পাঠ করিতেছি, আপনার গুণাগুণ বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহ পাক তাহাদের জবাবে বলিলেন, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না। সুতরাং যখন ইবরাহীম (আঃ)কে চড়কগাছে বসাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন আল্লাহ পাক স্বীয় কথার অর্থাৎ আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না। এই বাণীর রহস্য ফিরিশতাদের সামনে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেন আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এই কথা

বলিলেন, তোমরা তো বলিয়াছিলে যে, মানবজাতি দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদ করিবে এবং রক্তারক্তি করিবে এখন তোমরা আমার পরমবন্ধুকে কেমন দেখিলে? তিনি কি দুনিয়াতে ফেতনা ফাসাদ ও খুনাখুনি করনেওয়ালা?

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাহার অনুসারীদের প্রতি কি তোমরা দেখিতেছনা? অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আঃ)ও বুঝিতে পারিলেন যে, এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাকের চাহিদা হইল তাঁহার প্রতি মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করা। আর তাঁহার কাছে আবেদন করার জন্য মুখ খোলা। তাই তিনি পরিস্থিতির চাহিদা মোতাবেক আমল করিলেন।

পঞ্চম ফায়দা ঃ হযরত মূসা (আঃ) এর দোয়া সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন করিতে গিয়া কোন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চিন্তা করিলে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তাহার আবেদন স্পষ্ট ও সরাসরি ছিল না। বরং এই ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা হইল তিনি অল্লাহ পাকের সামনে শুধু স্বীয় অভাব অনটনের কথা প্রকাশ করিলেন। আর আল্লাহ পাকের বিত্তশালীতার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। কেননা, তিনি অভাব-অনটন ও ক্ষুধার মাধ্যমে নিজকে চিনিয়াছেন আর একই সময়ে আল্লাহ পাককে বিত্তশালীতা ও পরিপূর্ণতার গুণে চিনিয়াছেন। আবেদন করার বিভিন্ন পন্থার মধ্যে ইহাও এক পন্থা।

আবেদন করার পন্থা বিভিন্ন। কখনও কখনও এমন হয় যে, আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অভাব অনটনে ফেলিয়া দেন। তখন তাহাকে يا غني (হে বিত্তশালী) নামে ডাকিতে হয়। কখনও কখনও অপদস্ততা ও লাঞ্ছনায় ফেলিয়া দেন। তখন আবেদন পেশ করার পন্থা হইল তাহাকে يا عزيز (হে সম্মানিত) নামে ডাকা। কখনও কখনও তোমাকে অক্ষমতা ও অপারগতার রাস্তায় বসাইয়া দেন। তখন তাঁহার কাছে আবেদন করার পন্থা হইল তাহাকে يا قوى (হে শক্তিশালী) নামে আহবান করা। আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি নামে ডাকার এই ধরনের বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে।

হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় অভাব-অনটন ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তাহার পক্ষ হইতে আবেদন করার প্রতি ইশারা হইয়া গিয়াছে। যদিও এখানে আবেদন সরাসরি বুঝা যায় নাই। ইশারা এই ভাবে হইয়াছে যে, বান্দা স্বীয় প্রয়োজন মুখাপেক্ষীতা, অভাব-অনটন প্রকাশ করিতেছে আর তাহাও বিত্তশালী অনুগ্রহশীল প্রভুর সামনে। ইহার উদ্দেশ্য তাঁহার কাছে কিছু আবেদন করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অনুরূপভাবে কখনও কখনও

ইশারার মাধ্যমে আবেদন এইভাবেও হইয়া থাকে যে, বান্দা মালিকের এমন সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে যে, সকল গুণাবলীতে মালিক অদ্বিতীয়। মালিক ব্যতীত অন্য কেহ এই সকল গুণের অধিকারী হয় না। যেমন এই ধরণের আবেদনের কথা হাদীছেও আসিয়াছে। হাদীছে আসিয়াছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার এবং পূর্ববর্তী সকল নবীগণের দোয়ার মধ্যে উত্তম দোয়া হইল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু।" অত্র হাদীছে আল্লাহ পাকের প্রশংসাকেও দোআ বলা হইয়াছে। কেননা, স্বীয় বিত্তশালী মালিকের পরিপূর্ণ গুণাবলী উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করা তাঁহার অনুগ্রহ ও দানের জন্য আবেদন ও প্রার্থনা করার ইঙ্গিত বহন করে। এক উর্দু কবি বলেন-

اس قرد هے صاحب خلق كريم + يكسان رس كاهے صبح و مسا

گر کرے اسکی ثنا کوئی کبھی + ما نکنی سے اس کو کافی ھے ثنا

"মহানুভব সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা এত উচ্চ যে সকাল-সন্ধ্যা তাঁহার নিকট এক পর্যায়ের।"

যদি কেহ কখনও তাঁহার প্রশংসা করে; তাহা হইলে এই প্রশংসাই প্রশংসাকারীর পক্ষ হইতে আবেদন হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ।"

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দোআ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি মাছের পেটে থাকিয়া নিম্নোক্ত দোআ করিয়াছেন-

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ *

"হযরত ইউনুস (আঃ) অন্ধকারে থাকিয়া আল্লাহকে ডাক দিয়া বলিলেন যে, আপনার ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আপনি পবিত্র। আমি যথোপযুক্ত কাজ করি নাই।"

তাহার এই দোআর পর আল্লাহ পাক তাহার সাথে কি আচরণ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক নিজের ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন-

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ *

"আমি তাহার দোয়া কবুল করিয়া লইয়াছি এবং তাহাকে চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়াছি। এইভাবে আমি ঈমানদারদিগকে মুক্তি দিয়া থাকি।" হযরত ইউনুস (আঃ) সরাসরি মুক্তি আবেদন করেন নাই। বরং স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার সামনে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার প্রতি স্বীয় মুখাপেক্ষীতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক তাহার এই আমলকে

আবেদন গন্য করিয়াছেন। কেননা তাহার প্রশংসা করার জবাবে বলিয়াছেন যে, আমি তাহার দোয়া কবুল করিয়াছি। ইহার অর্থ তিনি তাহার আবেদন পুরা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ ফায়দা ঃ হযরত মুসা (আঃ)-এর এই ঘটনার মধ্যে সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, হযরত মুসা (আঃ) হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর কন্যাদের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রমের বিনিময় বা পারিশ্রমিক চান নাই। বরং তিনি তাহাদের ছাগলগুলোকে পানি পান করানোর পর আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাহার কাছে পারিশ্রমিক চাহিয়াছেন। তিনি বালিকাদের কাছে না চাহিয়া স্বীয় মালিকের কাছে চাহিয়াছেন। আর মালিকের কাছে তলব করিয়াছেন। মালিক তাহাকে বিনিময় দান করিয়াছেন। প্রকৃত সুফী তো ঐ ব্যক্তি যাহার দায়িত্বে অন্যের যে অধিকার রহিয়াছে তাহা পুরাপুরি আদায় করে কিন্তু অন্যের কাছে সে যাহা পাইবে তাহা দাবী করে না। এই সম্পর্কে আমাদের রচিত একটি কবিতা রহিয়াছে।

কবিতাটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল-

"মাখলুকের অভিযোগ করিতে করিতে জীবন বরবাদ করিও না।"

জীবনের সময় কম এবং তাহা চলিয়া যাইতেছে। কেন অভিযোগ কর; যখন তুমি বিশ্বাস কর যে, যাহা কিছু হয় সবই খোদার পক্ষ হইতে লিপিবদ্ধ বিষয়।

যখন খোদার হক আদায় কর না। তখনও কি তিনি তোমার প্রতি মঙ্গল করিবেন? কেন তুমি কে? দেখ! তোমার প্রতি তাঁহার যে সকল হক রহিয়াছে। ধৈর্যের সাথে তুমি সেগুলি আদায় কর।

"যখন কোন কাজ কর; তখন তুমি ইহার প্রতি খেয়াল কর। খোদা পাক তোমার নিয়ত জানেন।"

সুতরাং মুসা (আঃ) নিজের পক্ষ হইতে হক্ব আদায় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিজের হক চাহেন নাই। তাই আল্লাহ পাক তাহাকে পরিপূর্ণ বিনিময় দান করিয়াছেন। আখেরাতে তাহার জন্য যে বিনিময় জমা রহিয়াছে তাহা ব্যতীতও দুনিয়াতেও বিরাট দান দিয়াছেন। অর্থাৎ উল্লেখিত বালিকাদ্বয়ের একজনের সাথে তাহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বীয় নবী হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর জামাতা বানাইয়া দিয়াছেন। এইভাবে নবী পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায়ই তিনি নবুয়ত লাভ

করেন। সুতরাং হে বান্দাগণ! স্বীয় সমস্যা আল্লাহর জন্য রাখিয়া দাও। লাভবানদের অন্তর্ভূক্ত থাকিবে। আল্লাহ পাক যেন তোমাকে খাতির করেন যেমন তিনি মুত্তাকী ব্যক্তিদের খাতির করিয়া থাকেন।

সপ্তম ফায়দা ঃ দেখ! আল্লাহ পাক মুসা (আঃ) সম্পর্কে কি বলিয়াছেন,

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ *

"অতঃপর তিনি তাহাদের ছাগলগুলিকে পানি পান করাইলেন এবং ছায়ার নীচে গিয়া বসিলেন।" তাহার এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল যে, রৌদ্র ছাড়িয়া ছায়াকে প্রাধান্য দেওয়া, গরম পানিকে ছাড়িয়া শীতল পানি পান করা, এবং কঠিন রাস্তা ছাড়িয়া সোজা রাস্তা গ্রহণ করা ঈমানদারদের জন্য বৈধ। আর এইভাবে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করার দ্বারা মানুষ যুহদ ও তাকওয়ার পথ হইতে বহির্ভূত হয় না। দেখ! আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ছায়ার ইচ্ছা করিয়াছেন এবং ছায়াতে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তিনিও অধিকতর আরামদায়ক অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অথচ তিনি এ যুগের সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী। নিম্নে এক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করা হইতেছে। এই ঘটনার দ্বারা উল্লিখিত আলোচনার উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়। ঘটনাটি এই যে, এক বুযুর্গের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করিল। সে দেখিতে পাইল যে, এই বুযুর্গ যে কলস হইতে পানি পান করেন, উহার উপর রৌদ্র পড়িয়াছে। সে বুযুর্গকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। বুযুর্গ জবাব দিলেন- আমি যখন কলসটি এখানে রাখিয়াছিলাম তখন এখানে কোন রৌদ্র ছিল না। অতঃপর রৌদ্র আসিল এখন কলসটি রৌদ্র থেকে সরাইয়া ছায়ায় আনিলে নিজের আরামের জন্য আনিব। আর নিজের আরামের জন্য এই কাজটি করিতে আমার লজ্জা হইতেছে। আপত্তি হয় এই ভাবে যে, হযরত মুসা (আঃ) রৌদ্র হইতে সরিয়া ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে এই বুযুর্গ রৌদ্র থেকে কলস সরাইয়া লওয়াও স্বীয় নফসের তাবেদারী বলিয়া মনে করিয়াছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যদ্বয় পরস্পর বিপরীতমুখী বলিয়া মনে হইতেছে। এই আপত্তির সমাধান এই যে, এই বুযুর্গ সত্য অনুসন্ধান করিতেছেন ঠিক, কিন্তু তাহার অনুসৃত পন্থা বানোয়াটিপূর্ণ। তিনি নিজকে নফসের চাহিদা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ সম্পর্কে অসতর্ক না হইয়া পড়েন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কামেল (উচ্চ) পর্যায়ে আসীন নহেন। যদি তিনি কামেল পর্যায়ে আসীন হইতেন তাহা হইলে সত্যিই পানি রৌদ্র হইতে সরাইয়া লইতেন এবং স্বীয় নফসের হক আদায় করিবার ইচ্ছা করিতেন।

কেননা স্বীয় নফসের হক আদায় করার নির্দেশ রহিয়াছে। আর এই নির্দেশ আল্লাহ পাকের। নফসের হক আদায় করা এই জন্য নহে যে ইহার মাধ্যমে নফস স্বাদ উপভোগ করিবে। বরং এই জন্য যে, ইহা আল্লাহ পাকের নির্দেশ। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ *

"আল্লাহ পাক তোমাদের আছানীর ইচ্ছা করেন। তোমাদের কাঠিণ্যতার ইচ্ছা করেন না।"

অন্য এক স্থানে বলেন-

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا *

"আল্লাহ পাক তোমাদের বোঝা হালকা করিতে ইচ্ছা করেন এবং মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ফকীহদের কাছে একটি মাসআলা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি খালি পায়ে মক্কা যাওয়ার জন্য মান্নত করে তাহার জন্য জুতা পায়ে দিয়া মক্কা যাওয়া জায়েয। খালি পায়ে যাওয়া ওয়াজিব নহে। কেননা শরীয়তের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যেন কষ্টে না পড়ে। শরীয়ত মানুষকে আরাম উপভোগ করা থেকে বাঁধা প্রদান করে না। কেন বাঁধা প্রদান করিবে? আরাম-আয়েশ তো মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। রবী ইবনে যিয়াদ হারিছী (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলেন, আমার ভ্রাতা আসেমের অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে আমাকে সহায়তা করুন। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কি অবস্থা?" রবী ইবনে যিয়াদ বলিলেন, সে গায়ে কম্বল জড়াইয়া আছে। ফকীর সাজিতে চাহিতেছে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস। অতঃপর তাহারা আসেমকে তাহার সামনে হাজির করিলেন। তখন আসেম একটি কম্বল পরিহিত অবস্থায় অপর একটি কম্বল গায়ে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। তাহার মাথা ও দাড়ির চুলগুলো এলোমেলো ও ময়লা ভরপুর ছিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার খুব আফসোস হইতেছে। এই অবস্থা লইয়া স্ত্রীর সামনে দাঁড়াইতে একটুও লজ্জাবোধ হয় না? সন্তানাদির প্রতি তোমার একটুও রহম আসে না? আল্লাহ পাক কি তোমাকে হালাল পরিস্কার জিনিস দান করেন নাই? যাহাতে তুমি পরিস্কার ভাল জিনিস খাইতে পার? তোমার সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তুমি যে বেশ

ধরিয়াছ ইহাতে কি আল্লাহর কাছে তোমার কোন মর্যাদা রহিয়াছে? তুমি কি আল্লাহ পাকের মহাবাণী শুন নাই? আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

وَ الْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ * فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ * وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحَانُ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ * فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ *

"তিনিই ধরাতলকে আপনস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন সৃষ্টি জীবের জন্য। উহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খেজুর বৃক্ষ যাহা খোসাবিশিষ্ট এবং উহাতে শস্যও রহিয়াছে। যাহার মধ্যে ভূসি এবং ভোজ্যবস্তু থাকে। অতএব হে জ্বীন ও মানবজাতি! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? তিনিই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। (অর্থাৎ আদমকে) এমন মৃত্তিকা হইতে যাহা পোড়ামাটির ন্যায় ঠুনঠুন বাজিত এবং জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন খাঁটি অগ্নি হইতে। অতএব হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? তিনি উভয় উদয়াচল ও উভয় অস্তাচলের নিয়ন্তা। তিনি দুই সাগরকে (দৃশ্যতঃ) মিলাইয়া দিয়াছেন যে (দেখিতে) পরস্পর সম্মিলিত। উহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা ডিঙ্গাইতে পারে না। সুতরাং তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? উভয় হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়।"

হে শ্রোতা! তুমি জান যে আল্লাহ পাক আয়াতসমূহে উল্লেখিত জিনিসসমূহ এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, মানুষ এইগুলি ব্যবহার করিবে এবং আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিবে। আর আল্লাহ পাক তাহাদের এই প্রশংসার বিনিময়ে তাহাদিগকে সওয়াব দান করিবেন। খুব ভালভাবে জানিয়া রাখ যে আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহ আপন কর্মের মাধ্যমে ব্যবহার করা মৌখিক ব্যবহার করা অপেক্ষা উত্তম।

অর্থাৎ, নিয়ামতসমূহ খাওয়া, পান করা বা অন্যান্য কার্যে ব্যবহার করার নাম কর্মের মাধ্যমে ব্যয় করা। আর নিয়ামতসমূহ মুখে অস্বীকার করা, বেকদরী করা, কর্মের মাধ্যমে ব্যবহার বর্জন করার নাম মুখে ব্যয় করা। সুতরাং প্রথমোক্ত পন্থা দ্বিতীয় পন্থা অপেক্ষা উত্তম। আসেম হযরত আলী (রাঃ)কে

পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিল যে, আপনিও তো মোটা কাপড় পরিধান করেন, সাধারণ খাদ্য আহার করেন তাহা হইলে আপনি ইহা কিভাবে করেন?

হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন যে, তোমার জন্য বড়ই আক্ষেপ হয়। তুমি ইহা জান না যে আল্লাহ পাক মুসলমান নেতাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করিয়া দিয়াছেন তাহারা যেন দরিদ্র লোকের জীবন-যাপন করে। যাহাতে গরীব লোকেরা তাহাদের সান্নিধ্যে আসিতে পারে এবং তাহাদের অবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। হয়তবা তোমরা বুঝিয়াছ যে হযরত আলী (রাঃ)এর বক্তব্যে এই কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, আল্লাহ পাক অনেক বান্দাদের আরাম আয়েশ বর্জন করা চাহেন না বরং তাহারা সুখ স্বাচ্ছন্দে ও আরাম আয়েশে জীবন যাপন করার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে শুকরিয়া আদায় করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ *

"তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত রিয্ক আহার কর এবং তাঁহার শুকরিয়া আদায় কর।"

আল্লাহ পাক আরও বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ *

"হে ঈমানদাররা! আমি তোমাদিগকে যে রিযক্ প্রদান করিয়াছি উহা হইতে পবিত্র জিনিসগুলি আহার কর আর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় কর।" অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا *

"হে রাসূলগণ! পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করুন এবং নেক কাজ করুন। এমন বলেন নাই যে, খাইও না বরং বলিয়াছেন যে খাও এবং আমল কর। উল্লিখিত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে যে আয়াতদ্বয়ে 'তাইয়েবাত' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। আর 'তাইয়েবাত' দ্বারা হালাল জিনিস সমূহকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা হালাল জিনিসসমূহ শরীয়তের দৃষ্টিতে 'তাইয়েব' কারণ তাইয়েব অর্থ পবিত্র। আর পবিত্র বস্তু হালাল হইয়া থাকে। সুতরাং আয়াতে হালাল বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, মজাদার ও আরামপ্রদ বস্তুর কথা বলা হয় নাই। অথচ আয়াতদ্বয় পেশ করা হইয়াছে মজাদার ও আরামপ্রদ বস্তু আহার করার নির্দেশ থাকা সম্বন্ধে। এই আপত্তির সমাধান বুঝিয়া লও যে,

এখানে 'তাইয়েবাত' শব্দ উল্লেখ করিয়া হালাল বস্তুসমূহ বুঝানোর সম্ভাবনাও আছে। কেননা 'তাইয়েব' শব্দের অর্থ পবিত্র। হালাল বস্তু ভক্ষন করিলে গোনাহ, নিন্দা এবং আল্লাহর সম্পর্কের পথে প্রতিবন্ধকতা হইতে বান্দা পবিত্র থাকে। এইদিকে খেয়াল করিয়াও হালাল বস্তুকে তাইয়েব নাম রাখা হয়। অধিকন্তু 'তাইয়েবাত' শব্দ উল্লেখ করিয়া মজাদার আরামপ্রদ খাদ্যবস্তুও বুঝানো যাইতে পারে। মজাদার ও আরামপ্রদ খাদ্যবস্তু আহার করার অনুমতি প্রদানের হেকমত এই যে, এই ধরণের খাদ্য আহারকারী আরাম ও মজা পায়। ফলে সে শোকরিয়া আদায় করার সাহস লইয়া সামনে অগ্রসর হয় এবং আল্লাহ পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আমার পীর আমাকে বলিয়াছেন, হে বৎস! ঠাণ্ডা পানি পান কর। কেননা বান্দা যখন গরম পানি পান করে তখন অবশ্য মন থেকে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। কিন্তু যখন ঠাণ্ডা পানি পান করে তখন তাহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। অতঃপর উপরে উল্লিখিত কলসওয়ালা বুযুর্গের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, এই বুযুর্গ 'সাহেবে হাল' তাহার অনুকরণ করা যায় না।

মূল উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

আল্লাহ পাক প্রাণী জগতকে বিশেষ করিয়া মানুষকে খাদ্যের মুখাপেক্ষী বানানোর মধ্যে কি হেকমত নিহিত রহিয়াছে, এই পর্যন্ত তাহা বর্ণনা করা হইল। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল আল্লাহ পাক খাদ্য প্রদান করেন এবং তিনিই খাদ্য পৌঁছানোর দায়িত্ব লইয়াছেন।

আল্লাহ পাক যেহেতু প্রাণী জগতকে এমন এক সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষী করিয়াছেন যে, তাহার জীবন ধারণে সহায়তা করে। অর্থাৎ খাদ্যের মুখাপেক্ষী করিয়াছেন। যাহা দ্বারা তাহার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং তাহাদের থেকে স্বীয় আনুগত্য তলব করার জন্য। তাই এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে চিন্তা ফিকির সৃষ্টি করার জন্য। তিনি বলেন,

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ * مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مَا اُرِيْدُ اَنْ يُطْعِمُوْنَ * اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ *

"আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। আমি তাহাদের কাছে রিযক চাই না এবং তাহারা আমাকে আহার করাইবে আমি ইহাও চাই না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকই রিযকদাতা। শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান।"

এখানে আল্লাহ পাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি জ্বীন ও মানব জাতিকে শুধু নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে ইবাদত করিবার নির্দেশ দিবেন। যেমন কোন মনিব স্বীয় গোলামকে বলিল যে, হে গোলাম! আমি তোমাকে এইজন্য খরিদ করিয়াছি যে, তুমি আমার খেদমত করিবে। অর্থাৎ তোমাকে এই জন্য খরিদ করিয়াছি যে, আমি তোমাকে খেদমত করিবার নির্দেশ দিব আর তুমি সে নির্দেশ পালন করিবে।

আয়াতের ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যাহাতে মুতাযিলাদের অভিমত খণ্ডন হইয়া যায়। তাহাদের অভিমত খণ্ডনের বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

মুতাযিলা সম্প্রদায় উল্লেখিত আয়াতকে বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করে। তাহারা বলে যে, আল্লাহ পাক মাখলুক সৃষ্টি করিয়াছেন শুধু আল্লাহ পাকেরই ইবাদত করার জন্য; তাঁহার আনুগত্য করার জন্য। সুতরাং বান্দা যদি নাফরমানী ও কুফুরী করে তাহা বান্দা নিজের পক্ষ থেকে করে। সুতরাং বান্দার নাফরমানী ও কুফুরীর তার নিজেরই সৃষ্টি।

আমরা ইতিপূর্বে দলীল প্রমাণের দ্বারা এই অভিমত বাতিল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। এখানে তাহাদের যুক্তির বিপক্ষে আহলে সুন্নতওয়াল জামাতের পক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে। তাহা এই যে, ইচ্ছা দুই প্রকার। এক প্রকার ইচ্ছার সম্পর্ক হইল শরয়ী আহকামের সাথে। দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছার সম্পর্ক হইল সৃজনের সাথে। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন যে, তিনি মানব ও জ্বীন জাতি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা স্বীয় ইবাদতের ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার এই ইচ্ছা শরয়ী আহকামের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ তিনি তাহাদের দ্বারা ইবাদতের যে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা শরয়ী বিষয়। সুতরাং নাফরমানীর সৃষ্টির সাথে এই ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নাই। অবশ্য নাফরমানী ও ফরমাবরদারী উভয়ের সৃষ্টির সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগত ইচ্ছার সাথে। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই বলেন,

و الله خلقكم و ما تعملون *

"আল্লাহ পাক তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা যাহা আমল কর তাহাও সৃষ্টি করিয়াছেন।"

কিন্তু মুতাযিলারা বলে যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত ইচ্ছার সম্পর্ক সৃষ্টি করার সাথে। অথচ তাহাদের এই দাবীর পিছনে কোন দলীল নাই। মোটকথা,

অত্র আয়াতে মানব ও জ্বীন জাতির সৃষ্টির হেকমত বর্ণনা করার পিছনে উদ্দেশ্য হইল কি জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহা মানুষকে অবগত করানো। যাহাতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করার পিছনে আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষ অনবগত না থাকে। হেদায়েতের রাস্তা হইতে সরিয়া না পড়ে এবং হক আদায় করার বিবেচনা ছাড়িয়া না বসে।

এক হাদীছে আসিয়াছে যে, প্রতিদিন চার ফিরিশতা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিয়া থাকে। এক ফিরিশতা বলে যে, আফসোস! যদি এই জাতিদ্বয়কে আল্লাহ পাক সৃষ্টিই না করিতেন। দ্বিতীয় ফিরিশতা বলে, যখন তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে এখন যদি তাহারা জানিয়া লইত যে, তাহারা কেন সৃষ্ট হইয়াছে? তৃতীয় ফিরিশতা বলে, যদি তাহারা জানিত যে, তাহারা কেন সৃষ্ট হইয়াছে তাহা হইলে তাহারা নিজেদের জানা মোতাবেক আমল করিত। চতুর্থ ফিরিশতা বলে, যদি আমল না করিত তাহা হইলে কমপক্ষে বদ আমল হইতে তাওবা করিয়া লইত। অতএব আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, তিনি বান্দাদিগকে তাহাদের নিজেদের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই বরং এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা তাঁহার ইবাদত করিবে এবং তাঁহার তাওহীদে মশগুল হইবে। কেননা তুমি এইজন্য গোলাম খরিদ কর নাই যে, গোলাম নিজের কাজে লাগিয়া থাকিবে বরং তুমি এই জন্য গোলাম খরিদ করিয়াছ যে, গোলাম তোমার খেদমত করিবে। সুতরাং যাহারা নিজেদের পিছনে পড়িয়া আল্লাহর হক আদায় করা হইতে এবং প্রবৃত্তির পিছনে পড়িয়া মনিবের ফরমাবরদারীর ব্যাপারে অসতর্ক থাকে এই আয়াত তাহাদের এই ভুলের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই জন্যই ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) যখন শিকার করিতে বাহির হইলেন এবং ঘোড়ার উপর আরোহন করিলেন তখন অদৃশ্য থেকে এক আওয়াজ শুনিলেন। আর এই আওয়াজই তাহার তাওবার উপায় হইয়াছিল। অদৃশ্য থেকে প্রথমবার আওয়াজ দিয়া বলা হইয়াছে, হে ইবরাহীম! এই জন্যই কি তোমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে? তোমাকে কি ইহারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? পুনরায় আবার আওয়াজ আসিল, হে ইবরাহীম! তোমাকে এইজন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। আর তোমাকে ইহার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান যে স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে। আর তদানুযায়ী আমল করে। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝিতে পারিয়াছে সে সত্যিকার অর্থে দ্বীনের বুঝ পাইয়াছে সে খুব বড় নেয়ামত লাভ করিয়াছে।

দ্বীনের বুঝ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন যে,

রেওয়াতের আধিক্যের দ্বারাই দ্বীনের বুঝ অর্জিত হয় না বরং দ্বীনের বুঝ আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নূর যাহা আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। আমি শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)-এর কাছে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, এমন ব্যক্তি দ্বীনের বুঝ পাইয়াছে যাহার অন্তর চক্ষুর সম্মুখ থেকে পর্দা সরিয়া যায়।

সুতরাং যাহাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সৃষ্টির এই হেকমত বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ পাক তাহাকে শুধু নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজের খেদমতের জন্য বানাইয়াছেন। তাহার এই বুঝ তাহার জন্য দুনিয়া হইতে বিমুখ হইয়া আখেরাতের দিকে রুখ করিবার এবং স্বীয় নফসের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আখেরাতের ফিকির ও ইহার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে স্বীয় মালিকের হক আদায় করার মধ্যে লাগিয়া যাওয়ার উপায় হইয়া যাইবে। এক বুযুর্গের উক্তি, যদি আমাকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, তুমি মরিয়া যাইবে তাহা হইলে আমি নিজের মধ্যে কোন অস্থিরতা অনুভব করিব না। কেননা আমি তো আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছি।

কোন এক বুযুর্গকে তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিল, হে পুত্র! তুমি রুটি খাও না কেন? পুত্র জবাব দিল, "রুটি চাবাইতে এবং চর্বিত রুটি গলদকরণ করিতে যে সময় লাগে এই সময়ে পঞ্চাশটি আয়াত তিলাওয়াত করা যায়।" এই বালক এমন সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত যাহাদের মনকে কিয়ামতের দিবসের ভয়াবহ অবস্থা এবং আল্লাহ পাকের সাক্ষাতের ভয় এই দুনিয়া থেকে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার এই চিন্তা তাহাকে দুনিয়ার আরাম আয়েশ এবং অভিলাষের আনন্দ থেকেও দূর করিয়া রাখিয়াছে। একজন আরিফ বলেন, আমি মরক্কোতে কোন এক শায়খের কাছে গিয়াছিলাম। তিনি ঘরে ছিলেন। আমি তাহার ঘরে পৌঁছি। ওজুর প্রয়োজন হওয়ার পর ওজুর পানি উঠাইতে গেলাম। শায়খ নিজে আমার জন্য পানির ব্যবস্থা করিতে গেলেন। আমি তাহাকে বারণ করিলাম। আমার বারণ করা সত্ত্বেও তিনি বিরত হইলেন না। রশির এক মাথা স্বীয় হাতে বাঁধিলেন। যাহাতে বালতি হাত থেকে ছুটিয়া না যায়। যে কুঁয়া থেকে তিনি পানি উঠাইতে গেলেন ঐ কুয়ার কিনারে একটি যয়তুন গাছ ছিল। উহা ঘরের উপর একটি শামিয়ানার ন্যায় ছড়ানো ছিল। আমি বলিলাম, হযরত! আপনি রশির মাথা গাছের সাথে বাঁধেন না কেন?

শায়খ আশ্চার্য হইয়া বলিলেন, এখানে কি গাছ আছে? আমি তো এই ঘরে ষাট বৎসর যাবত জীবন যাপন করিতেছি। কিন্তু আমার তো খবরও নাই যে, এখানে একটি গাছও রহিয়াছে।

হে অন্বেষণকারী! এই ঘটনা বা অনুরূপ ঘটনাবলী কান লাগাইয়া শুন।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহ পাকের এমন বান্দাও আছে যাহাদিগকে আল্লাহ পাক নিজের দিকে মশগুল করিয়া সবকিছু হইতে বেখবর করিয়া দিয়াছেন। কোন জিনিস তাহাদিগকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করিতে পারে না। তাঁহার বড়ত্ব তাহাদের অন্তরকে নিজেদের সম্বন্ধেও আত্মবিস্মৃত করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার ভয় তাহাদেরকে হতবাক করিয়া ছাড়িয়াছে। তাঁহার প্রেম তাহাদের অন্তরে স্থান করিয়া লইয়াছে। আল্লাহ পাক যেন আমাদিগকেও তাহাদের দলভুক্ত করিয়া দেন এবং তাহাদের থেকে পৃথক না করেন।

অনুরূপ আরও একটি ঘটনা শুন, তাহা এই যে, সাঈদ নামক স্থানে কোন এক মসজিদে এক ওলী থাকিতেন। মসজিদের পার্শ্বে দুইটি খেজুর গাছ ছিল। তন্মধ্যে একটি গাছে শাখা ছিল লাল রংয়ের আর অপরটি ছিল হলুদ রংয়ের। তাঁহার খাদেম একটি গাছের একটি শাখা কাটিতে অনুমতি প্রার্থনা করিল। ওলী তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। খাদেম জিজ্ঞাসা করিল যে, কোন গাছ থেকে শাখা কাটিব? লাল শাখাবিশিষ্ট গাছ হইতে না হলুদ শাখা বিশিষ্ট গাছ হইতে? ওলী বলিলেন, বৎস! আমি চল্লিশ বৎসর যাবত এই মসজিদে থাকিতেছি। কিন্তু খেজুর গাছদ্বয় লাল বা হলুদ রংয়ের কিনা তাহা আমার খবর নাই।

অন্য এক বুযুর্গের ঘটনা। তাহার সন্তানাদি যখন ঘরে তাহার সামনে দিয়া চলাফেরা করিত তখন জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তাহারা কাহার সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে বলা না হইত যে, তাহারা তাহার সন্তান ততক্ষন পর্যন্ত তিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেন না। আল্লাহর প্রতি এত ধ্যানমগ্ন থাকিতেন যে, তিনি নিজের সন্তান পর্যন্ত চিনিতেন না।

এক বুযুর্গ নিজের সন্তানাদি সম্পর্কে বলিতেন যে, যদিও তাহাদের পিতা জীবিত আছে তবুও তাহারা ইয়াতীম।

এই সম্পর্কে এখন আরও দীর্ঘ আলোচনা করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে হইবে। তাই এই আলোচনা ছাড়িয়া মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনায় লিপ্ত হইতেছি।

প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

আল্লাহ পাক যখন বলিয়াছেন, "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে শুধু ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।" তখন আল্লাহ পাক অবশ্যই জানিতেন যে, মানবিক প্রয়োজন তাহাদের লাগিয়াই থাকিবে। প্রয়োজনের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজন পুরা করিতে হইবেই। ফলে ইবাদতের প্রতি একাগ্রতায় বিশৃঙ্খলা ও

ত্রুটি দেখা দিবে। তাই আল্লাহ্ পাক তাহাদের রিয্কের দায়িত্ব হাতে লইয়াছেন যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ পায় এবং রিয্ক অর্জনের পিছনে পড়িয়া ইবাদতে গাফেল না হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَ مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ *

"আমি তাহাদের কাছে ইহা চাই না যে, তাহারা নিজেরা নিজেদের রিয্কের ব্যবস্থা করুক।"

কেননা রিযক প্রদানের ক্ষেত্রে আমিই যথেষ্ঠ এবং এই ক্ষেত্রে আমার দায়িত্ব গ্রহণও তাহাদের জন্য যথেষ্ঠ।

وَ مَا أُرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُوْنَ *

"আমি ইহাও চাই না যে, তাহারা আমাকে আহার করাক।"

কেননা আমি শক্তিশালী, মুখাপেক্ষীহীন, আমার আহার করার প্রয়োজন হয় না। এই জন্য তিনি ইহার পর ইরশাদ করিয়াছেন,

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ *

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাকই রিযিকদাতা। শক্তিশালী।"

সারকথাঃ আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন, "যেহেতু আমি নিজে রিযিকদাতা, এই জন্য আমি চাইনা যে, বান্দা রিয্কের ফিকির করুক। যেহেতু আমি শক্তিশালী তাই আমি চাই না যে, বান্দা আমাকে আহার করাক। কেননা যাহার কাছে প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে সে আহার করার প্রয়োজনীয়তার মুখাপেক্ষী নহে।

মোটকথাঃ এই আয়াতে উল্লিখিত বিষয় হইতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাআলাই বান্দাদের রিয্কের যিম্মাদার। আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেন,

ان الله هو الرزاق *

পক্ষান্তরে ঈমানদারের জন্য অপরিহার্য হইল যে, ঈমানদার একমাত্র আল্লাহ্ পাককেই রিযকদাতা বিশ্বাস করে।

এই বিশ্বাসের সামান্য গন্ধও মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত না করে। এমনকি কোন প্রকার মাধ্যমের এবং বান্দার উপার্জনের সাথেও সম্পৃক্ত না করে।

এক হাদীছে আছে যে, এক রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,

তোমরা কি জান যে, তোমাদের পরোয়ারদিগার কি বলিয়াছেন? ছাহাবাগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা জানি না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ পাক বলেন, "আজ সকালে আমার কোন কোন বান্দা মোমেন আর কোন কোন বান্দা কাফের হইয়াছে। যাহারা বলে যে, আল্লাহ পাকের রহমত ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি। তাহারা আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। আর নক্ষত্রের প্রভাব অস্বীকার করিয়াছে। আর যাহারা বলে যে, চন্দ্রের অমুক কক্ষের কারণে অথবা অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি। তাহারা আমার সাথে কুফুরী করিয়াছে এবং নক্ষত্রের প্রতি ঈমান আনিয়াছে।"

অত্র হাদীছে ঈমানদারের জন্য বড় ফায়দা, একীনওয়ালাদের জন্য সূক্ষ্ম দর্শন আর আল্লাহ তাআলার প্রতি আদব প্রদর্শনের শিক্ষা রহিয়াছে। আশা করি মুমিনদের জ্যোতিষবিদ্যা এবং ইহার প্রভাব স্বীকারকারী থেকে বিরত রাখার জন্য অত্র হাদীছই যথেষ্ঠ।

জানিয়া রাখ যে, তোমার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ফয়সালা নির্ধারিত। তিনি যাহা ফয়সালা করেন তাহা অবশ্যই কার্যে পরিণত করেন। তাঁহার জ্ঞানও অপরিবর্তনীয়। তিনি যাহা জানেন তাহা প্রকাশ করেন। সুতরাং অদৃশ্যের জ্ঞানী এই মহান সত্ত্বার জ্ঞাত বিষয় জানার জন্য অনুসন্ধান চালানোর মধ্যে কি ফায়দা রহিয়াছে? জানিলেও যাহা হইবে না জানিলেও তাহাই হইবে। এক বান্দা অপর বান্দার অবস্থার পিছনে পড়িতে অর্থাৎ ইহার অনুসন্ধান চালাইতে আল্লাহ পাক নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, و لا تجسسوا "অন্যদের অবস্থার পিছনে পড়িও না।" ইহার পরও আল্লাহ পাকের জ্ঞাত বিষয়ের পিছনে পড়িয়া ইহা জানার জন্য অনুসন্ধান চালানো কিভাবে শোভনীয় হইতে পারে? এক কবি বলিয়াছেন-

مری جانب سے نجومی کو کهو + حکم کوکب کو نهی مین مانتا

جوخدا چاهے و هی هوگا ضرور + بالیقین اس امرکو هرون جانتا

"জ্যোতিষবিদকে আমার পক্ষ হইতে বল
নক্ষত্রের হুকুম আমি মানি না।
আল্লাহ পাক যাহা চান তাহা অবশ্যই হইবে
আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ইহাই জানি।"

ফায়দা ঃ ১। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে রায্যাক শব্দটি فعال ওজনে

গঠিত। আর فعال ওজন ব্যবহৃত হয় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে দোষগুণের অতিরিক্ততা বুঝানোর জন্য। যেমন, রায্যাক অর্থ অধিক রিযিকদাতা। আরবীতে এই অর্থে আরও একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা হইল 'রাযেক।'। রাযেক শব্দটি فاعل ওজনে গঠিত। শব্দের অর্থ রিযিক প্রদাতা। আয়াতে রাযেক শব্দ ব্যবহার না করিয়া রায্যাক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রায্যাক শব্দের অর্থ অধিক রিযিকদাতা। অধিক রিযিক প্রদান দুইভাবে হইতে পারে। এক, তিনি যাহাদের রিয্ক প্রদান করেন তাহাদের সংখ্যা অনেক। অথবা তাহার প্রদত্ত রিযক অনেক। তবে শব্দটি উভয় অর্থ বহন করারও সম্ভাবনা রাখে যে, তিনি অনেক লোককে অনেক রিয্ক প্রদান করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় ফায়দা ঃ প্রশংসা করার জন্য দুই প্রকারের শব্দ ব্যবহার করা যায়। এক প্রকার শব্দ হইল, গুণবাচক বিশেষ্য। অপর প্রকার ক্রিয়া। তবে প্রশংসা করার জন্য গুনবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার ক্রিয়ার ব্যবহার অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। অর্থাৎ ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশংসা করিলে যতটুকু প্রশংসা বুঝা যায়, ক্রিয়ার স্থলে গুণবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করিলেও তদাপেক্ষা অধিক ও স্থায়ী প্রশংসা বুঝা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ- কোন ব্যক্তির সৎকর্ম করার গুণের প্রশংসা করার জন্য ব্যবহৃত গুণবাচক বিশেষ্য হইল محسن আর ইহার জন্য ব্যবহৃত ক্রিয়া يحسن। সুতরাং যায়দের এই গুণের প্রশংসা করিতে زيد محسن বাক্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে। আবার زيد يحسن বাক্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে। উভয় বাক্যের মধ্যে زيد محسن বাক্যটি এই ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য এবং উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে স্পষ্ট নির্দেশক। কেননা গুণবাচক বিশেষ্য স্থায়িত্ব ও নিঃশেষ না হইয়া যাওয়ার অর্থ বহন করে। পক্ষান্তরে ক্রিয়া অস্থায়িত্বের অর্থ প্রকাশ করে। অতএব গুনবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করার অর্থ হইল যে, গুণান্বিত ব্যক্তির এই গুণটি স্থায়ী। এই হিসাবে ان الله هو الرزاق বাক্যটি ان الله هو يرزق বাক্যটি অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। কেননা পরবর্তী বাক্যে গুণবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় নাই বরং ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রথম বাক্যে গুণবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হইয়াছে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় নাই। আল্লাহ্ পাক যদি আয়াতে ان الله هو يرزق বলিতেন। তাহা হইলে আয়াত শুধু এতটুকু প্রমাণ করিত যে, আল্লাহ্ পাক রিযিকদাতা। "শুধু আল্লাহ্ পাকই রিযিকদাতা" ইহা প্রমাণ করিত না। অর্থাৎ রিযিক প্রদানের গুণ শুধু আল্লাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ইহা প্রমান করিত না। কিন্তু

আল্লাহ পাক ان الله هو الرزاق বলিয়াছেন। ইহা প্রমাণ করিতেছে যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই রিযক প্রদান করেন। ইহা অন্য কাহারও কাজ নহে। অন্য কেহ এই গুণের অধিকারী নহে। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক রিযকের আলোচনা করিতে গিয়া অন্য আয়াতে বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثم یُحْیِیْکُمْ *

"আল্লাহ পাক এমন সত্ত্বা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদিগকে রিযক দিয়াছেন। অতঃপর তোমাদের মৃত্যু দান করিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন।"

এই আয়াতে দুইটি ফায়দার কথা রহিয়াছে।

প্রথম ফায়দা ঃ এই আয়াতে আল্লাহ পাকের দুইটি বিশেষ গুণ এক সাথে উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি গুণ হইল আল্লাহ পাক সৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয়গুণ-তিনি রিয্কদাতা। এইগুণদ্বয়কে একসাথে উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তোমরা যেভাবে আল্লাহ পাককে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস কর এবং নিজেদেরকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া দাবী কর না অনুরূপভাবে তোমরা আল্লাহ পাককে রিয্কদাতা বলিয়াও বিশ্বাস কর এবং নিজেদেরকে রিযকদাতা বলিয়া দাবী করিও না। অর্থাৎ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক যেমন সম্পূর্ণ একা ও অদ্বিতীয়, অনুরূপভাবে রিযক প্রদানের বেলায়ও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাই আল্লাহ পাকের এই গুণদ্বয়কে একসাথে উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাতে বান্দাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে এই বিষয়ে দলীল কায়েম হয় এবং অন্য কাহাকেও রিযকদাতা বলিয়া মনে করার অবৈধতা ঘোষিত হয়। তাঁহার এহসানকে বান্দাদের এহসান বলিয়া মনে করার বেলায় বাধার সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ পাক সরাসরি সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার ও বান্দার মধ্যে সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে কোন মাধ্যম নাই। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক সরাসরি রিযকদাতা। রিযক প্রদানের ক্ষেত্রে তাহার ও বান্দার মধ্যে কোন মাধ্যম নাই।

দ্বিতীয় ফায়দা ঃ

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ *

"আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদিগকে রিযক দান করিয়াছেন।"

অত্র আয়াতে বলিয়া দিয়াছেন যে রিযকের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। আর

এই বিষয়টি পোক্ত হইয়াছে। এখন ইহাতে নতুন কোন কিছু সংযুক্ত হইবে না। তবে এখন উহা প্রকাশ পাইবে মাত্র। নতুন করিয়া নির্ধারিত হইবে না

রিযক শব্দটি রিযকের দুই পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য। এক পর্যায় হইল আল্লাহ পাক যখন রিযক নির্ধারন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্যায় হইল বান্দা অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর রিযক প্রকাশ পাওয়া শুরু হওয়া। অত্র আয়াতে উল্লিখিত রিযক শব্দ দ্বারা উভয় পর্যায়ের রিযকের কথা বুঝানোর সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং যদি এই শব্দ দ্বারা রিযকের প্রথম পর্যায়ের কথা বুঝানো হয় তাহা হইলে আয়াতে উল্লেখিত 'ছুম্মা রাযাকাকুম' বাক্যাংশে ব্যবহৃত 'ছুম্মা' শব্দটি স্বীয় অর্থে ব্যবহৃত হওয়া মুশকিল। কেননা 'ছুম্মা' শব্দের অর্থ "অতঃপর আয়াতের অর্থ দাঁড়াইবে।" আল্লাহ পাক তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর রিযক দিয়াছেন। অথচ এই পর্যায়ের রিযক বান্দার সৃষ্টির পূর্বেই অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে, এখানে 'ছুম্মা' শব্দটি উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু শব্দের আগপিছ বিবেচনা করিয়া। অর্থাৎ প্রথমে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর রিযকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 'ছুম্মা' ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, বাস্তবিক পক্ষে মানব সৃষ্টির পর রিযক নির্ধারিত করা হইয়াছে। কেননা রিযক নির্ধারিত হইয়াছে সৃষ্টির পূর্বে।

আর যদি রিযক শব্দটি ব্যবহার করিয়া রিযকের দ্বিতীয় পর্যায় বুঝানো হইয়া থাকে। অর্থাৎ বান্দার অস্তিত্ব লাভের পর তাহার জন্য রিযক প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা হইলে 'ছুম্মা' শব্দটি সঠিক অর্থে ব্যবহার হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা বান্দার সৃষ্টির পর রিযিক প্রদান করা বিবেকসম্মত কথা। এতদ্বসত্বেও আল্লাহ পাক রিযকের বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন গাফেলদের সতর্ক করার জন্য। মোটকথা যে উদ্দেশ্যে এই আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইল আল্লাহ পাকের জন্য উপাস্যতা প্রমাণ করা। যেন অত্র আয়াতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, হে গায়রুল্লাহের পুজারী! আল্লাহ পাক এমন এক সত্ত্বা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদের কাছে রিযক পৌঁছাইয়াছেন। পরে তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবেন। এইসব গুণাবলী কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও মধ্যে পাওয়া যায়? কোন মাখলুকের মধ্যে কি এইসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকা সম্ভব? সুতরাং যে সত্ত্বা এককভাবে এইসব গুণাবলীর ধারক। তাঁহাকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। প্রতিপালনে তাহাকেই অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা চাই। এই জন্যই আল্লাহ পাক বলেন-

هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ *

"তবে কি তোমরা আল্লাহর সাথে যাহাদিগকে শরীক করিতেছ তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, এই সর্ব কার্যের কোন একটা করিতে পারে? তাহারা আল্লাহর সাথে যে সকল শরীক করে তিনি তাহা হইতে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।"

রিযক সম্পর্কে তৃতীয় আয়াত হইল,

وَ أْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا * نَحْنُ نَرْزُقُكَ * وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى *

"হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ প্রদান করুন। আর ইহার উপর কায়েম থাকুন। আমি আপনার কাছে রিযক চাই না। বরং আমিই আপনাকে রিযক প্রদান করি। শেষ মঙ্গল তাকওয়ার জন্যই।"

অত্র আয়াতে কয়েকটি ফায়দার কথা রহিয়াছে।

প্রথম ফায়দা ঃ যদিও অত্র আয়াতে পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে উল্লেখিত হুকুম এবং ওয়াদা তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের সকলের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক বান্দাকেই বলা হইতেছে যে, "হে বান্দা! তুমি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম কর এবং নিজেও ইহার উপর কায়েম থাক। আমি তোমার কাছে রিযক চাই না। বরং আমি তোমাকে রিযক প্রদান করি। আর জানিয়া রাখ যে, শেষ পর্যন্ত মঙ্গল তাকওয়ার জন্যই।"

যখন তুমি এতটুকু বুঝিতে পরিয়াছ, এখন শুন! আয়াতের সারকথা হইল, হে বান্দা! আল্লাহ তাআলা তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি স্বীয় পরিবার পরিজনকে নামাযের হুকুম কর। কেননা, যেভাবে দুনিয়াবী মাল আসবাবের দ্বারা স্বীয় পরিবার পরিজনের সাথে সদাচরণ করা, তাহাদের প্রয়োজনাদির প্রতি খেয়াল রাখা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে তাহাদের উপর এমনভাবে মেহনত করাও ওয়াজিব যাহাতে তাহারা আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে এবং তাঁহার নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকে। তোমার পরিবার-পরিজনকে যেভাবে পার্থিব দিক দিয়া তোমার উপর অধিকার রাখে অনুরূপভাবে পরকালীন বিষয়েও তোমার দ্বারা লাভবান হওয়ার অধিকার রাখে।

অধিকন্তু তাহারা তোমার অধীনস্থ প্রজার ন্যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته *

"তোমরা সকলেই যিম্মাদার এবং সকলেই নিজেদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।"

অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক বলেন,

وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ *

"তুমি স্বীয় নিকটবর্তী বংশধরদিগকে ভয় প্রদর্শন কর।"

যেমন উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ *

"আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করুন।"

দ্বিতীয় ফায়দা ঃ লক্ষ্য কর! আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে নির্দেশ দিয়াছেন স্বীয় পরিবার পরিজনকে নামাযের হুকুম করার জন্য আর নিজেও নামাযের উপর কায়েম থাকার জন্য। কিন্তু স্বীয় পরিবার পরিজনকে নামায পড়ানোর জন্য চেষ্টা করার বিষয়টি অত্র আয়াতের বিশেষ বিষয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টি মূলতঃ মুখ্য হইলেও অত্র আয়াতে গৌণ বা অধীনস্থ। কারণ বান্দাতো নিঃসন্দেহে অবগত আছে যে, তাহার প্রতি তো নামাযের নির্দেশ রহিয়াছেই। কাজেই সে ইহা সঠিকভাবে পালন করিতে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু অন্যকে নামায পড়ার হুকুম করাও কর্তব্য বলিয়া মনে না করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই আল্লাহ পাক বান্দাকে এই বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য এই নির্দেশ দিয়াছেন। এই হিসাবে অন্যকে নামায পড়ার হুকুম করার বিষয়টি এই স্থানে মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু সরাসরি বান্দাকে নির্দেশ না করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ করিয়াছেন। যাহাতে অন্য লোকেরা ইহা শুনিয়া তাঁহার অনুকরণ করে এবং নামাযের দিকে দৌড়াইয়া আসিয়া নামায কায়েম করে।

সতর্কতা ঃ স্বীয় পরিবার-পরিজন যেমন স্ত্রী-পুত্র, দাসী বান্দী প্রভৃতিকে নামায পড়ার হুকুম করা তোমার জন্য ওয়াজিব। নামায না পড়ার কারণে তাহাদিগকে মারপিট করাও জায়েয। যদি তুমি বল যে আমি তো তাহাদিগকে নামায পড়ার কথা বলিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা আমার কথা শুনে নাই। আল্লাহ

পাকের কাছে তোমার এইসব ওজর আপত্তি কবুল হইবে না।

যদি তোমার পরিবার পরিজন বুঝিতে পারে যে, তোমার খাদ্যবস্তু নষ্ট হইয়া গেলে বা তোমার কোন কার্য অসম্পাদিত থাকিয়া গেলে তোমার যতটুকু কষ্ট লাগে, তাহারা নামায না পড়িলে তোমার ততটুকু কষ্ট লাগে। তাহা হইলে তাহারা কখনও নামায পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু তাহারা তো সর্বদা দেখিতেছে যে, তুমি তাহাদের থেকে তোমার নিজের হক তো তলব করিতেছ কিন্তু আল্লাহর হক তলব করিতেছ না। এইজন্য তাহারা এইসব হক আদায় করার প্রতি কোন খেয়ালই করিতেছে না। যে ব্যক্তি নিজে পাবন্দীর সাথে নামায আদায় করে কিন্তু তাহার পরিবারের লোকেরা নামায পড়ে না। সে তাহাদিগকে নামায পড়ার তাগিদও করে না। এমন নামাযী লোককেও কিয়ামতের দিনে এমন সব লোকদের দলভুক্ত করা হইবে যাহারা নামায পড়ে না। যদি কেহ এইক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, আমি তো তাহাদিগকে নামাযের কথা বলিয়াছি কিন্তু তাহারা নামায পড়ে না। আমি তাহাদিগকে নসীহত করিয়াছি কিন্তু তাহারা মানে না। আমি তাহাদিগকে মারপিট করিয়া শাস্তি দিয়াছি কিন্তু তাহারা সোজা হয় না। এখন আমি কি করিতে পরি? তাহা হইলে তাহার এই আপত্তির জবাবে আমি বলিব যে, এই ধরণের লোকদের মধ্যে যাহাকে তালাক দিয়া বা বিক্রি করিয়া তাহার থেকে পৃথক হওয়া সম্ভব হয়, তাহাকে তালাক দিয়া বা বিক্রি করিয়া তাহার থেকে পৃথক হইয়া পড়। যাহার থেকে এইভাবে পৃথক হইয়া পড়া সম্ভব নহে, তাহার থেকে মুখ ফিরাইয়া লও। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দাও। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাহারও থেকে পৃথক হওয়া আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার নামান্তর।

তৃতীয় ফায়দা ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, و اصطبر عليها "এবং আপনি নামাযের উপর ধৈর্যধারণ করুন ও নামাযে কায়েম থাকুন।" ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নামাযে কিছু কষ্ট রহিয়াছে। যাহা নামাযীর জন্য ভারী মনে হয়।

কেননা মানুষ নিজেদের কাজকর্ম ও ব্যস্ততার সময় নামাযে হাযির হইতে হয়। আর নামাযের চাহিদা হইল নামাযী সব কিছু ছাড়িয়া যেন আল্লাহ পাকের সামনে হাযির হয় এবং গায়রুল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। লক্ষ্য করিয়া দেখ কেমন মজাদার ও আরামদায়ক নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ফজরের নামাযে হাযির হইতে হয়। আর আল্লাহ পাকও নির্দেশ করিতেছেন যে, আমার হক আদায়

করিবার জন্য নিজেদের হক এবং আমার উদ্দেশ্য পুরা করিতে নিজেদের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ কর। এই জন্যই বিশেষ করিয়া ফজরের নামাযের মধ্যে দুই বার الصلوة خير من النوم "নিদ্রা হইতে নামায উত্তম" বলিতে হয়। অনুরূপভাবে জোহরের নামায ও দুপুরের আহারের পর আরাম করিবার এবং কষ্ট পরিশ্রম হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় উপস্থিত হয়। আছরের নামাযও এমন এক সময় আসে যখন মানুষ ব্যবসা-বানিজ্য বা অন্যান্য কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। মাগরিবের নামায আসে যখন মানুষ কাজকর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত পা ও শরীর পরিস্কার করিয়া আহার করিতে প্রস্তুত হয়। আর অবশিষ্ট রহিল ইশার নামায। তাহাও এমন সময় উপস্থিত হয় যখন সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পরে ক্লান্তি ছাইয়া ফেলে। এই জন্যই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, و اصطبر عليها "এবং নামাযে ধৈর্যধারণ কর ও কায়েম থাক।" তিনি আরও বলিয়াছেন,

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى *

"সমস্ত নামাযের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ। বিশেষ করিয়া আছরের নামাযের উপর।" অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا *

"ঈমানদারদের জন্য নামায নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হইয়াছে।"

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ *

"তোমারা নামায কায়েম কর।"

নামাযের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার মধ্যে বন্দেগীর কষ্ট নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার গুরুত্ব প্রদান মানবীয় চাহিদার পরিপন্থী। নিম্নোক্ত আয়াতই ইহার যথেষ্ট দলীল।

وَ اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ *

"এবং তোমরা ধৈর্যধারণ ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই নামায খুব ভারী। তবে বিনয়ীদের জন্য নহে।"

অত্র আয়াতে ধৈর্যধারণ এবং নামায এক সাথে উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে নামাযের মধ্যে কয়েক প্রকার ধৈর্যধারণ রহিয়াছে। এক, ইহার ওয়াক্তের পাবন্দী করিয়া ধৈর্যধারণ করা। দুই, নামাযের ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ পালন করার ধৈর্যধারণ। তিন, গাফলতি দূর করার মাধ্যমসমূহের উপর

ধৈর্যধারণ করা। এই জন্যই ইহার পরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে و انها لكبيرة الا على الخاشعين। এখানে একবার নামাযের কথা উল্লেখ করার পর আবার নামাযের সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ধৈর্যধারণ সম্পর্কে দ্বিতীয় বার বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। কেননা যদি ধৈর্যধারণের বর্ণনা করা হইত তাহা হইলে انه لكبير বলা হইত। কেননা নামায যে আরবী শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহা হইল সালাত (صلوة) আর ধৈর্যধারণ যে আরবী শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহা হইল সবর (صبر)। আরবী ভাষাতে সালাত শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ আর সবর শব্দটি পুংলিঙ্গ। আর (ها) (হা) সর্বনামটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং (ه) 'হু' সর্বনামটি পুংলিঙ্গ। সুতরাং নামাযের জন্য ব্যবহৃত হয় সর্বনাম 'হা' আর সবরের জন্য ব্যবহৃত হয় সর্বনাম 'হু'। অত্র আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে 'হা' সর্বনাম। 'হু' সর্বনাম ব্যবহৃত হয় নাই। বুঝা গেল পরবর্তীতে নামাযের বর্ণনা আসিয়াছে। ধৈর্যধারণের বর্ণনা আসে নাই।

অধিকন্তু উপরোক্ত বর্ণনা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, নামায ও ধৈর্য ধারণ একে অপরের জন্য অপরিহার্য। যেন উভয় একই জিনিস। কেননা انها لكبيرة বাক্যে ব্যবহৃত হা (ها) সর্বনাম দ্বারা উভয়ের প্রত্যেকের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। একই সর্বনাম দ্বারা দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটির দিকে ইঙ্গিত করার উদাহরণ কুরআনের অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। যেমন একস্থানে রহিয়াছে-

و الله و رسوله احق ان يرضوه *

"আল্লাহ ও তদীয় রাসূল অধিক হকদার যে বান্দারা তাঁহাদের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করে।"

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ *

"যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং তাহা (স্বর্ণ ও রৌপ্য) আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না।"

অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

وَ اِذَا رَاَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوا اِلَيْهَا *

"এবং যখন তাহারা কোন ব্যবসা অথবা কোন তামাসা দেখে তখন উহার (উহাদের প্রত্যেকটির) দিকে চলিয়া যায়।"

উল্লিখিত আয়াতত্রয় উদাহরণ হিসাবে এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রত্যেকটি আয়াতে দুইটি জিনিসের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক আয়াতে দুইটি জিনিসের প্রতি নির্দেশ করিবার জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে। সর্বনাম একবচন ব্যবহার করিলেও উদ্দেশ্য উভয় জিনিস। উভয়ের জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে উভয়ের মধ্যে অপরিহার্যতার সম্পর্ক বিদ্যমান বলিয়া। উদাহরণ স্বরূপ يرضوه শব্দে ব্যবহৃত সর্বনাম একবচন। কিন্তু এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল উভয়কে বুঝানো হইয়াছে। لا ينفقونها শব্দে ব্যবহৃত সর্বনাম 'হা' একবচন সর্বনাম। কিন্তু এই সর্বনাম দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় বুঝানো হইয়াছে। انفضوا اليها শব্দে ব্যবহৃত সর্বনাম 'হা' একবচন। কিন্তু এই সর্বনাম দ্বারা ব্যবসা ও তামাসা উভয় বুঝানো হইয়াছে। অনুরূপভাবে আমাদের আলোচ্য আয়াতে انها لكبيرة বাক্যাংশে ব্যবহৃত সর্বনামও একবচন। সালাত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে নামাযের দিকে ফিরানো হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু নামায ও ধৈর্যধারণের মধ্যে অপরিহার্যতার সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই একবচন সর্বনাম দ্বারা উভয়কে বুঝানো হইয়াছে।

বিশেষ ফায়দার আলোচনা

নামাযের মর্যাদা খুঁব উচ্চ। আল্লাহ পাকের কাছে ইহার মূল্য অনেক। এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ *

"নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ জিনিস থেকে বিরত রাখে।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, আমলের মধ্যে উত্তম আমল কোনটি? তিনি জবাবে বলিলেন, ওয়াক্ত মোতাবেক নামায পড়া। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করিয়াছেন যে, "নামাযী স্বীয় প্রভুর সাথে কানে কানে কথা বলে।" তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন, "বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য হাসিল করে সিজদা করার সময়।" আমরাও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, নামাযের মধ্যে বিভিন্ন ইবাদত এত পরিমাণে একত্রিত হইয়াছে যে অন্য কোন আমলে এত বেশী ইবাদত একত্রিত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ পবিত্র থাকা, দুনিয়াবী কথাবার্তা হইতে চুপ থাকা, কেবলার দিকে রূখ করা, তকবীর বলিয়া নামায শুরু করা, কুরআন পাঠ করা, দাঁড়াইয়া নামায পড়া, ঝুঁকিয়া যাওয়া, সিজদা করা, রুকু করা, সিজদার মধ্যে আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করা, সিজদাতে দোয়া পড়া। অনুরূপভাবে আরও অনেক ইবাদত নামাযে হইয়া

থাকে। সুতরাং নামাজ বিভিন্ন ইবাদতের সমষ্টি। কেননা যিকির করা একটি পৃথক ইবাদত, শুধু কুরআন পাঠ করা একটি পৃথক ইবাদত। অনুরূপভাবে তাসবীহ, দোআ, রুকু, সিজদা, দাঁড়াইয়া নামায পড়া। ইহাদের প্রত্যেকটি আমল পৃথক পৃথক ইবাদত। যদি আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত তাহা হইলে নামাযের রহস্য ও ভেদ এবং নূর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতাম। এখানে এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। "আলহামদুলিল্লাহ।"

চতুর্থ ফায়দা ঃ আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا * نَحْنُ نَرْزُقُكَ *

অর্থাৎ আমি তোমার কাছে ইহা চাই না যে, তুমি নিজকে নিজে রিযক প্রদান কর এবং স্বীয় পরিবার পরিজনকে রিযিক প্রদান কর। আমি তোমাকে এই নির্দেশ কিভাবে দিতে পারি? তুমি নিজকে রিযিক প্রদান করিবে এই দায়িত্ব তোমার উপর কিভাবে অর্পিত হইবে? অথচ তুমি ইহার শক্তি রাখ না। অধিকন্তু তোমাকে খেদমত করার জন্য বলা এবং তোমার রিযকের ব্যবস্থা না করা কি আমার মর্যাদা হইতে পারে? তাহার এই কথা যেন এমন হইল যে, যখন তিনি জানিলেন যে, মানুষ রিয্ক উপার্জনে লাগিয়া গেলে তাহার সর্বক্ষণ ইবাদতে লাগিয়া থাকার মধ্যে ত্রুটি দেখা দিবে এবং ইবাদতের জন্য সময় অবসর করিয়া লওয়ার ফিকিরের পথে বাধার সৃষ্টি হইবে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,

وَ امُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا * نَحْنُ نَرْزُقُكَ *

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইলেও উদ্দেশ্য হইল অন্যান্য লোকদিগকে শুনানো। উল্লিখিত আয়াতের সারকথা হইল তোমরা আমার নির্দেশ পালন কর। আমি তোমাদের জন্য রিযকের ব্যবস্থা করিব। সুতরাং এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তন্মধ্যে একটির দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজে গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি খারাপ ধারণা রাখিও না। তাহা হইল রিযিক। (অর্থাৎ আল্লাহ পাক রিযিকের দায়িত্ব লইয়াছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদের রিয্ক প্রদান করিবেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি এই ধারণা পোষণ করিও না যে, তিনি তোমাকে উপবাস রাখিবেন।) দ্বিতীয়টি আল্লাহ পাক তোমার কাছে তলব করিতেছেন। ইহা কখনও ছাড়িবে না। তাহা হইল ইবাদত। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বধীন থাকার পরও জীবিকা উপার্জনে

লাগিয়া গিয়া আল্লাহ্‌ বান্দার কাছে যাহা চাহিতেছেন উহা ছাড়িয়া বসে অর্থাৎ রিযিকের পিছনে লাগিয়া ইবাদত ছাড়িয়া বসে। তাহা হইলে ইহা হইবে বড় রকমের অজ্ঞতা এবং অসতর্কতা। এই ধরণের লোককে জাগ্রত করিলেও জাগ্রত হয় না। বরং বান্দার জন্য উচিত আল্লাহ্‌ পাক বান্দার কাছে যাহা চাহিদা করেন বান্দা যেন তাহা পুরা করিতে লাগিয়া যায়। আর আল্লাহ্‌ পাক নিজে যে জিনিসের দায়িত্ব লইয়াছেন সে বিষয়ে বান্দা যেন চিন্তামুক্ত থাকে। কেননা এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌ পাক যখন নাস্তিকদের রিযক প্রদান করিতেছেন তখন মুমিনদিগকে কেন দিবেন না? আল্লাহর পক্ষ হইতে যখন কাফেরদের জন্য রিযক জারী রহিয়াছে তখন মুমিনদের জন্য জারী থাকিবে না কেন? অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং হে বান্দা! যখন তুমি বুঝিয়া লইয়াছ যে দুনিয়াতে তোমার যতটুকু প্রয়োজন রহিয়াছে আল্লাহ্‌ পাক যখন সে প্রয়োজন পুরা করার দায়িত্ব লইয়াছেন অতঃপর তিনি তোমার কাছে আখেরাতের উদ্দেশ্যে আমল চাহিতেছেন। এখন তোমার উচিত আখেরাতের জন্য আমল করা। আখেরাতের উদ্দেশ্যে আমল করার প্রতি তাগীদ দিয়া আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছেন-

تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى *

"পাথেয় গ্রহণ কর। কেননা উত্তম পাথেয় হইল তাকওয়া।"

আল্লাহ যে জিনিস তোমাকে প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তুমি নিজে কামাই করিবার প্রতি গুরুত্ব দিয়া যাহা তোমার কাছে তিনি চাহিতেছেন উহা আদায় করার প্রতি অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছ ইহা তোমার কেমন বিবেক? এই সম্পর্কে এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌ পাক আমাদের পার্থিব প্রয়োজনের দায়িত্ব লইয়াছেন আর আমাদের আখেরাতের প্রয়োজন আমাদের কাছে তলব করিয়াছেন। কিন্তু যদি তিনি আমাদের পার্থিব প্রয়োজন পুরা করার দায়িত্ব আমাদিগকে প্রদান করিয়া আখেরাতের প্রয়োজন পুরা করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে কত ভাল হইত।

نحن نرزقك আয়াতাংশে ব্যবহৃত ক্রিয়াটি মোজারে। আরবী ভাষায় যে শব্দ রূপ দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের অর্থ প্রকাশ করা হয় উহাকে মোজারে বলা হয়। কোন কাজ সর্বদা হয় বা বার বার হইতে থাকে এই অর্থ প্রকাশের জন্য আরবী ভাষাবিদগণ মোজারে শব্দরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আরবী ভাষাতে আরও একটি শব্দরূপ রহিয়াছে যাহাকে 'মাযী' বলা হয়। মাযী শব্দরূপ এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেখানে উদ্দেশ্য হয় কোন কাজ অতীতকালে হইয়াছে বলিয়া বুঝানো। সুতরাং انا اكرمك বাক্যে ব্যবহৃত اكرم (উকরিমু) ক্রিয়াটি

মোজারে। আর اكرمتك বাক্যে ব্যবহৃত اكرمت (আকরামতু) ক্রিয়াটি মাযী। সুতরাং انا اكرمك আর اكرمت উভয়ের অর্থ এক নহে বরং انا اكرمك অর্থ আমি তোমাকে বার বার সম্মান করিতেছি। আর اكرمتك অর্থ আমি অতীতকালে তোমাকে সম্মান করিয়াছি। ইহাতে বার বার সম্মান করার বা সর্বদা সম্মান করার অর্থ নিহিত নাই। সুতরাং نحن نرزقك অর্থ আমি তোমাকে বার বার সর্বদা রিযিক প্রদান করিতেছি। স্বীয় অনুগ্রহ হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিতেছি না। তোমার জন্য আমার এহসান বন্ধ হইবে না। যেভাবে আমি বান্দাদের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রতি এহসান করিয়াছি অনুরূপভাবে তাহাদের জন্য আমার সার্বক্ষণিক সাহায্যের ব্যবস্থাও করিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, و العاقبة للتقوى "শেষ কল্যাণ তাকওয়ার জন্য।" অত্র আয়াতের সারকথা এই যে, হে বান্দারা যখন তোমরা দুনিয়াবী আসবাব হইতে মুখ ফিরাইয়া এবং তোমাদের বিভিন্ন পার্থিব প্রয়োজন পরিত্যাগ করিয়া আমার খেদমতে লাগিয়া থাকিবে আমার আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করিবে তখন জানিয়া রাখ যে, হয়তোবা তোমরা বাদশাহের ন্যায় রিযক লাভ করিবে না। আর ব্যস্ততামুক্ত ব্যক্তির ন্যায় আরাম আয়েশ পাইবে না। কিন্তু তখন নিজেদের অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করিও। কেননা শেষ কল্যাণ তো তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য নির্ধারিত। যেমন আল্লাহ পাক এই আয়াতের প্রথম দিকে বলিয়াছেন-

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى *

"এবং আপনি স্বীয় নেত্রদ্বয় ঐ জিনিসের দিকে প্রসারিত করিবেন না যাহার দ্বারা আমি কাফেরদের দলগুলোকে লাভ পৌছাইয়াছি। ইহাতো দুনিয়ার জীবনের চমকমাত্র। আমি তাহাদিগকে ইহা দিয়াছি যাহাতে আমি তাহাদিগকে ইহার ফেতনায় নিক্ষেপ করিতে পারি। আপনার পরোয়ারদিগারের রিযকই উত্তম ও স্থায়ী।

এক প্রশ্ন ও সমাধান

যদি কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তাকওয়াকে বিশেষ করিয়া আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত করা হইয়াছে কেন? যেমন আয়াতে বলা হইয়াছে و العاقبة للتقوى অথচ তাকওয়া অবলম্বনকারী যেভাবে আখেরাতের কল্যাণ লাভ করে অনুরূপভাবে দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে। সে দুনিয়ার জীবনেও মজার জীবন পাইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً *

"যে কোন পুরুষ বা নারী নেক আমল করে এবং সে ঈমানদার হয়। তাহা হইলে আমি তাহাকে অবশ্যই পবিত্র জিন্দেগী দান করিব।"

অত্র আয়াতে দুনিয়াতেই কল্যাণকর পবিত্র হায়াত দানের ওয়াদা রহিয়াছে। সুতরাং কিভাবে তাকওয়াকে আখেরাতের কল্যাণের সাথে খাছ করা হইল?

প্রশ্নের সমাধান ঃ আল্লাহ পাক মানুষের বিবেক বুঝ মোতাবেক কথা বলেন। যেমন, মানুষের সাধারণ ধারনা যে বদ আমল ও সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে দুনিয়া আর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য রহিয়াছে পরকালীন মঙ্গল। সুতরাং আল্লাহ পাকের এই বাণীর অর্থ- হে বান্দারা! যেহেতু তোমরা এই ধারণা করিয়া আছ যে, বদ আমল ও সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ আর তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য রহিয়াছে আখেরাতের কল্যাণ। সেহেতু আমিও বলিতেছি যে, তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য আখেরাতের কল্যাণ রহিয়াছে।

অনুরূপ আরও অনেক উদাহরণ রহিয়াছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের বিবেক ও বুঝ অনুযায়ী কথা বলিয়াছেন। যেমন الله اكبر। "আল্লাহ সকলের চেয়ে বড়।" আল্লাহ সকলের চেয়ে বড় ইহার বলা অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। কিন্তু মানুষ আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শনগুলির বড়ত্ব অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাঁহার কুদরতের নিদর্শনসমূহের বড়ত্ব সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন-

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ *

"নিশ্চয়ই আসমান যমীনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বড় কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।"

যেন এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে যে তোমাদের কাছে তো এমনিতেই কোন কোন জিনিস বড় মনে হয়। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, তোমরা যে সব জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়া সবচেয়ে বড় বলিয়া মনে করিতেছ আল্লাহ পাক উহা অপেক্ষাও বড়। তিনি সকল বড় হইতেও বড়। অনুরূপভাবে ফজরের নামাযের আযানে الصلوة خير من النوم বলা হয়। "ইহার অর্থ নিদ্রা অপেক্ষা নামায উত্তম।" যদি বলা হইত যে নিদ্রার মধ্যে কোন মঙ্গল বা ভালাই নাই, তাহা হইলে মানব মনে প্রশ্ন দেখা দিত যে, ইহা কিভাবে হইতে পারে? অথচ নিদ্রাতে আরাম ও মজা রহিয়াছে। এইজন্য তাহাদের এই অভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইয়া বলা হইয়াছে যে আমরা তোমাদিগকে যে কার্যের দিকে আহবান

করিতেছি তাহা উত্তম ঐ কার্য অপেক্ষা যাহা হইতে তোমাদিগকে পৃথক করিতে চাহিতেছি। কেননা যে নিদ্রার দিকে তোমরা ঝুঁকিয়া আছ উহার স্থায়ীত্ব নাই। আর যে কার্যের দিকে তোমাদিগকে আহবান করিতেছি ইহার বিনিময় সর্বদা অবশিষ্ট থাকিবে। আল্লাহর কাছে যাহা রহিয়াছে উহা উত্তম এবং স্থায়ী।

একটি বড় উপকারী আলোচনা

আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে যাহাকে বিবেক বুঝ দেওয়া হইয়াছে অত্র আয়াত তাহাকে পথ নির্দেশ করিতেছে রিয্ক অনুসন্ধানের জন্য সে কোন রাস্তা অবলম্বন করিবে। সুতরাং যখন রিয্ক উপার্জনের পথ তাহার জন্য সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে তখন তাহার উচিত আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও ইবাদতে অধিক মনোযোগী হওয়া। কেননা অত্র আয়াত তো এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। তোমরা কি দেখিতেছ না যে আল্লাহ পাক নিজেই বলিতেছেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا * نَحْنُ نَرْزُقُكَ *

"আপনি পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করুন এবং নিজেও নামাযের উপর কায়েম থাকুন। আমি আপনার কাছে রিয্ক চাই না। বরং আমিই আপনাকে রিয্ক দিয়া থাকি।"

এখানে দুইটি বিষয় উল্লেখ করার পর আল্লাহ পাক রিয্কের ওয়াদা করিয়াছেন। একটি বিষয় হইল পরিবার পরিজনকে নামায পড়ানো। দ্বিতীয় বিষয় হইল নিজে নামাযের পাবন্দী করা। এই দুইটি বিষয় উল্লেখ করার পর আল্লাহ পাক বলেন, نحن نرزقك "আমিই আপনাকে রিয্ক প্রদান করিয়া থাকি।"

সুতরাং আহলে মারেফাত ব্যক্তি বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে, রিযকের রাস্তা যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন রিযক প্রদানকারীর সাথে সদ্ভাব সৃষ্টি করার দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা মোতাবেক আচরণ করার মাধ্যমে রিযকের রাস্তা খোলা উচিত। আখেরাত সম্পর্কে অন্ধ ও অসতর্ক ব্যক্তির ন্যায় না হওয়া উচিত। কেননা আখেরাত সম্পর্কে অন্ধ ও অসতর্ক ব্যক্তি যখন দেখিতে পায় যে, তাহাদের রিয্ক উপার্জনের পথ সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে তখন তাহারা আরও বেশী মেহনত পরিশ্রম করা শুরু করিয়া দেয়। গাফেল ও আল্লাহ ভোলা বিবেক বুদ্ধি লইয়া দুনিয়ার দিকে আরও অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে। আহলে মারেফাতের জন্য উচিত আল্লাহ পাক তাহাদিগকে যে পদ্ধতির নির্দেশ করিয়াছেন ঐ পদ্ধতির অনুসরণ করা। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন,

وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا *

"তোমরা ঘরের দরজা দিয়া প্রবেশ কর।"

যেহেতু আহলে মারেফাতের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে রিয্ক পাওয়ার দরজা হইল রিয্কদাতার অনুগত হওয়া। সুতরাং তাঁহার নাফরমানী করিয়া কিভাবে রিযক অর্জিত হইতে পারে? তাঁহার বিরোধিতা করিয়া কিভাবে তাঁহার অনুগ্রহের বৃষ্টি তলব করা যাইতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিয়ামত লাভ করা যায় না। তাঁহার অনুগত হওয়া ব্যতীত রিয্ক প্রার্থনা করা যায় না।

এক স্থানে আল্লাহ পাক পরিস্কার ঘোষণা দিয়াছেন যে,

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *

"যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে ভয় করে আল্লাহ পাক তাহার জন্য কোন না কোন রাস্তা খুলিয়া দেন এবং তাহাকে এমন স্থান হইতে রিযক প্রদান করেন যেখান থেকে রিয্ক পাওয়ার ব্যাপারে তাহার ধারণাও নাই।"

আল্লাহ পাক আরও বলেন-

لَوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا *

"যদি তাহারা সোজা রাস্তায় অটল থাকে তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে স্বচ্ছলতার পানি পান করাইব।"

অনুরূপ আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা থেকে বুঝা যায় যে, তাকওয়া উভয় স্থানের রিয্কের চাবি। দুনিয়ার রিয্কেরও চাবি আবার আখেরাতের রিয্কেরও চাবি।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ * وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰتَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ *

"যদি আহলে কিতাবরা (ইহুদী-খৃষ্টানরা) ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে আমি তাহাদের অপরাধসমূহ মাফ করিয়া দিতাম এবং নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিয়ামত বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইতাম। যদি

তাহারা তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বর্তমানে যে কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা (কুরআন) কায়েম রাখিত, তাহা হইলে তাহারা উপর হইতে এবং পায়ের নীচ হইতে আহার করিত।"

অর্থাৎ উপর হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইত আর যমীন হইতে ফসল উৎপন্ন হইত।

আল্লাহ্ পাক এখানে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যদি তাহারা ইঞ্জিল ও তাওরাত গ্রন্থকে কায়েম রাখিত অর্থাৎ ইহাদের আহকাম মোতাবেক আমল করিত তাহা হইলে তাহাদের উপর নীচ হইতে আহার মিলিত। অর্থাৎ আমি তাহাদের রিয্ক প্রশস্ত করিয়া দিতাম এবং সর্বদা তাহাদিগকে রিয্ক প্রদান করিতাম। কিন্তু আমি যাহা চাহিতেছি তাহারা তাহা করে নাই। এই জন্য তাহারা যাহা চায় আমি তাহা করি নাই। অর্থাৎ তাহারা আমার অনুগত হয় নাই আর আমিও তাহাদের রিয্ক প্রশস্ত করি নাই।

রিয্ক সম্বন্ধে চতুর্থ আয়াত

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ *

"যমীনের উপর যত প্রাণী রহিয়াছে আল্লাহ্ পাক উহাদের সকলের রিযিকের যিম্মাদার। তিনি ইহাদের স্থায়ীভাবে থাকার জায়গা ও অল্পদিন থাকার জায়গা সম্পর্কে অবগত আছেন। প্রকাশ্য গ্রন্থে সবকিছু বিদ্যমান আছে।"

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ পাক রিযকের যিম্মাদার হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছে এবং ঈমানদারদের অন্তর হইতে সর্বপ্রকার খটকা ও আশংকা মিটাইয়া দিয়াছে।

অত্র আয়াতে ঈমানদারদের এমন তাওয়াক্কুল উপহার দিয়াছে যে, যদি কখনও ঈমানদারদের অন্তরে কোন প্রকার খটকা এবং আশংকা আসিতে চায় তাহা হইলে তাহাদের ঈমান ও তাওয়াক্কুলের সেনাবাহিনী ইহাদের প্রতি হামলা চালাইয়া ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া ছাড়ে। যেমন আল্লাহ্ পাক তাহাদের সম্বন্ধে অন্য এক স্থানে ইরশাদ করিয়াছেন-

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ *

"বরং আমি হককে বাতিলের প্রতি ছুঁড়িয়া মারি। আর সে বাতিলের মগজ বাহির করিয়া ফেলে। অতঃপর বাতিল দূরীভূত হইতে থাকে।"

আল্লাহ্ পাক স্বীয় বাণী

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا *

দ্বারা স্বীয় বান্দাদের জন্য নিজের অভিভাবকত্বের ঘোষণা দিয়াছেন যাহাতে মহব্বতের সাথে তাঁহার সাথে বান্দাদের পরিচয় ঘটে। যদিও বান্দাদের রিয্ক প্রদান করা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব নয় তবুও তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও এহ্সানের দ্বারা তাহাদিগকে রিয্ক প্রদান করার দায়িত্ব লইয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ব্যাপক অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কোন বিশেষ শ্রেণীর নহে বরং সকল প্রাণীর রিযকের দায়িত্ব লইয়াছেন।

যেন আয়াত এই অর্থ বহন করিতেছে যে, হে বান্দা! আমার অভিভাবকত্ব ও রিযক প্রদান শুধু তোমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং ভূপৃষ্ঠের উপর যতগুলি প্রাণী চলাফিরা করে আমি সকলের যিম্মাদার ও রিযকদাতা। এখন আমার অভিভাবকত্বের প্রশস্ততা, আমার প্রভুত্বের মুখাপেক্ষীহীনতা এবং কুদরতের পরিধি আন্দাজ করিয়া দেখ। আমার অভিভাবকত্বের প্রতি নির্ভরশীল হও। আমাকে সমস্যার সমাধানকারী মনে কর। যখন তুমি অন্যান্য প্রাণীর বেলায় আমার ব্যবস্থা গ্রহণ, খেয়াল ও অভিভাবকত্ব দেখিতে পাইতেছ আর তুমি তো প্রাণীর মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান। সুতরাং তোমার ব্যাপারে আমার ব্যবস্থা, খেয়াল ও অভিভাবকত্ব তো আরও সুদৃঢ় হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং আমার অভিভাবকত্বের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার এবং আমার অনুগ্রহের আশা করার ক্ষেত্রে তুমি তো অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা আরও অধিক হকদার।

হে শ্রোতা! লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ পাক আদম সম্পর্কে কি বলেন-و لقد كرمنا بنى ادم "অর্থাৎ- আমি আদম সন্তানকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি। তাহাদিগকে অন্যান্য প্রাণীর উপরে এইভাবে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি যে, তাহাদিগকে স্বীয় ইবাদতের জন্য হুকুম করিয়াছি, বেহেশতে প্রবিষ্ট করার ওয়াদা করিয়াছি এবং স্বীয় দরবারে উপস্থিতির প্রতি আহবান জানাইয়াছি।

অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বনী আদম অধিক মর্যাদাবান হওয়া নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারাও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহা এই যে, সমস্ত মাখলুক বনি আদমের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর তাহাদিগকে আল্লাহর দরবারের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমি শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)-এর কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন যে, হে ইবনে আদম! আমি সবকিছু তোমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং তুমি অধীনস্থদের পিছনে পড়িয়া মালিককে ভুলিয়া যাইও না। আল্লাহ

পাক বলেন, وَ الْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ "এবং যমীন মাখলুকের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।"

অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন-

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ *

"আসমান ও যমীনের যাহা কিছু আছে ইহাদের সবকিছু তোমাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন।"

আমি হযরত শায়খ (রহঃ)-এর কাছে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, সমস্ত মাখলুক তোমার গোলাম। তাহাদিগকে তোমার কাছে লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। আর তুমি আল্লাহর দরবারের গোলাম। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا *

"আল্লাহ পাক এমন এক সত্তা যিনি সাত আসমান ও ইহার অনুরূপ সংখ্যক যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। যাহাতে তোমরা জানিতে পার যে, আল্লাহ পাক সমস্ত জিনিসের উপর শক্তিমান এবং তাঁহার জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।"

আল্লাহ পাক বলিয়াছেন যে, সমস্ত আসমান যমীন তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। সুতরাং ইহাদের সৃষ্টি তোমাদের জন্যই হইয়াছে। যখন তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে সমস্ত জগত তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাদের কোন কোনটি তোমাদের কাজে ব্যবহৃত হয় আবার কোন কোনটি তোমাদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়া তোমাদের উপকার করিয়া থাকে। এখন তোমাদের একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আল্লাহ পাক যে সকল জিনিস তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ইহাদের রিযক প্রদান করিতেছেন, সুতরাং তোমাদিগকে রিযিক দিবেন না ইহা কিভাবে হইতে পারে? তবে কি তুমি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি শুন নাই?

وَ فَاكِهَةً وَ اَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ *

"তিনি তোমাদের জন্য ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর ফায়দার জন্য ঘাস সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আয়াতে উল্লিখিত

وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا *

বাক্য আল্লাহ পাকের অভিভাবক হওয়ার অর্থের তাগিদ করিতেছে। অর্থাৎ এমন কোন প্রাণী নাই যাহার অবস্থা ও স্থান সম্পর্কে তিনি জানেন না; বরং সবকিছু জানেন। প্রত্যেকের কাছে তাঁহার প্রদত্ত রিযক পৌঁছে।

রিযক সম্বন্ধে পঞ্চম আয়াত

وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ *

"তোমাদের রিযক এবং তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হইয়াছে তাহা আসমানে রহিয়াছে। আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের শপথ যে, নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের বাক্যালাপের ন্যায় সত্য।"

ইহা এমন এক আয়াত যাহা ঈমানদারদের অন্তর হইতে সন্দেহ সংশয়সমূহ ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে একীনের নূর আরও ফর্সা করিয়া দিয়াছে। উল্লিখিত আয়াতে রিযক, রিযকের স্থান, শপথ, উপমা প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাতে অনেক উপকারী আলোচনা নিহিত রহিয়াছে। এক এক করিয়া এই সব বিষয়গুলি আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথম ফায়দা ঃ যেহেতু আল্লাহ পাক জানেন যে, মানুষ রিযকের ব্যাপারে অস্থিরচিত্ত ও পেরেশান। তাই তিনি বার বার ইহারই আলোচনা করিয়াছেন। কেননা ইহার বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক দিক বার বার অন্তরে উঁকি মারিয়া থাকে। তাই ইহা প্রতিরোধ করার জন্য রিযকের বার বার আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। অধিকন্তু কাহারও অন্তরে সন্দেহ ও সংশয় জমাট বাঁধিয়া গেলে উহা দূর করিবার জন্য বার বার দলীল বর্ণনা করার নীতিও প্রচলিত রহিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপঃ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্বন্ধে নাস্তিক ও কাফেররা সন্দেহ সংশয় করিতেছিল। আর তাহাদের মধ্যে সন্দেহ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। তাহারা বলিত যে, মানুষের পেশীগুলি যখন পৃথক পৃথক হইয়া পড়িবে, তাহার গঠন নষ্ট হইয়া মাটির সাথে মিশিয়া যাইবে। পোকামাকড় তাহার দেহের অস্থিমাংশগুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। এমতাবস্থায় সে কি করিয়া পুনরায় জীবন লাভ করিতে পারিবে? তাহাদের এই সন্দেহ ও সংশয় দূর করিয়া কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করা হইয়াছে।

তন্মধ্যে এক আয়াত এই যে,

وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ * قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ *

"এবং মানুষ আমার জন্য উদাহরণ বর্ণনা করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। সে বলে জরাজীর্ণ এই হাড়গুলি কে জীবিত করিবে? হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলিয়া দিন যে, এইগুলি এমন এক সত্ত্বা জীবিত করিবেন যিনি প্রথমে এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন।"

অন্য এক আয়াতে তিনি বলিয়াছেন, و هو اهون عليه "পুনরায় সৃষ্টি করা তাহার জন্য অধিকতর সহজ।"

তিনি আরও বলেন, ان الذى احياها لمحى الموتى "নিশ্চয় যে সত্ত্বা যমীনে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন তিনিই মৃতদিগকে জীবিত করিবেন।"

সুতরাং আল্লাহ পাক যখন দেখিলেন যে, মানুষ রিযকের ব্যাপারে অধিকতর কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন আল্লাহ পাক এই সম্পর্কে কয়েকটি দলীল পেশ করিয়া বিষয়টি মজবুত করিলেন যে, রিযক প্রদাতা একমাত্র আল্লাহ পাক। তিনিই ইহার যিম্মাদার। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করিয়াছি। আর কিছু আয়াত এই পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। যেহেতু আল্লাহ পাক মানুষের মনের অবস্থা জানেন। তাই তিনি কখনও বলেন, ان الله هو الرزاق "নিশ্চয় আল্লাহ পাকই রিযকদাতা।"

কখনও বলেন, اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ "আল্লাহ এমন সত্ত্বা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিযক প্রদান করিয়াছেন।"

কখনও বলেন, نحن نرزقك "আমিই আপনাকে রিয্ক দিয়া থাকি।"

কখনও বলেন,

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ *

"তবে ঐ সত্ত্বা যিনি তোমাদিগকে রিয্ক প্রদান করেন যদি তিনি রিযক বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তোমরা কি করিবে? এই ক্ষেত্রে তিনি আরও বলেন,

وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوْعَدُوْنَ *

"এবং আসমানে রহিয়াছে তোমাদের রিয্ক এবং তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে"

এই সব আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাতে বান্দার রিযকের পর্যায় বুঝে আসে (অর্থাৎ রিযক আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুত, না বান্দার দায়িত্বে অর্পিত?) আর রিযকের পর্যায় বুঝে আসার পর যেন বান্দার অন্তর অস্থিরতা মুক্ত হইয়া শান্ত হইয়া পড়ে। অথচ রিযকের পর্যায় বর্ণনা করা আল্লাহর জন্য জরুরী নহে। যেন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে এই ইরশাদ হইয়াছে যে, তোমাদের রিযকের পর্যায় বর্ণনা করা আমার উপর ওয়াজিব নয়। বরং তোমাদের রিযক আমার কাছে জমা আছে। যখন ইহার সময় আসিবে তোমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা বয়ান করিয়া দেওয়া আমার দায়িত্বে জরুরী নহে। ইহা সত্ত্বেও স্বীয় অনুগ্রহে ও দয়ায় ইহার পর্যায় বয়ান করিয়া দিয়াছি। যাহাতে রিযকের ব্যাপারে আমার প্রতি অধিক ভরসা হয় এবং সন্দেহ ও সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। রিযকের পর্যায় বর্ণনা করিয়া দেওয়াতে আরও একটি ফায়দা রহিয়াছে। তাহা এই যে, রিযক অন্বেষণকারীর নির্ভরতা মাখলুকের উপর হইতে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায় এবং হাকিকী বাদশাহ আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাহারও কাছে রিযক তলব না করে।

কেননা, যখন তোমার অন্তর কোন মাখলুকের কাছে রিযকের আশা করে অথবা কোন মাধ্যমের প্রতি তোমার নির্ভরতা আসিয়া পড়ে তখনই তোমার সামনে আল্লাহ পাকের ইরশাদ উপস্থিত হয়,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ *

"অর্থাৎ হে রিযকের অন্বেষণকারী! দুনিয়াতে যত মাখলুক রহিয়াছে সবই দুর্বল ও অক্ষম। তোমার রিযক তাহাদের কাছে নাই। তোমার রিযক তো আমার কাছে। আমি হেকমত ও কুদরতওয়ালা। এইদিকে খেয়াল করিয়াই কোন এক গ্রাম্য লোক উল্লিখিত আয়াত শ্রবণ করিয়া স্বীয় উট যবেহ করিয়া, সবকিছু ছাড়িয়া আল্লাহর দিকে চলিয়াছিল।

সে বলিতেছিল সুবহানাল্লাহ! আমার রিযক তো রহিয়াছে আসমানে আর আমি তাহা তালাশ করিতেছি যমীনে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, এই গ্রাম্য ব্যক্তি আল্লাহর এই কথাটি কেমনভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আর আল্লাহ পাকেরও ইহাই উদ্দেশ্য। তিনি চান যে, বান্দাদের সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্খা যেন তাঁহার দিকে মনোনিবিষ্ট হয় এবং তাঁহার কাছে যাহা আছে সেদিকে তাহাদের আগ্রহ পয়দা

হয়। যেমন, অন্য এক আয়াতে তিনি বলিয়াছেন-

وَ اِنْ مِنْ شَيْئٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ *

"এমন কোন জিনিস যাহার খাযানা আমার কাছে নাই এবং আমি নির্ধারিত পরিমাপ অপেক্ষা অধিক নাযিল করি না।"

ইহাও এইজন্যই বলিয়াছেন যাহাতে আমাদের শক্তি সাহস তাঁহার দরজার দিকে অগ্রসর হয় এবং অন্তর তাঁহার দরবারের দিকে ঝুঁকে। সুতরাং হে শ্রোতা! তুমি আসমানওয়ালা হও, উপরের দিকে খেয়াল কর; যমীনওয়ালা হইও না। নীচের দিকে খেয়ালী হইও না। এক উর্দূ কবি এই বিষয়ে একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল-

১। যখন কোন কমিনা হাত তোমাকে পানি না দেয়। তখন তুমি অল্পে তুষ্টির গুণে তোমার উদর ভর্তি রাখ।

২। যদিও তোমার দেহ মাটির উপর থাকে কিন্তু তুমি সাহস ও আশার দিক দিয়া উচ্চ আসমানে থাকিবে।

৩। প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া তো সোজা কিন্তু ইয্‌যত সম্মান নষ্ট করিয়া আবেদন করা বড় কঠিন।

আমি শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)-এর কাছে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, মাখলুকের থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা করা থেকে বিরত থাকা ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে আমি ইয্‌যত ও সম্মান দেখি নাই। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের ইরশাদ স্বরণ কর,

وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ *

"আল্লাহ, তদীয় রাসূল এবং মুমিনদের জন্য ইয্‌যত ও সম্মান।"

সুতরাং আল্লাহ পাক মুমিনকে যে ইযযত দান করিয়াছেন ইহার ফলে মুমিন স্বীয় ইচ্ছা এরাদাকে আল্লাহর দিকে মনোনিবিষ্ট করিয়াছে। তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াছে। অন্য কাহারও প্রতি করে নাই।

আল্লাহর সামনে তোমার লজ্জা করা উচিত এই জন্য যে, তিনি তোমাকে ঈমানের পোষাক পরিধান করাইয়াছেন। স্বীয় পরিচয়ের অলংকার দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন। এতদ্বসত্ত্বেও অসতর্কতা তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তুমি মাখলুকের প্রতি ঝুঁকিয়া রহিয়াছ। সৃষ্টিকর্তাকে ভুলিয়া গিয়াছ। তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যান্যদের কাছে অনুগ্রহ ও এহসান তলব করিতেছ।

যদি তোমার গাফেল মন তোমাকে বলে যে, তুমি স্বীয় প্রয়োজনাদি মাখলুকের কাছে প্রার্থনা কর, এই ক্ষেত্রে তোমার উচিত যে তুমি স্বীয় প্রয়োজন পুরা করার জন্য এমন এক সত্ত্বার কাছে যাও যাহার কাছে উক্ত মাখলুকও স্বীয় প্রয়োজন পুরা করার জন্য যায়। তুমি তোমার স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করিবার জন্য তোমার ঈমানকে বেকদর কর এবং ইহার আকাঙ্খা অর্জিত হওয়ার জন্য তুমি অপমানও লাঞ্ছিত হও। ইহা তোমার এই গাফেল মনের বড়ই প্রিয় চাহিদা। এই সম্পর্কে এক কবি বলেন, (বাংলা অনুবাদ প্রদত্ত হইল)

১। প্রবৃত্তি স্বীয় ইয্যত অর্জন করার জন্য

আমার অপমান ও লাঞ্ছনাকেও মানিয়া লইয়াছে।

২। সে আমাকে বলে তুমি ইয়াহইয়া ইবনে আকছামের কাছে প্রার্থনা কর।

কিন্তু আমি ইয়াহইয়ার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করিয়াছি।

আল্লাহর একত্ব, অদ্বিতীয়তা ও সর্বময় ক্ষমতার প্রতি মুমিনের বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকার পরও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও কাছে নিজের প্রয়োজন পুরা করার জন্য যাওয়া মুমিনের জন্য একবারেই অশোভনীয়। আল্লাহ পাক নিজেই ইরশাদ করেন-

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ *

"তবে কি আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যথেষ্ঠ নয়?"

স্বীয় প্রয়োজন পুরা করিবার জন্য মাখলুকের দ্বারস্ত হওয়া তো সকলের জন্যই অশোভনীয় তবে মুমিনের জন্য অধিক অশোভনীয়।

আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণী স্বরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ *

"হে ঈমানদাররা! তোমরা ওয়াদাসমূহ পুরা কর।"

আল্লাহ পাকের কাছে যে সব ওয়াদা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক ওয়াদা ইহাও যে, স্বীয় প্রয়োজন অন্য কাহারও সামনে পেশ করিবে না এবং আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করিবে। আর এই ওয়াদার কথা বুঝা যায় রূহের জগতের ওয়াদার দিনের ঘটনা হইতে। সেদিন আল্লাহ পাক সকল রূহগুলিকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন الست بربكم। "তবে কি আমি তোমাদের প্রতিপালক নহি?" তখন সকলে সমস্বরে তাঁহাকে প্রতিপালক বলিয়া স্বীকার

করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং ইহা কেমন কথা যে, তথায় তো তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়াছিল। তাঁহার একত্বকে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল। আর এখানে আসিয়া তাহা ভুলিয়া বসিয়াছে? অথচ তাহাদের প্রতি এখনও তাঁহার এহসানের বৃষ্টি বর্ষিত হইতেছে এবং তাঁহার অনুগ্রহ তাহাদিগকে অহরহ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

এক কবি বলেন, (ইহার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল।)

১। হে আল্লাহ! আমার অন্তর তোমার ঘর হইয়াছে।

এখন আর লাইলীরও স্থান নাই, শিরীরও স্থান নাই।

২। তোমাকে তো আমি প্রতিশ্রুতির দিনে চিনিতে পারিয়াছিলাম তবে এখন বৃদ্ধ বয়সে কি ভুলিয়া যাইব?

ইচ্ছা ও চাহিদা মাখলুক থেকে উর্ধ্বে রাখা হইল ফকিরী বা দরবেশীর মাপকাঠি। ইহার দ্বারা প্রকৃত মরদের (পুরুষ) পরিচয় হয়। ইচ্ছা এবং চাহিদাও ওজন করা যায়। পদার্থের ওজন করার বাস্তবতা তো সর্বজনস্বীকৃত। অনুরূপভাবে অবস্থা এবং দোষগুণেরও পরিমাপ করা যায়। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ *

"ইনসাফের সাথে ওজন কায়েম কর।"

যাহাতে সত্য স্বীয় সত্যসহ এবং বানোয়াটি স্বীয় ভেজালসহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বর্তমানে যে ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিবেন না। বরং একদিন অপবিত্র হইতে পবিত্রদের পৃথক করিয়া ফেলিবেন।

ফকীর দরবেশদের মধ্যে যাহারা বানোয়াটি অবলম্বন করিয়াছে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এইভাবে পরখ করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে দুনিয়ার প্রেম ও প্রবৃত্তির তাবেদারী যতটুকু রহিয়াছে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তাহা এইভাবে প্রকাশ পাইল যে, তাহারা দুনিয়াদারদের সামনে নিজেদেরকে অসম্মানিত করিতেছে। দুনিয়াদারদের সাথে নির্দ্বিধায় চলাফিরা, মিলামিশা করিতেছে। তাহাদের প্রতি নম্রতা দেখাইতেছে। নিজেদেরকে তাহাদের চাহিদা মোতাবেক পরিচালনা করিতেছে। ধাক্কা খাইয়াও তাহাদের দরজায় যাইতেছে। এমনকি তাহাদের কতককে এমনও দেখা যায় যে, তাহারা নববধুর ন্যায় নিজকে

সজ্জিত করিয়া রাখিতেছে। বাহ্যিক সাজসজ্জার ফাঁদে পড়িয়া আন্তরিক সংশোধন থেকে গাফেল হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ পাক তাহাদের উপর এক দাগ লাগাইয়া দিয়াছেন। ফলে তাহাদের ত্রুটিগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

যদি তাহারা আল্লাহর সাথে সত্য আচরণ করিত তাহা হইলে তাহাদিগকে আল্লাহর বান্দা বা আল্লাহওয়ালা বলা হইত। কিন্তু তাহাদের অসত্যতার পরিণামে তাহারা এই প্রশংসিত উপাধি লাভ হইতে দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। এখন তাহাদিগকে অমুক আমীরের শায়খ, অমুক আমীরের দরবারী ওস্তাদ বলা হয়।

তাহাদের প্রতি যে দাগ লাগানো হইয়াছে তাহা এই যে, প্রথমে তাহাদিগকে সম্পর্কযুক্ত করা হইত আল্লাহর দিকে, এখন করা হয় আমীরের বা বাদশাহের দিকে।

এই সকল বানোয়াট দরবেশরা মিথ্যুক। অন্যান্য লোক আল্লাহর ওলীদের সংস্পর্শে আসার পথে প্রতিবন্ধক। কেননা যে সকল সাধারন লোক তাহাদের অবস্থার সাথে পরিচিত তাহারা অন্যান্য আল্লাহওয়ালাদিগকেও এইসব ভণ্ড দরবেশদের সাথে তুলনা করিয়া দেখে। তাহাদিগকে আল্লাহওয়ালা হিসাবে গ্রহণ করার মাপকাঠি বানায়। ফলে সাধারন মানুষ সত্যিকার আল্লাহওয়ালা থেকে দূরে সরিয়া থাকে।

এই সব বানোয়াট দরবেশীর দাবীদাররা প্রকৃত আল্লাহওয়ালা যাচাইয়ের পথের পর্দা। তাওফীকের সূর্যের সামনে কালমেঘ। যেমন বিভিন্ন জিনিস ও আলো পর্দা ও মেঘের নীচে ঢাকা পড়িয়া যায় অনুরূপভাবে ভাল ভাল লোক এইসব মিথ্যুকদের মধ্যে ঢাকা পড়িয়া যায়।

এই সকল লোক বাহ্যিকভাবে সত্যিকার আল্লাহওয়ালাদের নাক্কারা বাজাইতেছে। তাহাদের নিশান হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ন্যায় পোশাক পরিধান করিয়া আছে। কিন্তু যখন হামলা হইবে তখন তাহারা পীঠ ফিরাইয়া খাঁড়া হইবে। অর্থাৎ পরীক্ষার সময় তাহাদের মিথ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহাদের মুখে রহিয়াছে তাকওয়ার দাবী। কিন্তু অন্তর তাকওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে খালি। তাহারা কি আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুনে নাই যে, আল্লাহ পাক বলেন-

لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ *

"আল্লাহ পাক সত্যবাদীদের সত্যতা যাচাই করিয়া লইবেন।"

তাহা হইলে তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ পাক যখন সত্যবাদীদের যাচাই করিবেন তখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন? তাহারা কি আল্লাহ পাকের এই ইরশাদ শুনে নাই? আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهٗ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *

"হে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি মুনাফিকদিগকে বলিয়া দিন যে, তোমরা নিজেদের কাজ করিয়া যাও; আল্লাহ পাক, তদীয় রাসূল এবং মুমিনগণ তোমাদের আমল দেখিতেছেন। অতিসত্ত্বর তোমরা দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানীর প্রতি ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর তোমাদের কৃতকার্য সম্পর্কে তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে।"

এইসব বানোয়াট দরবেশরা তো বাহ্যিকভাবে প্রকৃত আল্লাহওয়ালাদের আকৃতি ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু তাহাদের আমল উদ্দেশ্য প্রনোদিত। যেমন এক কবি বলেন-

خمے تو ایسے ھیں جیسے ان کے تھے + عورتوں ان عوریں کے ھیں سوا

میں قسم کھاتا ھوں ذات پاک کی + لوگ کرتے حج ھیں جس کے بیت کا

آگیا جب کوئی جیم بھی نکل + سامنے ھوکر کھڑا روتا رھا

"১। তাবুগুলি তো তাহাদেরই তাবুর ন্যায়

কিন্তু রমনীগুলি তাহাদের তাবুর রমনী নয়।

২। আমি এমন পবিত্র সত্ত্বার শপথ করিতেছি।

মানুষ যাহার ঘরে হজ্জ করে।

যখন কোন তাবু দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

উহার সামনে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে।"

সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, স্বীয় আকাঙ্খা মাখলুক হইতে উপরে রাখা (অর্থাৎ শুধু আল্লাহর কাছে আকাঙ্খা করা) তরীকতপন্থীদের সৌন্দর্য্য এবং হাকীকত অনুসারীদের নিদর্শণ। এই বিষয়ে আমাদের রচিত একটি কবিতা রহিয়াছে। (উহার বাংলা অনুবাদ নীচে প্রদত্ত হইল।)

সে যুগের দোষারূপ করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে বলিলাম যে, ইহা থেকে তোমার রূখ ফিরাইয়া লও।

এমন যুগের কেন দোষারূপ করিতেছ?

যাহার থেকে সামান্য পরিমান প্রয়োজন মিটানোর আশাও করা যায় না।

আমি অপরিচিত হইলে ক্ষতি কি?

চন্দ্র খোলা থাকে বা মেঘে ঢাকা থাকে তাহাতে চন্দ্রের ক্ষতি কি?

মানুষের থেকে স্বীয় ইয্যত বাঁচাইব না কেন?

কেন তাহারা আমার শাহানশাহী জাকজমক দেখিবে না?

আমি তাহাদের কাছে আমার অভাব কেন প্রকাশ করিব?

যেহেতু (তাহারা ও আমি) সকলেই তাকদীরের সামনে অপারগ।

সৃষ্টিকর্তা রিযকদাতা, সুতরাং এই রিযক মাখলুকের কাছে চাইব কেন?

যদি ইহা করি; তাহা হইলে ইহা হইবে সম্পূর্ণ জুলুম।

যদি এক অক্ষম অপর অক্ষমের কাছে ওজর আপত্তি ও স্বীয় অভাব প্রকাশ করে তাহা হইলে ইহা বড়ই কম হিম্মতের কথা।

আল্লাহ পাকের কাছে রিযক প্রার্থনা কর; যাহার দয়া সমস্ত মাখলুককে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার কাছেই আবেদন কর; স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল হইবে।

তাঁহার দরজা হইতে তুমি কখনও দূরে থাকিও না।

দ্বিতীয় ফায়দা ঃ আল্লাহ পাক বলিয়াছেন- و فى السمآء رزقكم এই আয়াতাংশের দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ আসমানে রিযক আছে। অর্থ- আসমানে রিযক নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ লওহে মাহফুজে তোমাদের রিযক নির্ধারিত আছে। এই অর্থে অত্র আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইল রিযক সম্বন্ধে মানুষকে নিশ্চিত করিয়া দেওয়া এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া যে তোমাদিগকে যে সকল বস্তু দ্বারা রিযক দেওয়া হয় তাহা আমার কাছে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তোমাদের অস্তিত্বের পূর্বেই স্বীয় গ্রন্থে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং তোমাদের অস্তিত্ব প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই ইহা নির্ধারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যসত্ত্বেও তোমরা এই ব্যাপারে কেন অস্থির হইতেছ? তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আমার কাছে আশ্রয় লইতেছ না এবং আমার ওয়াদার প্রতি নির্ভর করিতেছ না?

আয়াতাংশের সম্ভাবনাময় দ্বিতীয় অর্থ এখানে রিযক বলিয়া এমন সব মাধ্যমকে বুঝানো হইয়াছে যাহাদের সহায়তায় রিযক অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন,

পানি। যেমন আল্লাহ পাক অন্য এক স্থানে পানিকে অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্বের সহায়ক মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন-

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ * اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ *

"এবং আমি সমস্ত জীবিত জিনিস পানি দ্বারা বানাইয়াছি। তবুও কি তোমরা বিশ্বাস কর না?"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অত্র আয়াতের তাফসীর করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে এখানে রিয্‌ক শব্দ উল্লেখ করিয়া বৃষ্টি বুঝানো হইয়াছে। তাঁহার তাফসীর অনুসারে আয়াতাংশের এক অর্থঃ যে বস্তু তোমাদের রিযকের মূল তাহা আসমানে রহিয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ ঃ স্বয়ং বৃষ্টিই রিযক।

তৃতীয় ফায়দা ঃ রিযক উপার্জনে মানুষের ক্ষমতা রহিয়াছে- মানুষের এই দাবীতে মানুষকে অক্ষম ঘোষণা করাও এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইতে পারে। কেননা মানুষ বিভিন্ন উপায়ে রিযক উপার্জন করে। যেমন কৃষক জমির মাধ্যমে। ব্যবসায়ী ব্যবসার মাধ্যমে। দর্জি সেলাই কার্যের মাধ্যমে। অথবা অন্য যে কোন মাধ্যমে। আর এই সকল উপায় সরাসরিভাবে অথবা কোন স্তরের মাধ্যমে পানির উপর নির্ভরশীল। সাধারনভাবে মানুষ মনে করে যে, উল্লিখিত উপায়ের দ্বারাই মানুষ রিযক লাভ করে কিন্তু আল্লাহ পাক বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলে তাহাদের সকল উপায়ই বেকার ও অক্ষম। যেমন আল্লাহ পাকের ঘোষণা হইতেছে যে, তোমাদের অবলম্বিত এই সকল উপায় তোমাদিগকে রিযক প্রদান করে না বরং আমিই রিযক প্রদান করি। তোমাদের উপায়সমূহের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আমার নিয়ন্ত্রনে রহিয়াছে। কেননা, যে জিনিসের সাহায্যে তোমাদের উপায়সমূহ দুরস্ত থাকে এবং তোমাদের পরিশ্রম ফলপ্রদ হয় তাহা আমি অবতীর্ণ করিয়া থাকি। আর তাহা হইল পানি।

চতুর্থ ফায়দা ঃ অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন যে, "তোমাদের রিযক এবং তোমাদিগকে যাহার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে উভয় আসমানে আছে।" এখানে রিযকের সাথে প্রতিশ্রুত বিষয়কে একত্রে উল্লেখ করার মধ্যে একটি বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা হইল মুমিনদের বদ্ধমূল বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ পাক যাহার ওয়াদা করেন তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। তিনি যে সময়ে সংঘটিত করার ওয়াদা করিয়াছেন, তখনই সংঘটিত হইবে। অন্য কেহ শত চেষ্টা করিয়াও ইহা আগ পিছ করিতে পারিবে না। ইহা হস্তগত করিবার জন্য যে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন বেকার হইয়া যাইবে।

মোটকথা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রভাব এখানে খাটিবে না। যাহা ওয়াদা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই হইবে। ছুটিয়া যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

এই ব্যাখার আলোকে আল্লাহ পাকের ইরশাদের সারকথা দাঁড়ায় যেভাবে আমার ওয়াদাকৃত জিনিস আমার কাছে থাকার ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ সংশয় নাই, অনুরূপভাবে তোমার রিযক আমার কাছে মওজুদ থাকার ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমি আমার ওয়াদাকৃত জিনিস প্রদানের জন্য যে ওয়াক্ত নির্ধারণ করিয়াছি তোমরা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাহা হস্তগত করিতে অক্ষম। তদ্রূপ আমি তোমাদের রিযকের জন্য যে ওয়াক্ত নির্ধারিত করিয়াছি এই নির্ধারিত ওয়াক্তের পূর্বে রিযক পাওয়ার বেলায়ও তোমরা অক্ষম।

পঞ্চম ফায়দা ঃ আল্লাহ শপথ করিয়া বলিয়াছেন-

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ *

"আসমান যমীনের প্রতিপালক শপথ করিয়া বলেন যে, নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের বাক্যালাপের ন্যায় সত্য।"

অত্র আয়াতে এমন এক সত্ত্বা শপথ করিয়া বলিতেছেন, যাহার ওয়াদা সত্য হয়। যিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আর এমন জিনিস সম্পর্কে শপথ করিতেছেন, যাহার সুষ্ঠ ব্যবস্থার দায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এইভাবে শপথ করিবার পিছনে কারণ হইল যে, তিনি রিযকের দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা ঘোষণার পরও মানুষের অন্তরে সন্দেহ ও অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে। তিনি তাহা ভালভাবেই অবগত আছেন। তাই তিনি শপথ করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের সন্দেহ ও অস্থিরতা দূর হইয়া যায়। সুতরাং অত্র আয়াত আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে মানুষের উপর একটি অত্যন্ত ভারী দলীল। এই জন্যই ফিরিশতারা এই আয়াত শুনার পর বলিয়া উঠিয়াছিল ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হইয়া যাক যে স্বীয় পরাক্রমশালী প্রতিপালককে রাগান্বিত করিয়াছে। এমন কি তাহাকে কসম খাইতে হইল। এক ব্যক্তি এই আয়াত শুনিয়া বলিল, সুবহানাল্লাহ! কে এমন মহান দাতাকে রাগান্বিত করিল যাহার ফলে তাহাকে শপথ করিতে হইল? ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হইয়া যাক। আল্লাহ পাকের শপথ করার দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ পাকের প্রতি বান্দাদের নির্ভরতা নেই। তাই তিনি শপথ করিয়া কোন কিছু বলার ক্ষেত্রে বিধান এই যে, যদি বক্তার বক্তব্যের উপর শ্রোতার নির্ভরতা থাকে তাহা হইলে শপথ করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আর যদি নির্ভরতা না থাকে তাহা হইলে শপথ করিয়া বলিতে হয়।

যাহা হউক অত্র আয়াত অনেককে খুশী করিয়াছে। আবার অনেককে লজ্জিত করিয়াছে। অত্র আয়াত যাহাদিগকে খুশী করিয়াছে তাহারা প্রথম শ্রেণীর লোক। কেননা এই শপথের ফলে তাহাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একীন সুদৃঢ় হইয়াছে। শয়তানের কুমন্ত্রনা ও প্ররোচনা থেকে বাঁচিয়া থাকিতে সহায়তা লাভ করিয়াছে।

এই আয়াত যাহাদিগকে লজ্জিত করিয়াছে তাহাদের ধারণা যে আল্লাহ পাক তাহাদের অনির্ভরতা ও অস্থিরতা দেখিয়া তাহাদিগকে সন্দেহ ও সংশয় পোষণকারীর স্থলাভিষিক্ত বিবেচনা করিয়া শপথ করিয়া বলিয়াছেন। তাহাদের এই ধারণা তাহাদিগকে লজ্জিত করিয়াছে। তাহাদের এই লজ্জা তাহাদের ধারণার ফল। অনেক সময় মানুষের ধারনার তারতম্য এবং অনুধাবনের তাওফীক লাভের তারতম্যের কারণে একই বিষয় কাহারও জন্য খুশীর কারণ আর কাহারও জন্য বিষন্নতা ও লজ্জার কারণ হইয়া থাকে।

লক্ষ্য করিয়া দেখ-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا *

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন কামেল করিয়া দিয়াছি। তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে পছন্দ করিয়াছি।"

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সকল ছাহাবা খুশী হইলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) চিন্তিত হইলেন। কেননা, তিনি অত্র আয়াতের দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সংবাদ বুঝিয়া ছিলেন। তাই তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যখন কোন জিনিস পরিপূর্নতা লাভ করে তখন ক্ষতিগ্রস্থতা ও অপূর্ণতা ফিরিয়া আসার আশংকা পয়দা হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) জানিতেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন জীবিত আছেন ততদিন দ্বীনে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্থতা ও অপূর্ণতা আসিতে পারে না। আর ক্ষতিগ্রস্থতা এবং অপূর্ণতা যখন আসিবেই তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাগতিক হায়াত খতম হওয়ার পর আসিবে। ইহা হইতে তিনি তাঁহার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু সংবাদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ছাহাবাগণ আয়াতের বাহ্যিক সংবাদের দিকে খেয়াল করিয়া খুশী হইয়াছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই আয়াতের মর্ম অনুধাবন করিতে গিয়া যতদূর পর্যন্ত

পৌঁছিয়াছিলেন অন্যান্য ছাহাবাগন ততদূর পর্যন্ত পৌছেন নাই। এই বর্ণনা হইতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর রহস্য আঁচ করা যায়। তাঁহার সম্পর্কে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "রোযা, নামায প্রভৃতিতে আবু বকর তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী নয়। বরং তাঁহার অন্তরে একটি জিনিস বসিয়া গিয়াছে।"

সুতরাং যে জিনিস তাঁহার অন্তরে থাকার কারণে তিনি অন্যান্যদের থেকে অগ্রগামী ছিলেন ঐ জিনিসের সহায়তায়ই তিনি অত্র আয়াত থেকে এমন মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যাহা অন্য কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

একই বিষয় কাহারও খুশী হওয়া আর কাহারও বিষন্ন হওয়ার উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় আয়াত-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ *

"আল্লাহ পাক বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের জীবন ও মাল সম্পদ খরিদ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। আর তাহারা অপরকে হত্যা করে এবং তাহারা নিজেরাও শহীদ হইয়া থাকে।"

আমি শায়খ আবু মুহাম্মদ শারজানীর (রহঃ) কাছে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, এক সম্প্রদায়ের লোকজন এই আয়াত শুনার পর খুব খুশী হইয়াছিল। খুশীতে তাহাদের মুখমণ্ডল এই জন্য হাস্যোজ্জ্বল হইয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে বড় মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আল্লাহ পাক তাহাদের সাথে বেচা-কেনা করিয়াছেন। তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বেচাকেনা করার জন্য তাহাদিগকে পছন্দ করিয়াছেন। অধিকন্তু তাহাদের জীবন ও মাল সম্পদের বিনিময় স্বরূপ এক অমূল্য জিনিস দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্য এক সম্প্রদায়ের লোকজন এই আয়াত শুনার পর তাহাদের চেহারা লজ্জায় পীতবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এই জন্য লজ্জিত হইল যে, আল্লাহ পাক তাহাদের থেকে যাহা খরিদ করিয়াছেন উহার মালিক তিনি নিজেই। আর তিনি নিজের জিনিস নিজে লইয়া উহার বিনিময় হিসাবে তাহাদিগকে বেহেশত দিয়াছেন।

সুতরাং এই আয়াত শুনিয়া খুশীতে যাহাদের চেহারা শুভ্র হইয়াছিল তাহারা দুইটি জান্নাত লাভ করিবে যাহাতে পাত্রগুলি হইবে রৌপ্যের এবং ইহাতে যত জিনিস থাকিবে তাহাও পাইবে রৌপ্যের। আর যাহাদের চেহারা লজ্জায় পীত

বর্ণের হইয়াছিল তাহারাও দুইটি জান্নাত লাভ করিবে। যাহাতে স্বর্ণের পাত্র থাকিবে। অধিকন্তু ইহার অন্যান্য সব জিনিসও হইবে স্বর্ণের। শায়খের কথা এখানেই শেষ।

যাহাদের চেহারা শুভ্র হইয়াছিল তাহারা রৌপ্যের পাত্রবিশিষ্ট জান্নাত পাইবে। কারণ রৌপ্য শুভ্র হয়। আর যাহাদের চেহারা পীত বর্ণের হইয়াছিল তাহারা স্বর্ণের পাত্রবিশিষ্ট জান্নাত লাভ করিবে। কারণ স্বর্ণ পীত বর্ণের হয়।

যদি ঈমানদারদের মধ্যে ইতিপূর্বে উল্লিখিত রিযক সম্বন্ধে অস্থিরতার কোন অংশও বিদ্যমান না থাকিত। তাহা হইলে আয়াতে উল্লিখিত বেচাকেনা তাহাদের সাথে সংঘটিত হইত না। এই জন্য আল্লাহ পাক উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি মুমিনদের থেকে খরিদ করিয়াছেন। নবী এবং রাসূলদের থেকে খরিদ করিয়াছেন বলেন নাই।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, জীবন তিন প্রকার। এক প্রকার জীবন বেদামী। তাই বেচাকেনা হয় নাই। দ্বিতীয় প্রকার জীবনের বেচাকেনা হইয়াছে। কারণ ইহা দামী ও সম্মানিত। তৃতীয় প্রকার জীবনের বেচাকেনা হয় নাই। কারণ ইহা মুক্ত। প্রথম প্রকার জীবন হইল কাফেরদের জীবন। ইহা বেদামী বলিয়া ইহার বেচাকেনার কথা হয় নাই। দ্বিতীয় প্রকার জীবন হইল মুমিনদের জীবন। ইহা সম্মানিত ও দামী বিধায় ইহার বেচাকেনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকার জীবন নবী-রাসূলদের জীবন। ইহা মুক্ত হওয়ার কারণে ইহা বেচাকেনা হয় নাই।

ষষ্ঠ ফায়দা ঃ আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে স্বীয় গুণবাচক নামে শপথ করিয়াছেন। অধিকন্তু গুণবাচক নামের মধ্য হইতে প্রতিপালক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি আসমান এবং যমীনেরও প্রতিপালন করেন, বিধায় তিনি ইহাদের অভিভাবক। যেহেতু তিনি আসমান ও যমীনের অভিভাবকত্ব করেন। তিনি ইহাদের প্রতিপালন করেন সেহেতু এই গুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর করার ক্ষেত্রে ঈমানদাররা কোনরূপ দ্বিধা সংকোচে পতিত হইতে পারে না। কেননা আল্লাহকে এতবড় দুনিয়ার অভিভাবক দেখিয়া বান্দা চিন্তা করে যে, এতবড় দুনিয়ার তুলনায় আমি বা কতটুকু? এত বড় বিশ্বের তুলনায় আমি তো নগন্য। যেহেতু তিনি এত বড় বিশ্বের প্রতিপালন করিতেছেন। সুতরাং আমার রিযক প্রদান তো তাঁহার জন্য সাধারন ব্যাপার।

অতএব আল্লাহর অন্যান্য গুণবাচক নাম যেমন– সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী, দয়ালু প্রভৃতি নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'প্রতিপালক' নামটি উল্লেখ করা অধিক

উপযুক্ত হইয়াছে।

সপ্তম ফায়দা ঃ আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই ইহা সত্য।"

বাতিল সত্যের বিপরীত। এমন জিনিসকে বাতিল বলা হয় যাহার কোন বাস্তবতা থাকে না।

রিযক সত্য যেমন রিযকদাতা সত্য। রিযকের ব্যাপারে সন্দেহ করা রিযকদাতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করার নামান্তর। এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি কবর হইতে কাফন চুরি করিত। অবশ্য পরে সে এই গর্হিত কার্য থেকে তওবা করিয়াছিল। সে এক বুযুর্গের কাছে বর্ণনা করিল যে, সে এক হাজার কাফন চুরি করিয়াছে। কিন্তু সে দেখিতে পাইল যে, কাফনের ভিতরের সকল মৃতের মুখই কেবলার দিক হইতে অন্য দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে। বুযুর্গ বলিলেন, দুনিয়াতে রিযক সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ভাল ছিল না। আর তাহাদের বদ ধারণার কারণেই তাহাদের মুখ কেবলা হইতে অন্য দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি তাহাদের বদ ধারণা ছিল যে, আল্লাহ পাক রিযক দিবেন না। তাই তাহারা রিযক উপার্জনে বিভিন্ন উপায়ের দিকে মনোযোগী হইয়াছিল। আর ইহার শাস্তি স্বরূপ তাহাদের রূখ বায়তুল্লাহ হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অষ্টম ফায়দা ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক রিযকের বিষয়টি উপমা দিয়া বলিয়াছেন-

مثل ما انكم تنطقون *

"ইহা তোমাদের বাক্যালাপের ন্যায় সত্য।"

আল্লাহ পাকই রিযক প্রদান করেন। প্রতিটি সৃষ্টির রিযক তাঁহার কাছে মওজুদ রহিয়াছে। উল্লিখিত উপমা দ্বারা এই কথাটি সুদৃঢ় ও মজবুত করা হইয়াছে। বান্দার রিযক আল্লাহ পাকের কাছে মওজুদ থাকার মহা সত্যটির হাকীকত বান্দার অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকারান্তে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে কোন ঈমানদারের জন্য এই বিষয়ে সামান্য সন্দেহ সংশয় থাকা উচিত নয়। সামনাসামনি বাক্যালাপ যেমন চোখের সামনে একটি বাস্তব সন্দেহহীন সত্য বিষয়, রিযক মওজুদ থাকাও অর্ন্তচক্ষুর সামনে তেমনি একটি সত্য ও বাস্তব বিষয়। এইজন্য এই অদৃশ্য বিষয়টি দৃশ্যমান বিষয়ের সাথে এবং পঞ্চ ইন্দ্রের পরিধি বহির্ভূত বিষয়কে ইন্দ্রিয় অনুভূত বিষয়ের সাথে

তুলনা দিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর এইভাবে রিযক সম্পর্কে বান্দার সন্দেহ দূরীভূত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, তোমরা একে অপরের সাথে বাক্যালাপ কর তখন ইহাতে তোমাদের সন্দেহ থাকে না। কেননা তোমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করিতেছ। অনুরূপভাবে রিযকের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করিও না। কেননা ঈমানের নূর দ্বারা ইহার বাস্তবতাও প্রমাণিত।

সুতরাং হে শ্রোতা! লক্ষ্য কর আল্লাহ পাক কত গুরুত্বের সাথে রিযকের আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার পর্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত জিনিসের মাধ্যমে ইহার উপমা দিয়াছেন যাহাতে চক্ষুষ্মান কোন ব্যক্তির এই সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় না থাকে। অধিকন্তু স্বীয় প্রতিপালনের গুনবাচক নামের শপথ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যবান মোবারকের দ্বারা ইহার দ্বিতীয়বার আলোচনা করাইয়াছেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

ان روح القدس نفث فى روعى ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله و اجملوا فى الطلب *

"জিবরাঈল (আঃ) ফুঁকের মাধ্যমে আমার অন্তরে এই কথা ঢালিয়া দিয়াছেন যে, কোন প্রাণী যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য নির্ধারিত রিযক সম্পূর্ণরূপে ভোগ না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করিবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং সুন্দর পন্থায় রিযক তালাশ কর।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন-

توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا و تروح بطانا *

"যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করিতে তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে পাখীকে রিযক দেওয়ার ন্যায় রিযক প্রদান করিতেন। যেমন পাখীতো সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ত্যাগ করে আর সন্ধ্যায় উদরপূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসে।"

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেন যে,

طالب العلم تكفل الله برزقه *

"আল্লাহ পাক ইলম অন্বেষণকারীর রিযকের যিম্মাদার।"

অনুরূপভাবে এই সম্পর্কে আরও অনেক হাদীছ রহিয়াছে।

বিশেষ আলোচনা ঃ রিযক লাভ করিতে গিয়া আসবাব (উপায়) অবলম্বন করা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করার পরিপন্থী নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে তাঁহার যে বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে উহাতে রহিয়াছে যে,

فاتقوا الله و اجملوا فى الطلب *

"আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় তালাশ কর।"

হাদীছের এই অংশে রিযক তালাশ করার বৈধতা ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং হাদীছাংশের সারকথা হইল যখন রিযক তালাশ কর; তখন সুন্দর পন্থায় তালাশ করিও অর্থাৎ রিযক তালাশ করার সময় তাঁহারই প্রতি নির্ভরশীল থাকিও। তাঁহার প্রতি ভরসা রাখিও। যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিযক তালাশ করার পন্থাসমূহ বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আর তালাশ করা উপায় অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীছের মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন,

"মানুষ যাহা আহার করে। তন্মধ্যে সর্বাধিক হালাল খাদ্য হইল সে যাহা নিজ হাতে উপার্জন করে।"

অনুরূপ আরও অনেক হাদীছ রহিয়াছে যাহা উপায় অবলম্বন করার বৈধতা প্রমাণ করে বরং ঐ সব হাদীছে রিযক উপার্জনের ক্ষেত্রে উপায় অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। এমনকি উপায় অবলম্বন করা উত্তম বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

উপায় অবলম্বনে অনেক উপকার বিদ্যমান আছে। এখানে ইহাদের আলোচনা করা হইল।

প্রথম উপকার ঃ মানুষের অন্তর খুব দুর্বল। তাহার জন্য রিযক নির্ধারিত রহিয়াছে কিন্তু তাহা সে দেখিতে পারে না। তাই সত্যিকার ভরসা করিতে অক্ষম। আল্লাহ পাক তাহার অন্তরের এই অবস্থা ভাল করিয়া জানেন। তাই তিনি উপায় অবলম্বন করা মানবের জন্য বৈধ করিয়াছেন। যাহাতে ইহা তাহার অস্থির অন্তরের একটি আশ্রয়স্থল হয় এবং তাহার মন ঠিক থাকে। সুতরাং উপায় অবলম্বনের অনুমতি প্রদান মানবের প্রতি আল্লাহ পাকের মহা অনুগ্রহ।

দ্বিতীয় উপকার ঃ মাখলুকের কাছে চাওয়ার মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত

হওয়ার এবং ঈমানের সতেজতা নষ্ট হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। উপায় অবলম্বনের ফলে মানবের এই দুইটি বৈশিষ্ট্য নিরাপদ থাকে। সুতরাং আল্লাহ পাক তোমাকে যে কোন উপায়ই অবলম্বন করার সুযোগ দিয়া থাকেন না কেন ইহাতে কোন মাখলুকের দ্বারা তুমি অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কোন মাখলুক তোমাকে খুটাও দিতে পারিবে না। কেননা কেহ কখনও এইভাবে খুটা দেয় না যে আমি তোমার থেকে এই জিনিসটি খরিদ করিয়াছি অথবা তোমাকে আমি কর্মচারী রাখিয়াছি। কারণ এই সব কার্যের দ্বারা তুমি নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য নিজেই চেষ্টা করিতেছ। আর এইসব কার্য উপায়। ইহাতে অপমানিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উপায় অবলম্বন করার ফলে কোনরূপ খুটা ও অপমান ব্যতীত রিযক অর্জিত হইল।

তৃতীয় উপকার ঃ মানুষকে আসবাবের মধ্যে লাগাইয়া দিয়া গোনাহ ও নাফরমানী হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। লক্ষ্য কর ঈদের দিনে সাধারনতঃ মানুষ কোন আসবাবে লাগিয়া থাকে না অর্থাৎ তাহার কোন কাজ থাকে না। এই সুযোগে গাফেল ব্যক্তিরা আল্লাহর কতই না নাফরমানী করিয়া থাকে। তাঁহার বিরুদ্ধাচরনে লাগিয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগকে কাজে লাগাইয়া দেওয়া আল্লাহ পাকের মহাঅনুগ্রহ।

চতুর্থ উপকার ঃ আসবাব (উপায়) অবলম্বনের ব্যবস্থা কা'য়েম করা দুনিয়া বিমুখ, ইবাদতের প্রতি আসক্ত এবং ইবাদতে নিমগ্ন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ পাকের বড় অনুগ্রহ ও ইহসান। যদি উপায় অবলম্বনকারীরা এই ব্যবস্থার পিছনে পরিশ্রম না করিত তাহা হইলে নির্জনতা অবলম্বনকারী কিভাবে নির্জনতা অবলম্বন করিতে পারিত? আর আল্লাহর রাস্তায় মেহনতকারীর মেহনত করা কিভাবে সম্ভব হইত? আল্লাহ পাক আসবাবসমূহকে এই সব ব্যক্তিদের খেদমতে নিয়োগ করিয়াছেন। সমস্ত আসবাব তাহাদের খেদমত করার জন্য সদা প্রস্তুত।

পঞ্চম উপকার ঃ আল্লাহ পাক ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিলামিশার বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেমন তিনি নিজেই ইরশাদ করিয়াছেন-

انما المؤمنون اخوة *

"নিঃসন্দেহে মুমিনগণ পরস্পর ভ্রাতা।"

সুতরাং উপজীবিকার জন্য উপায় অবলম্বন তাহাদের পারস্পরিক পরিচয় ও সৌহার্দ্যের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিতেছে।

অতএব জাহেল এবং আল্লাহ সম্পর্কে গাফেল ব্যক্তিই আসবাব অস্বীকার করিয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করিতেছিলেন তখন তিনি তাহাদিগকে আসবাব বর্জন করার কথা বলিয়াছিলেন। এমন কোন কথা আমরা জানি না বরং যে সব আসবাব আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং তাহাদিগকে হেদায়েতের পথে আহবান করে এমন সব আসবাবের উপর তাহাদিগকে কায়েম রাখিলেন। কুরআন হাদীছ উভয়ে আসবাব অবলম্বনের বৈধতার ভরপুর প্রমাণাদি রহিয়াছে। এক উর্দূ কবি বলেন-

دیکھو مریم کو ھوا حکم خدا + نخل بن کو تو ھلا اورکھا رطب

چاھتا گرشاخ کردیتا قریب + ھے مگر عالم مین ھر شے ء کا سبب

"লক্ষ্য কর মরিয়মের প্রতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ হইল তুমি খেজুর বৃক্ষের শাখা নাড়া দাও এবং পুষ্ট খেজুর খাও।

যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে বৃক্ষ শাখাকে তাহার নিকট করিয়া দিতেন।

কিন্তু (তাহা করেন নাই) দুনিয়াতে প্রত্যেক জিনিসের কোন না কোন সবব (উপায়) রহিয়াছে।"

কবি এই পংক্তিদ্বয়ের মাধ্যমে কুরআনে পাকের একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আয়াতটি এই যে,-

و هزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا *

"অর্থাৎ মরিয়ম (আঃ)-এর প্রতি নির্দেশ করা হইয়াছে যে, তুমি খেজুর বৃক্ষের শাখা নিজের প্রতি নাড়া দাও। দেখিবে ইহাতে সদ্য পাকা খেজুর তোমার কাছে ঝরিয়া পড়িবে।

অধিকন্তু ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দুইটি লৌহবর্ম পরিধান করিয়াছিলেন। একদা তিনি খেজুরের সাথে কাকড়ি মিলাইয়া আহার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, ইহা উহার ক্ষতিকারক দিক নষ্ট করিয়া দেয়।

পক্ষী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, পক্ষীরা প্রত্যূষে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ত্যাগ করে আবার সন্ধ্যার সময় উদর ভর্তি হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহাতেও আসবাব অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেননা সকাল সন্ধ্যার আসা যাওয়া উহাদের ক্ষেত্রে আসবাব। মানবের কর্মকাণ্ডের সাথে ইহাকে এইভাবে তুলনা করা যায় যে, মানবও তো নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য আসা যাওয়া করে। পক্ষীরাও তদ্রুপ করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমূলক কথা এই যে, আসবাবে অস্তিত্ব তো অবশ্যই থাকিবে কিন্তু ইহার প্রতি দৃষ্টি না হওয়া চাই। সুতরাং আসবাব অস্বীকার করিও না। কেননা আল্লাহ পাক বিশেষ হেকমতের মাধ্যমে ইহাদের অস্তিত্ব দিয়াছেন। তবে ইহাদের প্রতি নির্ভরশীল হইও না।

ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে উল্লেখ রহিয়াছে-

فاتقوا الله و اجملوا فى الطلب *

"আল্লাহকে ভয় কর এবং জীবিকা উপার্জনে সুন্দর পন্থা গ্রহণ কর।"

এই ক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা কি তাহা অবগত হওয়া চাই। জীবিকা অন্বেষণে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের কয়েকটি অর্থ হইতে পারে। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক আমাদের সামনে যতটুকু খুলিয়াছেন আমরা তাহা আলোচনা করিব।

জীবিকা অন্বেষনকারী দুই ধরণের হইয়া থাকে। এক ধরণের লোক যাহারা ইহাতে ডুবিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ ইহার জন্যই ব্যয় করে। তাহাদের রুখতো অবশ্যই আল্লাহ হইতে ফিরিয়া যায়। কেননা শক্তি সামর্থ যখন একদিকে নিয়োজিত হয় তখন অন্যদিক থেকে ফিরিয়া যায়। শায়খ আবু মাদইয়ান (রহঃ) বলেন, অন্তর মাত্র একদিকে মনোনিবিষ্ট হয়। একদিকে মনোনিবেশ করিলে অন্য দিক হইতে ফিরিয়া আসে। আল্লাহ পাক বলেন,

و ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه *

"আল্লাহ পাক এক ব্যক্তির মধ্যে দুইটি অন্তর সৃষ্টি করেন নাই।"

অর্থাৎ সে একই সময় দুইদিকে মনোনিবেশ করিতে পারে না। ইহা মানবীয় দুর্বলতা। দুইদিকে মনোনিবেশ করা তাহার জন্য সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষ যখনই দুইদিকে মনোনিবেশ করিবে তখন এক দিক অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। কোন দিকে ক্ষতি করা ব্যতীত একই সময়ে সর্বদিকে কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একমাত্র আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য।

এইজন্যই কুরআনে বলা হইয়াছে–

هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله *

"তিনি ঐ সত্ত্বা যিনি আসমানেও উপাস্য আবার যমীনেও উপাস্য।"

অত্র আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি আসমানবাসীর প্রতিও মনোনিবেশ করেন এবং যমীনবাসীর প্রতিও মনোনিবেশ করেন। আসমানবাসীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া যমীনবাসীর অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পথে অন্তরায় হয় না। যমীনবাসীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া আসমানবাসীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পথে অন্তরায় হয় না। অনুরূপভাবে কোন জিনিস তাহাকে কোন জিনিস থেকে অসতর্ক ও বেখবর করিয়া রাখিতে পারে না। এইজন্যই অত্র আয়াতে اله শব্দটি পুনঃবার লওয়া হইয়াছে। যদি শব্দটি পুনঃ ব্যবহৃত না হইত তাহা হইলে উল্লিখিত কথাটুকু বুঝা যাইত না।

অতএব উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি এমনভাবে রিযিক উপার্জন করে যে, সে আল্লাহ্ থেকে গাফেল হইয়া পড়ে তাহা হইলে সে রিযিক অনুসন্ধানে সুন্দর পন্থা অবলম্বন করিল না। আর যে ব্যক্তি রিযিক উপার্জন করিতে গিয়া এমন অবস্থায় পতিত হইল না সে রিযিক উপার্জনে সুন্দর পন্থা অবলম্বন করিল। রিযিক উপার্জনে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের দ্বিতীয় অর্থ হইল বান্দা আল্লাহ্ পাকের কাছে রিয্ক চাইবে। কিন্তু রিযকের পরিমাণ, পন্থা এবং সময় নির্ধারণ করিবে না। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন, যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যে সময় ইচ্ছা করেন রিযক প্রদান করিবেন। অধিকন্তু আবেদন নিবেদন করার আদবও এইটাই। যে ব্যক্তি রিযক প্রার্থনা করে আর ইহার পরিমাণ, পাওয়ার পন্থা, এবং সময় নির্ধারণ করিয়া দেয় সে যেন আল্লাহর উপর হুকুমত (শাসন) চালাইতেছে। আল্লাহ্ সম্পর্কে তাহার অন্তর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জনৈক ব্যক্তির ঘটনা সে বলিত আমার অন্তর চায় যে, আমি রিযক উপার্জনের উপায়গুলি পরিত্যাগ করি। আর প্রতিদিন আমি দুইটি রুটি পাই। তাহার এই চাহিদার উদ্দেশ্য ছিল উপায় অবলম্বনের ঝামেলা মুক্ত হওয়া। একটু অপেক্ষা করিয়া দেখ যে, রিযকের পরিমাণ নির্ধারণ করার কারণে তাহার প্রতি কি বিপদ আপতিত হইয়াছে। এই ব্যক্তি নিজের পরিণাম সম্পর্কে বলিল যে, ঘটনাচক্রে সে বন্দী হইয়া পড়িল। বন্দীখানায় প্রতিদিন তাঁহাকে দুইটি করিয়া রুটি সরবরাহ করা হইত। এইভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল। আস্তে আস্তে সে সংকীর্ণ মন হইয়া পড়িল। একদিন এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় অদৃশ্য হইতে তাহাকে বলা হইল যে, তুমি তো আমার কাছে দৈনিক দুইটি করিয়া রুটি চাহিয়াছ। সুস্থতা চাও নাই। সুতরাং তুমি যাহা চাহিয়াছ

আমি তোমাকে তাহাই দিয়াছি। সে বলিল, আমি অদৃশ্যের এই কথা শুনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম আর আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করিলাম। তখন কোন এক ব্যক্তি বন্দীখানার দরজা খুলিয়া দিল আর আমি মুক্তি লাভ করিলাম। অতএব, হে ঈমানদারগণ, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। তুমি যে অবস্থার উপর আছ তাহা যদি শরীয়ত সম্মত হয় তাহা হইলে এই অবস্থা ছাড়িয়া অন্য অবস্থার দিকে স্থানান্তর হওয়ার সুযোগ অন্বেষণ করিও না। কেননা এই ধরণের সুযোগ অন্বেষন করা আল্লাহর সাথে বেয়াদবী করা। সুতরাং তুমি কোন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে স্থানান্তর হওয়ার চাহিদা না করিয়া ধৈর্যধারণ কর। কেননা, যদিও তোমার কাঙ্খিত বিষয় হাসিল হইয়া যায় কিন্তু সুখ ও আরাম তোমার নসীব না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেননা অনেকের এমনও হইয়া থাকে যে, তাহারা ধন সম্পদ ও আরাম লাভের উদ্দেশ্যে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে স্থানান্তর হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা অধিক কষ্টে পতিত হয়। সুখের পরিবর্তে ক্লেশে নিমজ্জিত হয়। ইহা তাহার নিজের পক্ষ হইতে অবস্থা নির্ধারণের শাস্তি।

আমাদের অন্য এক গ্রন্থে লিপিবন্ধ আছে যে, আল্লাহ পাক যদি তোমাকে রিযক উপার্জনের ক্ষেত্রে আসবাব (উপায়) অবলম্বনকারী করিয়া রাখেন। তাহা হইলে আসবাব (উপায়) মুক্ত হওয়ার চাহিদা করা অপ্রকাশ্য কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ। আর যদি তোমাকে আসবাব অবলম্বন করার উর্ধ্বে রাখেন তাহা হইলে আসবাব অবলম্বনের চাহিদা উচ্চ মনোবলের পরিপন্থী। খুব ভালভাবে বুঝিয়া লও যে, এই শত্রুর অর্থাৎ শয়তানের কাজ হইল তুমি যে কাজে লাগিয়া আছ শয়তান ঐ কার্যের পথ ধরিয়াই তোমার কাছে আসিবে। আর সে তাহার কাজটিকে তোমার দৃষ্টিতে ঘৃনিত করিয়া তুলিবে। যাহাতে তুমি এই কাজ থেকে সরিয়া আস এবং দ্বিতীয় কোন কাজে লাগিয়া যাও। অথচ আল্লাহ পাক তোমাকে এই কার্যে লাগাইয়াছিলেন। এইভাবে সে তোমাকে স্বীয় অবস্থান থেকে সরাইয়া ফেলার জন্য কুমন্ত্রনা দিয়া দিয়া তোমার অন্তর ভেজাল পূর্ণ করিয়া তোলে। শয়তান এইক্ষেত্রে তৎপরতাটি এইভাবে চালায় যে, সে উপায় (আসবাব) অবলম্বনকারীর কাছে আসিয়া বলে যে, যদি তোমরা আসবাব ছাড়িয়া খালি হইয়া যাও অর্থাৎ আসবাব পরিত্যাগ করিয়া চলিতে থাক তাহা হইলে তোমাদের অন্তর নূরে আলোকিত হইয়া উঠিবে, সাথে সাথে উদাহরণও উপস্থাপন করিতে থাকে যে, দেখ, অমুক অমুক ব্যক্তিও আসবাব ছাড়িয়া দিয়া চলিতেছে। অথচ যাহাকে আসবাব পরিত্যাগের জন্য পরামর্শ দেওয়া হইতেছে আসবাব পরিত্যাগ করার আশা তাহার থেকে করা যায় না এবং আসবাব পরিত্যাগ করিয়া ফেলার

যোগ্যতা তাহার মধ্যে বিদ্যমান নাই। আসবাব অবলম্বন করিয়া চলার মধ্যেই তাহার মঙ্গল নিহিত আছে। সুতরাং এমন ব্যক্তি যখন আসবাব বর্জন করে তখন তাহার ঈমান নড়বড় করিতে থাকে। একীন নষ্ট হইতে থাকে। মাখলুকের কাছে চাওয়ার দিকে এবং রিযক অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তখন সে প্রভুর সান্নিধ্য থেকে দূর সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। ঈমানের দুশমন শয়তানের তো ইহাই উদ্দেশ্য। শয়তান তো তোমার হিতাকাঙ্খীর পোষাকে সজ্জিত হইয়া সামনে আসে। কেননা যদি সে অন্য পোষাকে তোমার সামনে আসে তাহা হইলে তাহার কথা কে মানিতে যাইবে? দেখ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর কাছেও সদুপদেশ দাতা হিসাবে শয়তান আগমন করিয়াছিল। কুরআনে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল-

مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ *

"আপনাদের প্রতিপালক আপনাদিগকে এই বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন না জানি আপনারা ফিরিশতা হইয়া যান অথবা আপনারা বেহেশতে চিরস্থায়ী হইয়া যান।"

অনুরূপভাবে সে আসবাব বর্জনকারীদের কাছেও আগমন করে এবং বলে যে, কতদিন পর্যন্ত আসবাব বর্জন করিয়া থাকিবে? তোমরা (হে আসবাব বর্জনকারী) জান না যে আসবাব বর্জন করার ফলে অন্তর মাল সম্পদের দিকে মনোনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। অন্যে তোমাদিগকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করার সুযোগ লাভ করে। এই অবস্থায় কাহারও প্রয়োজন মিটানো তোমাদের জন্য সম্ভব হয় না। কাহাকেও কোন কিছু দান করিতে পার না। অন্যান্যদের হক আদায় করিতে পার না। অন্য মাখলুক থেকে কোন কিছু পাওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। এইভাবে শয়তান তাহাদের মস্তিস্কে অনেক ধরণের চিন্তার উদ্ভব ঘটায়। অথচ আসবাব বর্জন করার সময় এই ব্যক্তিদের অবস্থা ভাল ছিল। তাহাদের অন্তর নূরে নুরান্বিত ছিল। মাখলুকের থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় অনেক আরাম ও প্রশান্তি ভোগ করিতেছিল। এইভাবে শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রনা দিবে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাহারা আসবাবের শয়তানের এইরূপ কুমন্ত্রনার ফলে আসবাবের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। আসবাব অবলম্বন করে। আসবাবের ময়লা তাহাদিগকে স্পর্শ করে। ইহার অন্ধকার তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লয়।

যাহারা পূর্ব হইতেই আসবাব অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের অবস্থা এই সকল ব্যক্তি অপেক্ষাও ভাল। কেননা তাহারা প্রকৃত রাস্তায় চলার পর রাস্তা

ছাড়িয়া আসে নাই। উদ্দেশ্যের দিকে পথ চলিয়া ফিরিয়া যায় নাই। কিন্তু যে সকল আসবাব বর্জনকারী নতুনভাবে আসবাব অবলম্বন করিয়াছে তাহারা তো প্রভুর রাস্তায় পথ চলিয়া এখন মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। (নাউযুবিল্লাহ্)

খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও এবং আল্লাহর রাস্তায় আস। যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে চলিয়া আসিয়াছে সে সোজা পথে চলিয়াছে। শয়তানের কাজ হইল যখন সে মানুষকে দেখিবে যে, আল্লাহ পাক তাহাদিগকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন সে অবস্থায় তাহারা আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট তখন আল্লাহর প্রতি তাহাদের সন্তুষ্টির মনোভাব থেকে তাহাদিগকে বিরত রাখা। অধিকন্তু আল্লাহ পাক তাহাদের জন্য যে অবস্থা পছন্দ করিয়াছেন সে অবস্থা থেকে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া তাহাদের মন চাহি অবস্থার মধ্যে আটকাইয়া দেওয়া। অথচ আল্লাহ পাক যাহাকে যে অবস্থায় রাখেন ঐ অবস্থায় তাহাকে সাহায্য করেন। আর সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া যে অবস্থায় প্রবেশ করে আল্লাহ পাক ঐ অবস্থায় তাহাকে তাহারই দায়িত্বে সোপর্দ করেন। আল্লাহ পাক বলেন-

قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِىْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا*

"(হে নবী!) আপনি দোয়া করুন যে হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে উত্তম প্রবিষ্ট করুন এবং উত্তম নির্গত করুন। আর আপনার পক্ষ হইতে আমার জন্য সাহায্যকারী এবং বিজয় দান করুন।"

সুতরাং আয়াতে উল্লিখিত مدخل صدق (উত্তম প্রবিষ্টকরন) এর অর্থ তোমাকে প্রবিষ্ট করানো; তোমার নিজের প্রবেশ করা নহে। অনুরূপভাবে مخرج صَدق (উত্তম নির্গতকরন) এর অর্থও ইহাই। অর্থাৎ তোমাকে নির্গত করা। তুমি নিজের নির্গত হওয়া নহে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তোমার থেকে আল্লাহ পাক যাহা চান তাহা হইল তিনি তোমাকে যে অবস্থায় রাখেন তুমি এ অবস্থায়ই চলিতে থাক। এমনকি এই অবস্থা থেকে তিনিই তোমাকে বাহির করার ব্যবস্থা করিবেন। যেমন তিনিই তোমাকে এই অবস্থায় প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। উপায় অবলম্বন পরিত্যাগ করা কোন বড় কথা নহে। কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, আমি এত এত বার আসবাব (উপায় অবলম্বন) ছাড়িয়াছি। কিন্তু প্রত্যেক বারই পুনরায় আসবাবের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছি। অতঃপর আসবাব আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন আর আসবাবের দিকে ফিরিয়া আসি নাই। গ্রন্থকার বলেন, আমি একদা শায়খ আবুল আব্বাস মুরসী (রহঃ)এর দরবারে উপস্থিত

হইয়াছিলাম। তখন আমার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল যে, আমি আসবাব বর্জন করিয়া চলিব। আমার মনে এই চিন্তার উদ্ভব হইয়াছিল যে আমি তো ইলমে জাহেরীতে ডুবিয়া আছি। মানুষের সাথে আমার যোগসাজুশ রহিয়াছে। এই অবস্থায় তো আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা বহু দূরের কথা। আমি স্বীয় ইচ্ছার কথা তাঁহার সামনে ব্যক্ত করার পূর্বেই তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করিতে শুরু করিলেন। তিনি বলেন, "জনৈক ব্যক্তি ইলমে জাহেরীর চর্চায় লিপ্ত ছিল। আর এই ক্ষেত্রে তাহার বড় দখলও ছিল। তাহার ইচ্ছা হইল আমাদের রাস্তায় পথ চলার। তাই সে আমার সংস্পর্শে আসিয়া বলিতে লাগিল হযরত! আমি যে বিষয়ে লিপ্ত আছি আমি চাহিতেছি যে, আমি তাহা বর্জন করিয়া আপনার সংশ্রব অবলম্বন করিব। আমি তাহাকে জবাব দিলাম- ইহা কোন বড় কথা নহে। তুমি বরং নিজের অবস্থার উপরই থাক। আল্লাহ পাক আমার দ্বারা যাহা কিছু হওয়ার তোমার ভাগ্যে রাখিয়াছেন তাহা অবশ্যই পৌঁছিবে।"

(গ্রন্থকার বলেন) ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া শায়খ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সিদ্দীকদের অবস্থা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাহাদিগকে কোন অবস্থা থেকে বাহির করিয়া না আনেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা স্ব-ইচ্ছায় বাহির হইয়া আসেন না। অতঃপর আমি শায়খের দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। তখন আল্লাহ পাক আমার অন্তর হইতে এই সব খেয়াল বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। আমি আন্তরিক প্রশান্তি অনুভব করিতেছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

"তাহারা এমন ধরনের লোক যে তাহাদের কাছে যাহারা বসে তাহারা বঞ্চিত হয় না।"

রিযক অনুসন্ধানে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের তৃতীয় অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহর কাছে চাইবে ঠিক কিন্তু যাহা চাইবে তাহা যেন উদ্দেশ্য না হয় রবং উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহর সাথে কথা বলার। চাওয়াটা হইবে কথা বলার সুযোগ গ্রহণের বাহানা মাত্র। এই জন্যই শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, যে জিনিসের জন্য দু'আ করে তাহা হাসিল হওয়া দু'আর মধ্যে উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। কারণ এইরূপ উদ্দেশ্য হইতে দু'আকারী স্বীয় প্রভু হইতে অন্তরালে পড়িয়া যায়। বরং দু'আতে আসল উদ্দেশ্য হইল স্বীয় প্রভুর সাথে কথা বলা। বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে, আল্লাহ পাকের কাছে তাহাদের কোন কথা আছে কিনা? তাঁহার

এই ব্যবস্থা গ্রহণ এই জন্য ছিল যে, আল্লাহর সাথে তাঁহার কথাবার্তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

রিযক অনুসন্ধানে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের চতুর্থ অর্থ রিযক অনুসন্ধানের সময় এমন বদ্ধমূল বিশ্বাস পোষণ করা যে যেন সে প্রত্যক্ষ করিতেছে যে যাহা কিছু তাহার ভাগ্যে আছে তাহা নিজেই তাহাকে তালাশ করিয়া তাহার কাছে আসিবে এবং ইহাও বিশ্বাস করিবে যে, তাহার অনুসন্ধান তাহাকে ইহা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না।

রিযক অনুসন্ধানে সুন্দর পন্থা অবলম্বন কখনও কখনও এইভাবেও হইয়া থাকে যে, মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য অনুসন্ধান নয় বরং প্রভুর সামনে নিজকে বান্দা হিসাবে প্রকাশ করার জন্য নয়। যেমন, হযরত ছামউন (রহঃ) এশকের অবস্থায় বলিতেন,

"তোমার ব্যতীত আমার কোন উপায় নাই।
যেভাবে মনে চায় আমাকে যাচাই করিয়া লও।"

অতঃপর তাহার প্রশাব বন্ধ হইয়া গেল। এই কঠিন রোগে পতিত হইয়া তিনি খুব ধৈর্যধারণ করিলেন। আর দৃঢ়পদ থাকিলেন। এমনকি তাঁহার এক শিষ্য আসিয়া বলিতে লাগিল যে, হে ওস্তাদ! আমি গতরাত্রে আপনার আওয়াজ শুনিয়াছি যে আপনি সুস্থতা ও আরোগ্যতা প্রার্থনা করিতেছিলেন। অথচ তিনি এই ধরণের কোন প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু একইভাবে তাহার আরও তিনজন শিষ্য আসিয়া একই কথা বলিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন আল্লাহ পাক চাহিতেছেন তিনি যেন স্বীয় মুখাপেক্ষীতা ও সুস্থতার প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ পাকের কাছে প্রকাশ করেন। পরে সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। তাই তিনি মক্তবের বাচ্চাদের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে থাকেন যে, তোমরা স্বীয় ছোট চাচার জন্য দোয়া করো।

রিযক অনুসন্ধানে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের পঞ্চম অর্থ আল্লাহ পাকের কাছে এতটুকু চাও যতটুকু তোমার জন্য যথেষ্ঠ হয়। সীমাতিক্রম হইয়া যায় এমন পরিমান চাহিও না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের দিকে যেন লোলুপ দৃষ্টি না হয়। আগ্রহের সাথে ইহার দিকে মনোনিবেশ না করা চাই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি একদা দোয়া করিয়াছিলেন,

اللهم اجعل موت ال محمد كفافا *

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজনকে এত পরিমান প্রদান করুন যাহা তাহাদের মৃত্যু পর্যন্ত যথেষ্ঠ হয়।" (অতিরিক্ত না হয়।)

যথেষ্ঠ হয় এই পরিমান অপেক্ষা অধিক যে চায় সে ভৎর্সনাযোগ্য। পক্ষান্তরে যথেষ্ঠ হয় এই পরিমান যে চায় তাহার প্রতি কোন ভৎর্সনা হয় না। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যথেষ্ঠ হয় এই পরিমানের জন্য কোন ভৎর্সনা নাই।" এই ক্ষেত্রে ছায়লাবা ইবনে হাতেবের ঘটনা প্রনিধানযোগ্য। ছায়লাবা ইবনে হাতেব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আবেদন করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার জন্য দোয়া করুন যে, আল্লাহ পাক যেন আমাকে ধন দৌলত দান করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "হে ছায়লাবা! অল্প সম্পদে যখন তুমি ইহার শুকরিয়া আদায় করিবে উহার ঐ অধিক সম্পদ অপেক্ষা উত্তম যাহা পরবর্তীতে তোমার কাছ থেকে সরাইয়া লওয়া হইবে।" কিন্তু ছায়লাবা পুনরায় একই আবেদন করিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই জবাব দিলেন। কিন্ত সে বার বার আবেদন করার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছায়লাবার চাহিদা মোতাবেক দোয়া করিয়া দিলেন। লক্ষ্য কর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছায়লাবার জন্য যে অবস্থা পছন্দ করিয়াছেন সে উহার বিরোধিতা করিয়া স্বীয় মনচাহি অবস্থা অবলম্বন করিল। কিন্তু ইহার শেষফল ভাল হইল না। তাহার ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমনকি ধন সম্পদ বাড়িয়া যাওয়ার কারণে কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জামাতে নামায পড়া থেকেও পিছনে পড়িয়া যাইত। অতঃপর সম্পদ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন কি সে 'জুমা' ব্যতীত অন্য কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শরীক হইতে পারিতেছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে যাকাত উসূলকারী তাহার কাছে আসিল। যাকাত উসূলকারী যাকাতের মাল চাহিলে সে জবাব দিল আমার ধারনা মতে যাকাত জিযিয়া কর বা জিযিয়া করের অনুরূপ। এই কথা বলিয়া সে যাকাত দেয় নাই। তাহার ঘটনা বহুল আলোচিত। আল্লাহ পাক তাহার সম্পর্কে আয়াত নাযিল করিয়াছেন। আয়াতের সারকথা এই যে, "এই সকল মুনাফিকদের কতক লোক এমনও রহিয়াছে যে তাহারা আল্লাহ পাকের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছে যদি আল্লাহ পাক আমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের কিছু অংশ দান করেন তাহা হইলে

আমরা খুব দান খয়রাত করিব এবং ভাল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িব। অতঃপর যখন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে দান করিলেন তখন তাহারা কৃপণতা করা শুরু করিয়াছিল। বিমুখ হইয়া পড়িল। তাই আল্লাহ পাক তাহাদের বিনিময় এইভাবে দান করিলেন যে, তাহাদের অন্তরের মধ্যে নেফাক সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ইহা আমার সাথে তাহাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত থাকিবে। আর ইহা তাহাদের এই কারণে যে তাহারা মিথ্যা বলিত।"

রিযক অনুসন্ধানে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের ষষ্ঠ অর্থ ঃ কখনও কখনও দুনিয়া চাহিদা করার দ্বারাও ইহা হইয়া থাকে। অবশ্য শুধু দুনিয়ার চাহিদা নয় বরং দুনিয়া চাওয়ার সাথে সাথে যখন আখেরাতকেও সাথে মিলাইয়া লও। শুধু দুনিয়া চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক বলেন-

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ *

"কতক লোক তো এমন দো'আও করে যে, হে পরোয়ারদিগার! আমাদিগকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন। এমন ব্যক্তির জন্য আখেরাতে কোন অংশ নাই।"

কতক লোক দুনিয়ার সাথে আখেরাতকে মিলাইয়া দো'আ করে যে, হে পরোয়ারদিগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যান দান করুন এবং আখেরাতে এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান।"

সপ্তম অর্থ- রিযক এইভাবে তলব করা যে রিযক লাভ সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকা। সাথে সাথে যাহা তলব করিবে তাহা হালাল বা হারাম উহার প্রতিও খেয়াল রাখা।

অষ্টম অর্থ ঃ তলব করিতে থাকা আর তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার চাহিদা না করা। তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার চাহিদা করা রিযক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের পরিপন্থী। তাড়াতাড়ি কবুল হওযার চাহিদা করিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কোন একজন যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ না বলে যে, আমি দো'আ করিয়াছি কিন্তু কবুল হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া কবুল হইতে থাকে।

হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ) ফিরাউনের জন্য বদদু'আ করিয়াছিলেন। কুরআনে পাকে তাহাদের বদদু'আর কথা উল্লেখিত হইয়াছে। যেমন-

ربنا اطمس على اموالهم ....اليهم *

"হে আমাদের প্রভু! তাহাদের সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিন এবং তাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন করিয়া দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মর্মন্তুদ আযাব না দেখিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না।"

আল্লাহ পাক তাঁহাদের এই দু'আ কবুল করিয়াছেন। কুরআনে উল্লেখিত হইয়াছে-

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰنِ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ *

"আল্লাহ পাক বলেন, তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হইয়াছে। তোমরা (নিজ দায়িত্বে) স্থির থাক। ঐ সকল লোকের পথে চলিও না যাহাদের জ্ঞান নাই।"

"তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হইয়াছে" আল্লাহ পাকের এই কথার এবং ফিরাউনের ধ্বংসের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের পার্থক্য ছিল।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) فاستقيما শব্দের তাফসীর করিতে গিয়া বলেন যে, ইহার অর্থ তোমরা স্থির থাক অর্থাৎ তোমাদের কাঙ্খিত বস্তু তাড়াতাড়ি পাওয়ার চাহিদা করো না।

و الذين لا يعلمون এর তাফসীরে বলেন যে, এখানে ঐ সকল লোকদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা দু'আ তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার চাহিদা করে।

নবম অর্থ ঃ কখনও কখনও রিযক অনুসন্ধানে সুন্দর পন্থা অবলম্বন এইভাবে হইয়া থাকে যে, রিযক অনুসন্ধান করার পর যদি রিযক অর্জিত হয় তাহা হইলে শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি রিযক না মিলে তাহা হইলেও সে একীন করে যে, ইহাও আল্লাহ পাকের মঙ্গলময় ইচ্ছা এবং তাঁহার উত্তম পছন্দ। অনেক রিযক তলবকারী এমনও রহিয়াছে যে রিযক লাভ হইলে শুকরিয়া আদায় করে না।

পক্ষান্তরে রিযক না পাওয়া আল্লাহ পাকের বিশেষ হেকমতের উপর নির্ভরশীল বলিয়াও মনে করে না। অথচ এই কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক জানে না যে তাহার এই অবস্থা তাহাকে কত নীচে নামাইয়া দিয়াছে। কেননা সে তো আল্লাহর ইলমের মোকাবিলায় নিজের পক্ষ হইতে এক হুকুম লাগাইয়া দিয়াছে। অর্থাৎ এই অবস্থায় তাহাকে রিযক না দেওয়া আল্লাহ পাকের বিশেষ হেকমতের উপর নির্ভরশীল অথচ সে তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছে না।

সারকথা– বান্দার অবস্থা ইহা সাব্যস্ত হইল যে, সে স্বীয় প্রভুর সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় নিজের পক্ষ হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হইল যখন সে আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাহিবে তখন সে এই ধারণাসহ চাহিবে যে তাহার কাঙ্খিত বস্তু তাড়াতাড়ি অর্জিত হইবে না বরং বিলম্বে অর্জিত হইবে। উহার অর্জন আল্লাহ পাকের দায়িত্বে সোপর্দ করিয়া দিবে। তাঁহার ইচ্ছার মোকাবিলায় কোন তদবীর করিবে না এবং নিজের পক্ষ হইতে কোন প্রকার নির্ধারণ সাব্যস্ত করিবে না। আল্লাহ পাক নিজেই বলেন-

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ *

“এবং আপনার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন।”

উল্লিখিত নীতি এমন সব বিষয়ের ক্ষেত্রে অবলম্বনযোগ্য যে সব বিষয়ের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পর্কে আমরা অবগত নহি।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মানুষ যে সব জিনিসের জন্য দু'আ করে তাহা তিন প্রকারের হইয়া থাকে। এক যাহা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। ইহাদের প্রত্যেকটি আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়া উচিত। কোনটাই বাদ না দেওয়া চাই। যেমন ঈমান ও সর্বপ্রকারের ইবাদত। দ্বিতীয় প্রকার নিঃসন্দেহে এই প্রকারের প্রত্যেকটি জিনিস ক্ষতিকর। ইহাদের প্রতিটি জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত। যেমন কুফুরী ও সর্বপ্রকারের গোনাহ। তৃতীয় প্রকারঃ ইহাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা নাই। যেমন বিত্তশালী হওয়া, সম্মানিত হওয়া, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া। এইসব জিনিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের কাছে এইভাবে দু'আ করা চাই যে, হে আল্লাহ! যদি ইহা আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহা হইলে আমাকে দান করুন। অন্যথায় আমার প্রয়োজন নাই।

রিযক চাওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের দশম অর্থ ঃ চাওয়ার সময় তাকদীরের বন্টনের প্রতি নির্ভরতা রাখা নিজের দো'আর সাথে রিযক পাওয়ার সম্পর্ক না করা যে, আমি দু'আর বদৌলতে ইহা পাইয়াছি। কখনও কখনও ইহা এইভাবেও হইয়া থাকে যে, রিযক অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু ইহাও বিশ্বাস করিতেছি যে, আমি তো ইহার উপযুক্ত নহি। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের লোকই আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য।

হযরত শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বরেন, আমি যখন আল্লাহ পাকের কাছে কোন জিনিস প্রার্থনা করি তখন নিজের দোষত্রুটিগুলি সামনে উপস্থাপিত করি। এই কথার দ্বারা হযরত শায়খ (রহঃ)-এর উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ পাকের কাছে

কোনকিছু চাওয়ার সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি না করা যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রার্থনাকারী উহা পাওয়ার হকদার। বরং শুধু আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের মাধ্যমে পাওয়ার আশা করিয়া প্রার্থনা করা চাই।

রিযক তলবের ক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা অবলম্বনের দশটি অর্থ উল্লেখ করা হইল। তবে ইহা দশ অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ মাত্র দশটি অর্থই হইতে পারে এমন নয়। বরং ইহার অর্থ আরও অধিক হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে আল্লাহ্ পাক অদৃশ্য থেকে আমাদিগকে যতগুলি অর্থ বুঝার তাওফীক দিয়াছেন। আমরা ততগুলিই এখানে বর্ণনা করিয়াছি।

ইহা সাইয়্যেদুল মুরসালিন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাণী। সুতরাং ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার আন্তরিক নূর মোতাবেক উপকৃত হইতে পারে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনিমুক্তার সাগরে যে যত ডুব দিবে সে তত বেশী কুড়াইতে সক্ষম হইবে। মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় অবস্থান মোতাবেক হাদীছের অর্থগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। যেমন, বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ। এই গুলি পানির মাধ্যমে সজীবতা লাভ করে। কিন্তু ফল প্রদানের সময় ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া যায়। এক বৃক্ষের ফল অপেক্ষা অপর বৃক্ষের ফল অধিক চিত্তাকর্ষক হয়। আর ইহা হইয়া থাকে পানি দ্বারা বৃক্ষের উপকৃত হওয়ার যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে। হাদীছের অর্থ বুঝার ব্যাপারটিও অনুরূপ। মানুষ যাহা অর্জন করিয়াছে উহার পরিমান অনার্জিত জিনিস অপেক্ষা অনেক কম। অর্থাৎ অনার্জিত ও অবশিষ্টের পরিমাণ বেশী। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ শুন- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, "আমাকে সারগর্ভমূলক কথা প্রদান করা হইয়াছে এবং আমি অতি স্বল্প শব্দে পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকি।"

যদি আলেমগন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর একটি মাত্র শব্দের ভেদ ও রহস্য জীবন ভরিয়া বর্ণনা করিতে থাকেন তাহা হইলেও তাহাদের জ্ঞান এই একটি শব্দের বর্ণনাই শেষ করিতে পারিবে না। তাহাদের বিবেক ইহার পরিমাপ করিতে পারিবে না।

কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন আমি সত্তর বৎসর পর্যন্ত এক হাদীছের উপর আমল করিয়াছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইহার আমল শেষ করিতে পারি নাই। হাদীছটি এই-

من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه *

"মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হইল অনর্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তা পরিত্যাগ করা।"

উল্লেখিত বুযুর্গ যথার্থই বলিয়াছেন।

যদি সে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকে এমনকি অনন্তকালও জীবিত থাকে তাহা হইলেও এই হাদীছের হক আদায় করিতে পারিবে না এবং এই হাদীছে জগতের যে সব বিস্ময়কর বিষয় এবং রহস্য ও ভেদ রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়া শেষ করিতে পারিবে না।

প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর প্রতি লক্ষ্য কর। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন। যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি যথার্থ নির্ভর করিতে তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে এমনভাবে রিযক প্রদান করিতেন যেমন তিনি পক্ষীকুলকে রিযক প্রদান করিয়া থাকেন। পক্ষীকূল প্রত্যুষে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাহির হইয়া পড়ে আবার উদরপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া আসে।"

হাদীছটির প্রতি খুব ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, হাদীছ তাওয়াক্কুল করার নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য কোন মাধ্যম বা উপায় অবলম্বনের কথা অস্বীকার করিতেছে না। বরং মাধ্যম বা উপায় অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করিতেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন পক্ষীকূল সকালে বাহির হইয়া পড়ে আবার সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। সুতরাং সকালের বাহির হইয়া পড়া আবার সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসাইতো ইহাদের জন্য সবব বা উপায়। তবে সঞ্চয় করিয়া রাখার কথা অস্বীকার করা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে যে, যদি তোমাদের যথার্থ তাওয়াক্কুল থাকিত তাহা হইলে তোমরা সঞ্চয় করিতে না।

সুতরাং তোমাদের তাওয়াক্কুল তোমাদিগকে সঞ্চয় করার মুখাপেক্ষী করিবে না। অতএব এই পন্থায় তোমাদের রিযক লাভ পক্ষীর ন্যায় রিযক লাভের উদাহরণ। যেমন পক্ষীকূলের একদিনের রিযক লাভ হইলেই ইহাদের জন্য যথেষ্ঠ হইয়া যায়। আগামীদিনের জন্য আর সঞ্চয় করে না। যেহেতু ইহাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আল্লাহ পাক ইহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। তাই ইহারা এইরূপ করিয়া থাকে।

হে ঈমানদারগণ! এই ক্ষেত্রে তোমরা ইহাদের অপেক্ষা অধিক হকদার। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কারভাবে বলিয়া দিলেন যে, সঞ্চয় করা দুর্বল একীনের পরিচায়ক। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, সর্বপ্রকার সঞ্চয় সম্পর্কেই এই হুকুম না সঞ্চয়ের প্রকার ভেদে হুকুম বিভিন্ন হয়। তাহা হইল ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, সঞ্চয় তিন প্রকার। এক– যালেমদের সঞ্চয় করা, দুই– মধ্যপন্থা অবলম্বীদের সঞ্চয় রাখা। তিন– পূর্ববর্তী লোকদের সঞ্চয় রাখা। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে যালেম এমন সমস্ত লোকদিগকে বলা হয় যাহারা কৃপণতাবশতঃ সঞ্চয় করে। ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য। সুতরাং এই সমস্ত লোকদের অন্তর অত্যন্ত গাফেল (অসতর্ক)। তাহাদের মধ্যে লোভ-লালসা প্রধান্য বিস্তার করিয়া আছে। তাহাদের অন্তরের এই লালসা পার্থিবতার জালে আবদ্ধ। তাহাদের শক্তি সামর্থ্য পার্থিবতা ব্যতীত অন্য কোন দিকে ব্যবহৃত হয় না। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে সম্পদশালী বলিয়া মনে হয় কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহারা অভাবী। যদিও তাহারা দেখিতে সম্মানিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা লাঞ্ছিত। তাহাদের দুনিয়া যতই অর্জিত হউক না কেন তাহারা তুষ্ট হইতে পারে না। দুনিয়া লাভের চাহিদার ক্ষেত্রে তাহারা অলসতা করে না। দুনিয়ার চিজ আসবাব তাহাদের লইয়া খেলা করে। তাহাদের প্রতিপালক বিভিন্ন। তাহারা চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য। এমনকি ইহাদের অপেক্ষাও অধিক পথভ্রষ্ট। তাহারা গাফেল।

ইলম স্বরণ রাখার এবং নছিহত কবুল করার জন্য তাহাদের অন্তরে কোন স্থান নাই। তাহাদের খুব স্বল্প আমলই কবুল হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে তাহাদের অবস্থাও খুব কম পরিস্কার থাকে। কেননা দারিদ্রতার ভয় তাহাদের অন্তরে লাগিয়াই আছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"দারিদ্রতার ভীতি যাহাদের অন্তরে স্থান করিয়া লইয়াছে তাহাদের আমল খুব কমই কবুল হইয়া থাকে।"

সুতরাং একজন ঈমানদার ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নিরাপদে রহিয়াছে যে দারিদ্রতার ভীতির জালে আটকা পড়িয়াছে।

সে যে বিপদে পতিত হইয়াছে ঈমানদার উহা হইতে মুক্ত রহিয়াছে এবং সে যে ক্লেসে নিমজ্জিত রহিয়াছে উহা হইতে দূরে রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করা ঈমানদারদের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনি তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাকে স্বীয় দান দ্বারা অলংকৃত করিয়াছেন।

সুতরাং তুমি যখন এই ধরণের যালেম লোকদিগকে দেখিবে তখন এই দু'আ পড়িবে-

الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به و فضلنى على كثير ممن خلقه تفضيلا *

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। তিনি তোমাকে যে (নাজুক) অবস্থায় লিপ্ত করিয়াছেন ঐ অবস্থা থেকে আমাকে মুক্ত রাখিয়াছেন এবং আমাকে অনেক সৃষ্টির উর্ধ্বে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন।"

যেমন যখন তুমি কোন বিপদগ্রস্থ লোককে দেখিতে পাইয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসা কর। কারণ তিনি তোমাকে বিপদমুক্ত রাখিয়াছেন। আর এই সময় তুমি স্বীয় প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করিতে থাক। অনুরূপভাবে যখন তুমি দেখিতেছ যে, আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তিকে দুনিয়াবী চিজ আসবাবের জালে আটকাইয়া দিয়াছেন আর তোমাকে ইহা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন তখন তোমার জন্য অপরিহার্য হইল আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা। কিন্তু তুমি ঐ ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিও না। বরং তুমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিও। বদদু'আর পরিবর্তে তাহার জন্য মঙ্গলের দু'আ করিও।

আরিফ বিল্লাহ হযরত মারূফ কারখী (রহঃ)-এর অনুকরণ কর। মারূফ অর্থ নেক কাজ। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কাজকর্ম এমন ছিল যে, এই নামের উপযুক্ত পাত্র তিনি। তাঁহার একটি ঘটনাঃ একদা মারূফ কারখী (রহঃ) স্বীয় সঙ্গী সাথীসহ দজলা নদী পার হইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গীসাথীরা দেখিতে পাইল যে, সেখানে কয়েকজন খারাপ চরিত্রের লোক একত্রিত হইয়াছে। তাহারা নারীপুরুষে মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রকার গোনাহের কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। সঙ্গীসাথীরা আরয করিল, হে ওস্তাদ! তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। তিনি দুই হাত উঠাইয়া আরয করিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি তাহাদিগকে দুনিয়াতে আনন্দে লিপ্ত রাখিয়াছেন। অনুরূপভাবে তাহাদিগকে আখেরাতেও আনন্দে লিপ্ত রাখুন।"

সঙ্গীসাথীরা আরয করিল, হে ওস্তাদ! আমরা বদদু'আ করার আবেদন করিয়াছিলাম। তিনি জবাব দিলেন, যদি আল্লাহ পাক আখেরাতে তাহাদিগকে আনন্দে রাখিতে মঞ্জুর করেন তাহা হইলে তাহাদিগকে তাওবা করার তাওফীক দিবেন। যদি আল্লাহ পাক তাহাদিগকে তাওবা করার তাওফীক দেন তাহা হইলে তোমাদের কি ক্ষতি হইবে? দেখা গেল তখনই এ জলসার লোকগুলি নদী হইতে পাড়ে উঠিয়া আসিল। পুরুষ নারী হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। নারীরা

একদিক দিয়া নদীতে নামিয়া গোসল করিল আর পুরুষরা অন্যদিক দিয়া গোসল করিল। অতঃপর তাহারা তাওবা করিয়া আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করিল। হযরত মারূফ কারখীর দু'আয় তাহাদের অনেকেই বড় বড় ওলী ও ইবাদতকারীতে পরিণত হইল।

সুতরাং যদি গোনাহগারের প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাহা হইলে মনে করিবে যে আল্লাহর ইলম ও ইচ্ছায় তাহাদের জন্য এইরূপই লিখা হইয়াছিল। যদি মনের মধ্যে এইভাব সৃষ্টি না কর তাহা হইলে সম্ভাবনা রহিয়াছে যে হয়তবা তুমিও এই ধরণের কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িবে এবং তোমাকেও তাহাদের ন্যায় দূরে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ)-এর ইরশাদ শুন। তিনি বলেন,

ঈমানদারকে সম্মান কর যদিও সে গোনাহগার ও ফাসেক হয়। তাহাদিগকে সদোপদেশ প্রদান করা। খারাপ কার্য করা হইতে তাহাকে বারণ কর। যদি তাহাদের সঙ্গে মিলামিশা করা ছাড়িয়া দাও তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া ছাড়িও। নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য যেন না হয়। তাহাদের প্রতি স্নেহ-পরবশ হওয়ার অর্থ তাহাদের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করার দ্বারা যেন তাহারা সতর্ক হইয়া যায় এবং তাহারা পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত হইয়া সঠিক পথে আসিয়া পড়ে।

হযরত শায়খ ইহাও বলিয়াছেন, "ঈমান এত বড় সম্পদ যে, যদি গোনাহগার ঈমানদারের নূর প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা হইলে এই নূর যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী সমুদয় ফাঁকা জায়গা ভরপুর করিয়া ফেলিবে। সুতরাং একজন নেককার খোদাভক্ত ঈমানদারের নূরের অবস্থা কি হইবে?

ইমানদার যদিও গাফেল হয় তবুও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহ পাকের ইরশাদ রহিয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا ..... بِإِذْنِ اللّٰهِ *

"অতঃপর আমি আমার বান্দাসমূহ থেকে ঐ সকল লোকদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছি যাহাদিগকে আমি পছন্দ করিয়াছি। তন্মধ্যে কতক লোক জুলুম করনেওয়ালা। কতক মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আর কতক আল্লাহ পাকের হুকুমে নেককাজের আগে আগে থাকে।"

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, তাহারা জালেম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারীত্বের জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

জুলুম করার কারণে তাহাদিগকে স্বীয় পছন্দ ও মনোয়ন অথবা গ্রন্থের উত্তরাধিকারী নির্ধারন করা থেকে বাদ দেন নাই। তাহারা জালেম হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের ঈমানের কারণে তাহাদিগকে পছন্দ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক মহান, পবিত্র, প্রসস্থ, অনুগ্রহকারী ও এহসানকারী। সুতরাং আল্লাহর রাজত্বে এমনসব বান্দা থাকা একান্ত আবশ্যক যাহারা জ্ঞানের যোগ্য হইবে এবং আল্লাহ পাকের রহমত ও ক্ষমা আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত পাওয়ার প্রকাশ স্থল হইতে পারে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি ভালভাবে বুঝিয়া লও।

তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, "ঐ সত্ত্বার শপথ যাহার কুদরতী হস্তে আমার জীবন। যদি তোমরা গোনাহ না করিতে তাহা হইলে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতেন যাহারা গোনাহ করিত। অতঃপর তাহারা তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিত আর তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতেন।"

অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ করনেওয়ালা ব্যক্তিদের জন্য আমার শাফায়াত।"

অত্র হাদীছে আল্লাহ পাকের প্রশস্ততা, রহমত এবং গোনাহের কার্যের হেকমত বর্ণনা করা হইয়াছে। অত্র হাদীছসমূহ হইতে এই কথা বুঝা ঠিক হইবে না যে, গোনাহ করার ফলে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল খুশী হন। কখনও তাহা হইতে পারে না।

এক ব্যক্তি শায়খ আবুল হাসান (রহঃ)-এর কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল যে, হযরত গতরাত্রে আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন এমন খারাপ কথাবার্তা হইয়াছে। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) তাহার আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, এমন ধরনের কথা বলাকে ঐ ব্যক্তি অশোভনীয় বলিয়া মনে করিতেছে। তাই তিনি বলিলেন, হে মিঞা! মনে হয় তুমি চাহিতেছ যে, আল্লাহ পাকের রাজত্বে কোন প্রকার অপরাধই না হউক। যে ব্যক্তি ইহা চায় প্রকারান্তে তাহার চাহিদা হইল আল্লাহ পাকের ক্ষমা করার গুণের প্রকাশ না হওয়া। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত সাবেত না হওয়া। (এই পর্যন্ত শায়খের বক্তব্য)

অনেক গোনাহগার এমন রহিয়াছে যাহাদের গোনাহ ও অপরাধের আধিক্যতা আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হওয়ার উসিলা হয়। সুতরাং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং তাহাদের ঈমানকে সম্মানিত মনে করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ সম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। তাহারা এমন প্রকারের লোক যাহারা সম্পদ বৃদ্ধি, অহংকার প্রদর্শন এবং বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য সম্পদ জমা করে না। বরং অভাব অনটনের অবস্থায় তাহাদের যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় উহা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে যদি সম্পদ জমা না করে তাহা হইলে তাহাদের ঈমান টলমল করিতে থাকে, একীন নড়বড় হইতে থাকে। যেহেতু তাহারা তাওয়াক্কুলকারীদের পর্যায়ে উঠিতে সাহস করে না এবং তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, একীনের পর্যায়ে উন্নীত হইতে অক্ষম তাই তাহারা সম্পদ জমা করিয়া লইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

প্রত্যেক মুমিনের মধ্যেই কল্যাণ রহিয়াছে। তবে সুদৃঢ় ঈমানদার দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা উত্তম।”

সুদৃঢ় ঈমানদার ব্যক্তি হইল যাহার একীনের নূর উজ্জ্বল। সে বদ্ধমূল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে যে, রিযক জমা করি বা না করি আল্লাহ পাক আমার রিযক আমার কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন। যদি আমি জমা না করি তাহা হইলে আল্লাহ পাক আমার জন্য জমা করিবেন। আর যে সম্পদ জমা করে তাহাকে তাহার জমাকৃত সম্পদের প্রতি নির্ভরশীল করিয়া দেন। তাওয়াক্কুলকারী আল্লাহ পাকের দায়িত্বে থাকে। তাহাকে অন্য কাহারও দায়িত্বে দেওয়া হয় না।

সুতরাং সুদৃঢ় ঈমানদার পার্থিব সম্পদের অধিকারী হউক না হউক কোন অবস্থায় ইহার প্রতি নির্ভরশীল হয় না। দুর্বল ঈমানদার যদি পার্থিব সম্পর্দের অধিকারী হয় তাহা হইলে উহাকে সামান্য আশ্রয় মনে করে। আর যদি ইহা হইতে দূরে থাকে তাহা হইলে ইহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার ঃ সম্পদ জমা করা আর না করার দিক থেকে যাহারা প্রথম শ্রেনীর লোক। মর্যাদার দিক থেকে তাহারা অগ্রগামী। তাহারা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কেননা, তাহাদের অন্তর আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে খালি হইয়া একমাত্র আল্লাহর সাথেই জুড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহর পথে বাধাবিঘ্ন তাহাদিগকে ফিরাইয়া রাখিতে পারে নাই। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসতর্ক রাখিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা আল্লাহর দিকে দৌঁড়াইয়া আসিয়াছে। কেননা তাহাদের পথে কোন বাধা নাই। অন্যান্য লোকেরা গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। আর এই চেষ্টা তাহাদিগকে আল্লাহ থেকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। যখন তাহারা আল্লাহর দিকে চলিতে চায়। তখন যে জিনিসের সাথে তাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে ঐ জিনিস তাহাদিগকে

নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং স্বীয় ইচ্ছা থেকে ফিরিয়া আসে এবং ঐ জিনিসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কাজেই এই সকল লোকের ভাগ্যে কি করিয়া মুখাপেক্ষীহীন মহান দরবার জুটিতে পারে? কোন এক আরিফ বলেন, তবে কি তুমি ধারণা কর যে, কোন জিনিস তোমাকে পিছন দিক হইতে টানিয়া রাখা সত্ত্বেও তুমি খোদার দরবারে পৌঁছিয়া যাইবে? এখানে আসিয়া আল্লাহ পাকের ইরশাদ শুন-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ *

"ঐ দিনের কথা স্বরণ কর যেদিন কোন সম্পদ এবং সন্তানাদি উপকারে আসিবে না তবে যে সলীম অন্তর লইয়া আল্লাহর কাছে উপস্থিত হইয়াছে।"

সলীম অন্তর এমন এক অন্তরকে বলা হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সাথে যাহার সম্পর্ক না থাকে। আল্লাহ পাক বলেন,

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ *

"তোমরা আমার কাছে একাকী আসিয়াছ যেমন আমি তোমাদিগকে প্রথমাবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কাছে আসা, তাহার পর্যন্ত পৌঁছা সমস্ত গায়রুল্লাহ থেকে পৃথক হওয়া ব্যতীত সম্ভব নয়।

আল্লাহ পাক বলেন,

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى *

"তবে কি আল্লাহ আপনাকে ইয়াতীম পান নাই, অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দেন নাই?"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক নিজের কাছে তখনই আশ্রয় দেন যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে ইয়াতীম হইয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ *

"আল্লাহ পাক বেজোড়। তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এমন অন্তর পছন্দ করেন যাহাতে মাখলুকের স্থান নাই। সুতরাং এই অন্তর আল্লাহর জন্য। ইহা আল্লাহর সাথে থাকে। তাহারা ইহা আল্লাহর ব্যবহারে দিয়া দিয়াছে। আল্লাহ পাক এই অন্তরকে অন্তরওয়ালার হাতে

সোপর্দ করেন নাই। ইহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাহাদের হস্তে অর্পন করেন নাই। এই সকল লোকই (মহান প্রভুর) দরবারের লোক। তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হইয়া থাকে। মাখলুক তাহাদিগকে আল্লাহ্ থেকে পৃথক করিতে পারে না। পার্থিব সৌন্দর্য তাহাদিগকে আল্লাহ্ থেকে বিরত রাখিতে সক্ষম হয় না।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, যদি আমাকে অন্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বলা হয়। তাহা হইলে আমার দ্বারা ইহা সম্ভব হইবে না। কেননা অন্য আর কে আছে? কেহই নাই। থাকিলে তো দৃষ্টি দিব। আল্লাহর হেফাজত যাহাদের যিম্মাদার আর তাঁহার অনুগ্রহ যাহাদের পাহারাদার তাহাদের আন্তরিক অবস্থাই এমন হয়। এই ধরণের লোকদের দ্বারা ধন সম্পদ ভাণ্ডারজাত করা কখন সম্ভব হয়? তাহারা তো প্রভুর দরবারে সর্বদা হাজির থাকে। যদি কোন কারণে সম্পদ জমাও করে কিন্তু ইহার প্রতি নির্ভরশীল হয় না। অন্যের আশ্রয়ের আশা তাহারা কিভাবে করিতে পারে? তাহারা তো সর্বদাই মহান প্রতিপালকের অদ্বিতীয়তা ও একত্ব প্রত্যক্ষ করিতে থাকে।

শায়খ আবুল হাসান শাজলী (রহঃ) বলেন, একদা আমার মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, যখন আমি কোন কিছুর দিকে তাকাই তখন উহাকে ঐ জিনিস দেখি না বরং আমি ইহাকে খোদা দেখি। তখন আমার এই অবস্থা দূরীভূত হওয়ার জন্য আমি দু'আ করিতে শুরু করিলাম। তখন আমাকে বলা হইল যে, যদি সকলে মিলিয়াও দু'আ কর; তাহা হইলেও কবুল করা হইবে না। তবে এই অবস্থা বরদাশত করিবার শক্তি লাভের দু'আ করিতে থাক। অতঃপর আমি এই দু'আই করিলাম। আল্লাহ্ পাক আমাকে সহ্য করার ক্ষমতা দান করিলেন। সুতরাং যাহার অবস্থা এইরূপ হয় সে কেন সম্পদ জমা করার মুখাপেক্ষী হইবে? অথবা অপরের আশ্রয় তলব করা তাহার জন্য কিভাবে ঠিক হইতে পারে? ঈমানদারের জন্য জরুরী হইল ঈমান ও তাওয়াক্কুল সঞ্চয় করা। আল্লাহ্ পাক যাহাকে বিবেক বুদ্ধি দান করিয়াছেন, সে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করিয়া থাকে। আর আল্লাহ্ পাক নিজে তাহার জন্য জমা করিয়া রাখেন। সে আল্লাহ্ পাকের কাছে গিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্ পাক তাহার যিম্মাদার হইয়াছেন। তাহার গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্য আল্লাহ্ পাক যথেষ্ঠ। তিনি তাহার চিন্তা দূর করিয়াছেন। প্রকারান্তে এই ব্যক্তি রিযক উপার্জনের গুরুত্ব থেকে দৃষ্টি সরাইয়া আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হুকুম পালনে লাগিয়া গিয়াছে। তাহার বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ পাক তাহার দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে অর্পন করিবেন না এবং স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না।

সুতরাং এই ব্যক্তি আরাম ও শান্তির জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। নিজকে সৃষ্টিকর্তার হাতে অর্পন করিয়াছে। আর এই কার্যের স্বাদ গ্রহণের বাগানে পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ পাক তাহার মর্যাদা উচ্চ করিয়াছেন। তাহার অন্তরের আলো পরিপূর্ণ করিয়াছে। এমনকি সে এমন পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে যে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে তাহার হিসাব নিকাশও মাফ করিয়া দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্য হইতে সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উপস্থিত ছাহাবাগণের মধ্য হইতে একজন প্রশ্ন করিলেন, তাহারা কাহারা? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, যাহারা ঝাড়-ফুঁক করে না। (কোন শরয়ী দলীল ব্যতীত) কোন কার্যের অশুভতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে না। (যেমন গণক ঠাকুর, জ্যোতিষী প্রভৃতিরা করিয়া থাকে) আর স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ভরসা করে।”

সুতরাং এমন ব্যক্তির কি হিসাব হইবে যাহার কাছে কোন কিছু নাই। এমন ব্যক্তিকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে যে, এমন ধারণা রাখে যে, কোন কাজই তো আমার দ্বারা হয় নাই।

যাহারা কাজ করিয়াছে বলিয়া দাবী করে হিসাব তো তাহাদেরই হয়। আর যাহারা অসতর্ক নিজদেরকে মালিক বলিয়া ধারণা করে অথবা আল্লাহ থেকে বাড়িয়া কিছু করিতে চায়, ধর পাকড় তো তাহাদেরই হয়।

পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ভরসা করিয়া ধন সম্পদ জমা করিয়া রাখে না আল্লাহ পাক তাহাদেরকে সুন্দর সুস্বাদু রিযক দান করেন। তাহাদের অন্তরে মাখলুকের মুখাপেক্ষীহীনতা পয়দা করিয়া দেন।

কোন একজন খোদা প্রেমিক দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন, ঘরে যাহা কিছু আছে দান করিয়া দাও। স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ মোতাবেক সবকিছু দান করিয়া দিল। তাহার মাল সম্পদের মধ্যে একটি যাঁতাও ছিল। স্ত্রী যাঁতাটি দান করিল না। সে ভাবিল হয়ত বা কখনও যাঁতার প্রয়োজন দেখা দিবে তখন পাইবে কোথায়? তাই যাঁতাটি রাখিয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এক ব্যক্তি উল্লেখিত খোদা প্রেমিকের ঘরের দরজাতে খট্‌খট আওয়াজ দিল। স্ত্রী দরজা খুলিয়া দেখিতে পাইল যে, বাড়ীর আঙ্গিনা গম দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। লোকটি বলিল যে, গমগুলি এই শায়খের জন্য দিয়া যাইতেছি। কতক্ষণ পর স্বামী ঘরে ফিরিয়া আসিল। আঙ্গিনা ভর্তি গম দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। তুমি কি ঘরের সবকিছুই দান করিয়াছ? স্ত্রী বলিল, হ্যাঁ, স্বামী বলিল, ইহা

কখনও হইতে পারে না? তুমি সত্য কথা বল নাই। স্ত্রী বলিল, হ্যাঁ। একটি যাঁতা অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত সবকিছু দান করিয়াছি। অধিকন্তু ইহাও এই নিয়তে রাখিয়া দিয়াছি যে, হয়তবা কখনও ইহার প্রয়োজন পড়িবে। স্বামী বলিল, যদি তুমি যাঁতাটিও দান করিয়া ফেলিতে তাহা হইলে গমের পরিবর্তে আটা আসিত। কিন্তু তুমি যাঁতা রাখিয়া দিয়াছ বিধায় এমন জিনিস আসিয়াছে যাহার জন্য যাঁতার প্রয়োজন। আর গম পিষিয়া পিষিয়া তুমি নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িবে।

পূর্ববর্তী লোকজন মাল সম্পদ জমা করিতেন সত্য কিন্তু নিজের জন্য জমা করিতেন না। বরং আমানত হিসাবে জমা করিতেন। কেননা তাহারা সত্যিকার অর্থে আমানতদার ও তহবিলদার ছিলেন। যদি দুনিয়ার সম্পদ জমা করিতেন হকভাবে জমা করিতেন। না হক করিতেন না। যদি কাহাকেও দিতেন তাহাও হকভাবে দিতেন। না হক দিতেন না। যে ব্যক্তি হকভাবে মাল সম্পদ জমা করিয়া রাখে তাহার মর্যাদা হকভাবে সম্পদ ব্যয়কারী অপেক্ষা কম নহে। তাহারা নিজেদের সম্পর্কে এই ধারণা রাখে না যে আল্লাহর পরে তাহারা এই সব সম্পদের মালিক বরং তাহারা মনে করে যে, তাহারা ইহাদের আমানতদার মাত্র। স্বইচ্ছায় তাহারা এইগুলি ব্যবহারও করে না। তাহারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ শ্রবণ করিয়াছে-

وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ *

"তোমরা ঐ সব জিনিস থেকে খরচ কর যে সব জিনিসের তোমাদিগকে নায়েব (প্রতিনিধি) নির্ধারণ করা হইয়াছে।"

তাই তাহারা বিশ্বাস করে যে, সমস্ত মালিকানা আল্লাহ পাকের। সুতরাং এই বাহ্যিক মালিকানা তাহার প্রতি আল্লাহর একটি সম্পর্ক মাত্র আর তাঁহার মিশ্রিত একটি নিমন্ত্রণ যাহা দ্বারা তিনি বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক বান্দাকে পরীক্ষা করিবেন যে, বান্দা আল্লাহর প্রতি কি বিশ্বাস পোষণ করে। বান্দা কি বাহ্যিক অবস্থার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না অবস্থার হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছে। এইজন্য নবীগণের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। কেননা আল্লাহর সামনে তাহারা কোন কিছুর মালিক হন না। আর এমন সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হয় যাহা তোমার ব্যক্তি সত্ত্বাধীন থাকে। নবীগণ তো নিজেদের সম্পদকে আল্লাহ পাকের আমানত মনে করিতেন। খরচ করার উপযুক্ত স্থলে খরচ করিতেন। সঠিক স্থান ব্যতীত অন্য কোথায়ও খরচ করিতেন না। যাকাত প্রদানের অন্য একটি হেকমত হইল যাকাত প্রদান করার দ্বারা বান্দা

স্বীয় পাপ থেকে পরিষ্কার হয়। মুক্তি লাভ করে। আল্লাহ পাক বলেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا *

"তাহাদের মাল হইতে সদকা (যাকাত) গ্রহণ কর। ইহা দ্বারা তাহাদিগকে পাক পবিত্র কর।"

নবীগণ পাপ পঙ্কিল হইতে পবিত্র। তাই নবীগণের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। পাপ পঙ্কিল হইতে পবিত্র মানুষের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না বলিয়া ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাযহাব মতে নাবালেগ ছেলেমেয়ের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। কারণ তাহারাও তো গোনাহ থেকে পবিত্র হয়। কেননা গোনাহগার হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক হয় শরীয়তের আহকাম পালনে আদিষ্ট হওয়ার পর। আর শরীয়তের আহকাম পালনে আদিষ্ট হয় বালেগ হওয়ার পর। এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ শ্রবণ কর-

"আমরা নবীগণের জামাত। আমাদের কোন উত্তরাধিকারী থাকে না। আর আমরা যে সকল মাল সম্পদ ছাড়িয়া যাই তাহা সদকা।" সুতরাং এই পর্যন্ত যে কথাগুলি আমরা আলোচনা করিয়াছি উল্লেখিত হাদীছের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আল্লাহ পাকের একত্ব প্রত্যক্ষ করার পর আহলে মারেফাতেরই যখন এই অবস্থা হয় যে, আল্লাহ পাকের সামনে স্বীয় মালিকানাকে মালিকানা মনে করে না। এই অনুপাতে নবীগণের সম্বন্ধে কি ধারণা করা যায়? নবীগণ সমুদ্র তুল্য। আর আহলে মারেফাত (আধ্যাত্মিক সাধকগণ) যেন তাহাদের সমুদ্র থেকে অ লিবদ্ধ পানি গ্রহণ করিতেছেন মাত্র। তাহাদেরই নূর দ্বারা উপকৃত হইতেছেন। একটি ঘটনা শুন- একদা ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (রহঃ) এক স্থানে বসিয়াছেন। তখন হযরত শায়বান রাযী (রহঃ) তথায় পৌঁছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে বলিলেন, তাহার খুব সুখ্যাতি রহিয়াছে। তাহার থেকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করুন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলিলেন, এমন করা ঠিক হইবে না। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলিলেন, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা দরকার। অতঃপর হযরত শায়বান রাযীর দিকে মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শায়বান! যদি কোন ব্যক্তি চার রাকাত নামাযে চারটি সিজদা ভুলিয়া যায় তাহা হইলে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি উত্তর দিলেন, হে আহমদ! এই অন্তর আল্লাহ থেকে গাফেল হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া চাই যাহাতে দ্বিতীয়বার এইরূপ না করে। ইহা শুনিয়া ইমাম আহমদ (রহঃ) বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি

বলিলেন, "যদি কোন ব্যক্তির কাছে চল্লিশটি ছাগল থাকে তাহার সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তাহার কি পরিমান যাকাত আসে? হযরত শায়বান (রহঃ) জবাব দিলেন, "আমার অভিমত কি আমাদের তরীকা মোতাবেক পেশ করিব না আপনাদের তরীকা মোতাবেক? ইমাম আহমদ (রহঃ) বলিলেন, তবে কি এই মাসআলাতে দুই তরীকা রহিয়াছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, দুই তরীকা। যাহা হউক আপনাদের তরীকা মতে তো চল্লিশ ছাগলে এক ছাগল যাকাত আসে। আর আমাদের তরীকা মতে গোলাম মনিবের হইয়া থাকে। সে কোন কিছুর মালিক হয় না। হাদীছে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৎসরের খাদ্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার বিভিন্ন কারণের মধ্যে এক কারণ ইহাও হইতে পারে যাহা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইল নবীগণ আমানত হিসাবে মাল সম্পদ জমা করিয়া রাখিতেন। অর্থাৎ তাহারা উপযুক্ত সময়ে তাহা খরচ করিয়া থাকেন। অথবা তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় আমলের মাধ্যমে দেখাইয়াছেন যে, সম্পদ জমা করিয়া রাখা উম্মতের জন্যও বৈধ। কেননা জমাকৃত সম্পদের প্রতি ভরসা না থাকিলে সম্পদ জমা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। সম্পদ জমা করার বৈধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৎসরের জন্য সম্পদ জমা করিয়াছিলেন। ইহার দলীল এই যে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় সম্পদ জমা করিতেন না। আর যখন জমা করিয়াছিলেন তখন শুধু এই উদ্দেশ্যে জমা করিয়াছিলেন যাহাতে উম্মতের জন্য বিষয়টি সংকীর্ণ না হইয়া পড়ে। তাহাদের জন্য তাঁহার এই আমল রহমত স্বরূপ হয় এবং দুর্বলদের প্রতি মেহেরবানী হয়। কেননা, তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি সম্পদ জমা না করিতেন তাহা হইলে উম্মতের কোন ব্যক্তির জন্য সম্পদ জমা করা জায়েয হইত না। সুতরাং সম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিকোন বর্ণনা করিবার জন্য তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ভুলিয়া যাই বা আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে আমি নীতি নির্ধারণ করিতে পারি। সুতরাং তিনি পরিস্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, ভুলিয়া যাওয়া আমার বৈশিষ্ট্য নহে। তবে আমি কখনও কখনও ভুলিয়া যাই যাহাতে ভুলিয়া যাওয়ার হুকুম ও ইহার আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলি উম্মতের সামনে পরিস্কার হইয়া আসে। হাদীছটি খুব ভালভাবে বুঝিয়া লও।

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ পাক তালিব ইলমের (দ্বীনী ইলম অন্বেষণকারীর) রিযকের যিম্মাদার।"

কুরআন ও হাদীছের যেখানে যেখানে ইলমের আলোচনা আসিয়াছে সেখানে ইলম দ্বারা ইলমে নাফে (উপকারী ইলম) বুঝানো হইয়াছে। আর ইলমে নাফের সাথে জড়িত রহিয়াছে আল্লাহর ভয়। মূলতঃ আল্লাহর ভয় ইলমে নাফের একটি উপকরণ। আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ঘোষণা করিয়াছেন-

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ *

"নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাঁহাকে ভয় করে।"

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহর ভয় ইলমের অপরিহার্য অংশ। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারাই আলেম যাহারা আল্লাহকে ভয় করে। অনুরূপভাবে নিম্নোলিখিত আয়াতসমূহেও ইলম দ্বারা ইলমে নাফে বুঝানো হইয়াছে।

قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ *

১। "যাহাদিগকে ইলম প্রদান করা হইয়াছে তাহারা বলে-"

اَلرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ *

২। "ইলমের ক্ষেত্রে যাহারা সুদৃঢ়।"

و قل رب زدني علما *

৩। "এবং বলুন হে পরোয়ারদিগার! আমার ইলম বাড়াইয়া দিন।"

অনুরূপভাবে নিম্নোলিখিত হাদীছসমূহও-

ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم *

"নিশ্চয় ফিরিশতারা ইলম অন্বেষণকারীর জন্য স্বীয় ডানা বিছাইয়া দেয়।"

العلماء ورثة الانبياء *

"আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।"

طالب العلم تكفل الله برزقه *

"আল্লাহ পাক ইলম অন্বেষণকারীর রিযকের যিম্মাদার।"

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ সমূহে ইলম বলিয়া ইলমে নাফে (উপকারী ইলম) বুঝানো হইয়াছে।

কারণ এইগুলি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

বাণী। তাহাদের বাণীসমূহ উল্লিখিত অর্থে ব্যবহার না করিয়া তদাপেক্ষা উত্তম আর কোন অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে?

ইলমে নাফে এমন এক ইলমকে বলা হয় যাহা আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দা হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়।

আল্লাহ পাককে ভয় করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে আর শরয়ী আহকামের গণ্ডির ভিতর থাকিতে বাধ্য করে। ইহা হইল ইলমে মারেফাত। অধিকন্তু আল্লাহ পাকের জাত গুণাবলীর ইলম এবং আহকাম সম্পর্কীয় ইলমও ইলমে নাফের অন্তর্ভুক্ত।

এইমাত্র এক হাদীছ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "আল্লাহ পাক ইলম অন্বেষণকারীর রিযকের যিম্মাদার।"

হাদীছের সারকথা হইল এই যে, আল্লাহ পাক তাহাদের কাছে রিযক পৌঁছানের দায়িত্ব লইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে ইযযত ও সম্মানের সাথে রিযক পৌঁছাইবেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর আড়াল হওয়া থেকে নিরাপদ রাখিবেন। এখন প্রশ্ন হইল যে, আল্লাহ পাক তো সকলেরই রিযকের যিম্মাদার। ইলম অন্বেষণকারী হউক বা না হউক। ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। ইহা সত্ত্বেও হাদীছে বিশেষ করিয়া ইলম অন্বেষণকারীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রশ্নের সমাধান ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আল্লাহ পাক তাহাদের রিযকের বিশেষ যিম্মাদার। কেননা, তিনি তাহাদের রিযক সম্মানের সাথে প্রদান করিবেন।

শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) নিম্নোক্ত দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ! আমাদিগকে খুশ গাওয়ার রিযক প্রদান করুন। যাহা দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে আড়াল হওয়ার কারণ না হয় এবং এই সম্পর্কে পরকালে সওয়াল জওয়াব না হয় এবং আযাবে পতিত হইতে না হয়। আমরা যেন হাকীকত ও তাওহীদের স্থানে কায়েম থাকিতে পারি এবং লোভ লালসা ও প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে নিরাপদ থাকিতে পারি।"

তিনি এখানে খুশ গাওয়ার রিযক প্রার্থনা করিয়াছেন। খুশ গাওয়ার এমন এক প্রকার রিযক যাহা ইলম অন্বেষণকারীকে প্রদান করা হয়। আর এই প্রকার রিযকের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে আড়াল পয়দা হয় না আর পরকালে ইহার হিসাব গ্রহণ করা হয় না। কেননা যে রিযকের দ্বারা দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে আড়াল পয়দা হয় তাহা খুশ গাওয়ার

রিযক হইতে পারে না। কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে আড়াল পয়দা হওয়ার দ্বারা অন্তর নষ্ট হইয়া যায়। আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে ছিটকাইয়া পড়িতে হয়। সাধারণ মানুষ খুশ গাওয়ার রিযকের যে অর্থ বুঝিয়া থাকে এখানে সে অর্থ গ্রহণীয় নয়। সাধারণ লোক বুঝিয়া থাকে যে, খুশ গাওয়ার রিযক এমন এক প্রকার রিযক যাহা বিনা পরিশ্রম ও বিনা মেহনতে অর্জিত হয়। গাফেল লোকেরা মনে করে খুশ গাওয়ার রিযকের সম্পর্ক দেহের সাথে আর বিবেকবান ব্যক্তিরা মনে করে ইহার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। রিযকের কারণে আল্লাহ্ থেকে আড়াল পয়দা হয় দুই কারণে। তাহা হইল ১। রিযক অর্জন করার জন্য আসবাবে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়। আর আসবাবে জড়িত হওয়ার ফলে আল্লাহর ব্যাপারে অসতর্কতা জন্মলাভ করে। ২। অধিকন্তু আসবাব ব্যবহার করার সময় ইচ্ছাও হয় না যে আল্লাহর ইবাদতে শক্তি অর্জন হউক।

প্রথম কারণে সৃষ্ট আড়াল হইল রিযক অর্জন করার বেলায় সৃষ্ট আড়াল আর দ্বিতীয় কারণে সৃষ্ট আড়াল হইল রিযক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সৃষ্ট আড়াল।

হযরত শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) এর দোয়া ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি দু'আতে উল্লেখ করিয়াছেন– এই সম্পর্কে আখেরাতে যেন সওয়াল জবাব ও আযাব না হয়।

প্রকৃতপক্ষে পরকালে জিজ্ঞাসা করা হইবে তো নিয়ামতের হকসমূহ সম্পর্কে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

كَمَا لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ *

"যেমন তোমাদিগকে সেদিন নিয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কতক ছাহাবা একত্রে আহার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, আজকের এই নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। হযরত শায়খ (রহঃ) বলেন, জিজ্ঞাসা দুই প্রকার। এক প্রকার জিজ্ঞাসার নাম "সওয়ালে তাশরীফ।" অর্থাৎ এই প্রকারের জিজ্ঞাসার দ্বারা মর্যাদা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়। দ্বিতীয় প্রকার জিজ্ঞাসার নাম "সওয়ালে তা'নীফ।" এই প্রকার জিজ্ঞাসা দ্বারা লানত ও ভৎর্সনা করা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং ইবাদতকারী এবং পুরস্কারের যোগ্য ব্যক্তিদের প্রথম প্রকারের জিজ্ঞাসাবাদ হইবে। অর্থাৎ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দ্বারা তাহাদের মর্যাদার প্রকাশ উদ্দেশ্য হইবে। আর খোদার

আনুগত্য থেকে বিমুখ ও গাফেল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ হইবে দ্বিতীয় প্রকারের। অর্থাৎ তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হইবে তাহাদিগকে ভৎর্সনা ও লানত করা।

আল্লাহ পাক যদিও সত্যবাদীদের সংবাদ ও তাহাদের গোপন রহস্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত তবুও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যাহাতে তাহাদের সত্যতার মর্যাদা অন্যান্যদের সামনে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কিয়ামতের দিন তাহাদের সৌন্দর্য খুলিয়া সামনে আসে। ইহা এই উদাহরণের মাধ্যমে বুঝা যায়, যেমন এক মনিব স্বীয় গোলামকে জিজ্ঞসাবাদ করিল যে, তুমি অমুক অমুক বিষয়ে কি কি করিয়াছ? অথচ মনিব খুব ভাল করিয়া জানে যে, গোলাম বিষয়গুলি খুব ভালভাবে মজবুত করিয়া সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্ব্যসত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করার দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হইল উপস্থিত লোকদের অবগত করানো যে, গোলাম মনিবের দেয়া দায়িত্বের প্রতি কত বেশী গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে আর গোলামের প্রতি মনিবেরও কত অনুগ্রহ রহিয়াছে। হযরত শায়খ (রহঃ) দু'আর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার হিসাব যেন না হয়। হিসাব তো জিজ্ঞাসাবাদেরই ফল। সুতরাং কাহারও জিজ্ঞাসাবাদ না হইলে হিসাবও হইবে না। আর যে এই দুইটি বিষয় হইতে মুক্ত রহিল সে আযাব থেকে মুক্ত থাকিবে। বিষয়ত্রয় এমন এক সম্পর্কে আবদ্ধ যে, একটি অপরটির অপরিহার্য ফল। কিন্তু হযরত শায়খ (রহঃ) প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাতে খুশ গাওয়ার রিযকের মধ্যে কতগুলি অনুগ্রহ নিহিত রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহারা এত মূল্যবান অনুগ্রহ যে যদি খুশ গাওয়ার রিযকে এইসব অনুগ্রহের মধ্যে মাত্র একটিও বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলেও ইহা যথোপযুক্ত হইত।

শায়খ (রহঃ) দু'আর মধ্যে বলিয়াছিলেন-

"আমরা যেন হাকীকত ও তাওহীদের উপর কায়েম থাকিতে পারি।"

তাঁহার এই দোআর সারকথা হইল এই যে, হে পরোয়ারদিগার! আপনি আমাদিগকে রিযক হিসাবে যে সব জিনিস দিয়াছেন তাহাতে যেন আপনার মুশাহিদা করি অর্থাৎ আপনাকে প্রত্যক্ষ করি। আপনার প্রদত্ত আঁহার্য বস্তুতে যেন আপনাকে দেখি। অন্য কাহাকেও না দেখি। অন্যের দিকে যেন ইহাদের সম্পর্ক না করি বরং আপনার দিকে করি।

আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। যদি বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে অন্য লোক তাহাদিগকে আহার করাইতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা

আল্লাহর দস্তরখানাতেই আহার করিতে থাকে। কেননা তাহাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মালিক নাই। এই বিশ্বাসের কারণে তাহাদের অন্তর থেকে সৃষ্টির মুশাহিদা (সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি) মিটিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি ভালবাসা নিবদ্ধ করে না। স্বীয় আন্তরিক আকর্ষণ অন্য কাহারও প্রতি মনোনিবেশ করে না। কারণ তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, আল্লাহ পাকই তাহাদিগকে আহার করান আর স্বীয় অনুগ্রহে তিনিই তাহা প্রদান করেন। তিনিই সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি আমাদের ভালবাসা নাই অর্থাৎ আমাদের ভালবাসা মাখলুকের প্রতি ধাবিত হয় না।

জনৈক ব্যক্তি তাহার এই বক্তব্যের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল যে, আপনার পিতামহ তো আপনার দাবী অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহা অস্বীকার করিতে গিয়া দলীল হিসাবে হাদীছ পেশ করিয়াছেন। যেমন-

جبلت القلوب على حُبِّ مَنْ احسن اليها *

"অন্তর এমনভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে যে ইহা ইহসানকারীকে ভালবাসে।"

তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা এমন লোক যে আমরা খোদা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ইহসানকারী মনে করি না। এই জন্যই আমাদের অন্তরে তাঁহার মহব্বত পয়দা হয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আল্লাহই আহার করাইয়া থাকেন। তাহার প্রতি আল্লাহ পাকের নতুন নতুন নিয়ামত যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে দিন দিন তাহার অন্তরে ততই আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহকে মহব্বত কর। কেননা তিনি তোমাদিগকে নিয়ামত আহার করাইতেছেন। ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

যখন কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই খাদ্য প্রদান করেন তাহার এই মোরাকাবা তাহাকে মাখলুকের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে এবং খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও দিকে মহব্বতের সাথে অন্তর ঝুকাইয়া দেওয়া থেকে রক্ষা করে। তোমরা কি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা শুন নাই?

و الذي هو يطعمني و يسقين *

"আল্লাহ পাকই আমাকে আহার করান এবং আমাকে পান করান।"

সুতরাং তিনি এই ব্যাপারে আল্লাহকে অদ্বিতীয় শরীকহীন বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন।

শায়খ (রহঃ) স্বীয় দোআতে বলিয়াছেন, তিনি যেন তাওহীদ ও শরীয়তের উপর কায়েম থাকেন।"

ইহার কারণ যে ব্যক্তি বলে যে, এক মাত্র আল্লাহ্ পাকই সবকিছুর মালিক। তাহার ব্যতীত অন্য কাহারও মালিকানা সত্ত্বা নাই। এই কথা বলিয়াও বেপরোয়া হইয়া গিয়াছে। শরীয়তের বাহ্যিক আহকাম পালনে পাবন্দী করে না। এই ব্যক্তি নিজকে ধৈর্যহীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার এই অবস্থা তাহার জন্য বিপদ। কিন্তু বাস্তবে তো এমন হওয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে তাহার এই বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং শরীয়তের পাবন্দ হওয়া। মোহাক্কেক ব্যক্তি এমনই হইয়া থাকে। এমন যেন না হয় যে, শুধু এই বিশ্বাস লইয়াই বসিয়া আছে আর শরীয়তের আহকামের প্রতি লক্ষ্য করে না। আবার এমনও না হয় যে, শুধু শরীয়তের আহকামের সাথে লাগিয়া আছে কিন্তু এই প্রকৃত আন্তরিক অবস্থার খবরই নাই। বরং উভয় বিষয় লইয়া চলা উচিত। বাহ্যিকভাবে তো দেখা যায় যে, মালিকানা মাখলুকের রহিয়াছে। একটুকুতে ক্ষান্ত থাকা হাকিকতের পরিভাষায় শিরক। পক্ষান্তরে আল্লাহর মালিকানার এই বিশ্বাস লইয়া চলা এবং শরীয়তের পাবন্দ না থাকা তো অর্থহীন। সুতরাং হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থান উভয়ের মধ্যে। (অর্থাৎ হেদায়েত উভয়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে) যেমন গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে পরিস্কার ও নির্ভেজাল দুধ বাহির হইয়া আসে যাহা পানকারীদের গলার ভিতর দিয়া সহজে নীচে নামিয়া আসে।

রিযক সম্পর্কিত আনুসাঙ্গিক বিষয়াবলী

রিযকের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা দিয়া থাকে। ইহাদের অনেকগুলি শায়খ (রহঃ) স্বীয় নিম্নোক্ত বক্তব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। শায়খ বলেন, হে আল্লাহ! রিযক সম্পর্কিত বিষয়গুলি আমার অধীনস্থ করিয়া দিন। রিযকের প্রতি লোভ-লালসা করা থেকে, রিযক উপার্জনে কষ্ট ভোগ করা থেকে, ইহার প্রতি অন্তর ডুবিয়া যাওয়া থেকে, ইহার কারণে মাখলুকের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে, ইহার উপার্জনে চিন্তা ভাবনায় ডুবিয়া যাওয়া থেকে এবং ইহা অর্জিত হওয়ার পর ইহার লোভ লালসা করা এবং কৃপণতা থেকে রক্ষা করুন। রিযকের ক্ষেত্রে যে সকল সুবিধা অসুবিধা দেখা দেয় ইহা সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং পরিপূর্ণ বর্ণনা পেশ করা সম্ভব নয়। এই জন্য আমরা শুধু শায়খের উল্লেখিত বিষয়গুলি

সম্পর্কে আলোচনা করিব। রিযকের সাথে বান্দার তিনটি অবস্থা সম্পর্কিত। প্রথমাবস্থা রিযক লাভের পূর্ববস্থা অর্থাৎ রিযক অর্জনে প্রয়াস চালানোর অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ ইহার পরের অবস্থা। অর্থাৎ অর্জিত হওয়ার সময় অবস্থা। তৃতীয়তঃ উল্লেখিত অবস্থাদ্বয় কাটিয়া যাওয়ার পরের অবস্থা। অর্থাৎ রিযক শেষ হইয়া যাওয়ার অবস্থা।

রিযক অর্জিত হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা লোভ-লালসার অবস্থা। সুতরাং রিযক অর্জন করিতে গিয়া মেহনত পরিশ্রম করা, ইহার প্রতি অন্তর লাগাইয়া দেওয়া, স্বীয় ধ্যান ধারনা ইহার সাথে সম্পর্কিত করা, ইহার জন্য মাখলুকের সামনে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া, ইহার অর্জনে ধ্যান ধারণা মনোনিবেশ করিয়া বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা লোভ লালসার অন্তর্ভুক্ত। অতএব লোভ লালসার সারকথা হইল রিযক উপার্জনে ঝুঁকিয়া পড়া এবং অন্ধপ্রায় হইয়া যাওয়া। আর বান্দার মধ্যে এই অবস্থা জন্ম লাভ করে খোদার উপর ভরসা না থাকা এবং একীন দুর্বল হওয়ার কারনে। একীন দুর্বল হয় এবং খোদার উপর ভরসা হারায় অন্তরে নূর না থাকার কারণে। অন্তরে নূর না থাকার কারণ হইল অন্তরের সামনে পর্দা পড়া। কেননা, একীনের নূর যদি তাহার অন্তরে ছড়াইয়া থাকিত তাহা হইলে তাহার জন্য নির্ধারিত রিযকের প্রতি তাহার বিশ্বাস স্থাপিত হইত। তাহার অন্তরে লোভলালসা স্থান পাইত না। সে দৃঢ় বিশ্বাস করিত যে, আল্লাহ পাক আমার জন্য যতটুকু রিযক নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছিবে।

রিযক উপার্জন করার ক্ষেত্রে দুই প্রকার ক্লান্তি আসিয়া থাকে। দৈহিক ক্লান্তি এবং রূহানী ক্লান্তি। যদি দৈহিক ক্লান্তি আসে তাহা হইলে ইহা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কেননা রিযক অন্বেষণকারী যদি দৈহিকভাবে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহার এই ক্লান্তি তাহাকে আহকাম পালনে বিরত করিয়া ফেলে। আরামের সাথে যে রিযক পাওয়া যায় ইহার ফলে ইবাদত ও আহকাম পালন সাবলীল হয়। পক্ষান্তরে যদি রূহানী ক্লান্তি আসে তখন আরও অধিক আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তাহার এই অবস্থা রিযক অন্বেষণের ক্ষেত্রে তাহাকে আরও কষ্টে পতিত করিবে। ইহাতে চিন্তা ফিকির করার দ্বারা তাহার বোঝা আরও ভারী হইবে। অবশ্য তাওয়াক্কুল ব্যতীত আরাম অর্জিত হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ পাক তাহার বোঝা হালকা করিয়া দেন। তিনি নিজেই ইহার বিনিময় প্রদান করেন। আল্লাহ পাক বলেন, و من يتوكل على الله فهو حسبه "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ পাক তাহার জন্য যথেষ্ঠ।"

অতঃপর হযরত শায়খ (রহঃ) দোআতে বলেন, আল্লাহ পাক যেন তাহার অন্তরকে রিযক উপার্জনে জড়াইয়া পড়া হইতে এবং ইহার ফিকিরে পড়া হইতে হেফাজত করেন। সুতরাং রিযকের ব্যাপারে অন্তর জড়াইয়া পড়া আল্লাহর ও বান্দার মধ্যে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, যে সব জিনিস অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখে তাহা মাত্র দুইটি জিনিস। রিযকের ফিকির ও মাখলুকের ভয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রিযকের ফিকিরও প্রতিবন্ধকতা। কেননা অনেক লোক এমনও রহিয়াছে যাহারা মাখলুককে ভয় করে না, কিন্তু রিযকের চিন্তামুক্ত হইতে পারে না। ইহা প্রমাণের জন্য তুমি নিজের মধ্যে খেয়াল কর যে, তোমার অস্তিত্বের সাথে সাথেই তুমি রিযকের মুখাপেক্ষী। আর রিযক এমন জিনিস যাহা দ্বারা তোমার দেহ ঠিক থাকে আর তোমার শক্তি সুদৃঢ় হয়।

হযরত শায়খ (রহঃ) রিযকের চিন্তায় পড়া হইতে হেফাজত চাহিয়া দোআ করিয়াছেন। রিযকের চিন্তায় পড়ার অর্থ রিযক অর্জন করার জন্য স্বীয় শক্তি এইভাবে নিয়োজিত করা যে, সে এই চিন্তায় নিমজ্জিত হওয়ার অবস্থায় পতিত হইয়া যায়। ইহার সাথে অন্য কোন কিছু চিন্তা করার সুযোগ পায় না। আর বান্দার এমন অবস্থা বান্দা আল্লাহ হইতে দূরে ছিটকাইয়া পড়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার নূরকে নির্বাপিত করিয়া দেয়। বান্দার এই অবস্থা উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতে থাকে যে, এই ব্যক্তির অন্তর একীনের নূর হইতে উজাড় হইয়া গিয়াছে এবং শক্তির দিক থেকে দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। শায়খ (রহঃ) স্বীয় দোআতে উল্লেখ করিয়াছেন যে রিযকের জন্য তাহাকে মাখলুকের সামনে যেন লজ্জিত ও অপমানিত না করা হয়। যে ব্যক্তির বিশ্বাসে দুর্বলতা রহিয়াছে এবং বিবেক নামক মহামূল্য সম্পদ যাহার ভাগ্যে স্বল্প জুটিয়াছে তাহার লজ্জা ও অপমান তো অবশ্যম্ভাবী। কেননা এমন ব্যক্তি মাখলুক থেকেই আশা করে, পক্ষান্তরে সৃষ্টিকর্তার প্রতি হয় না তাহার নির্ভরতা। সে আল্লাহ পাকের বন্টনের প্রতি লক্ষ্য করে না। ওয়াদা পূরনে তিনি সত্যবাদী এই কথার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয় না। এই জন্যই সে মাখলুককে খোশামোদ করে। তাহার কাছে আশা করে। তাই সে আল্লাহ থেকে বিরাগী হইয়াছে। পরকালে তাহার যে শাস্তি হইবে তাহা আরও কঠিন হইবে।

যদি এই ব্যক্তির ঈমান ও তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হইত তাহা হইলে সে আল্লাহ পাক থেকে সম্মান লাভ করিত। আল্লাহ পাক বলেন,

و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين *

"এবং আল্লাহর জন্যই সম্মান এবং তাঁহার রাসূল ও মুমিনীনদের জন্যও।"

সুতরাং মুমিন স্বীয় প্রতিপালক থেকে সম্মান অর্জন করিয়া থাকে। অন্য কাহারো নিকট হইতে সম্মান লাভ করে না। কেননা মুমিন দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, সকল সম্মান আল্লাহরই। তিনিই সম্মানিত। তাঁহার সামনে কেহও সম্মানিত নহে। তিনিই সম্মান প্রদান করেন। অন্য কেহ নহে। অতএব এই ব্যক্তির খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তাহাকে সম্মানিত করিয়াছে। তাওয়াক্কুল তাহাকে সহায়তা করিয়াছে।

সে লাঞ্ছিত হইতে পারে না কারণ আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার ভাগ্যে যাহা নির্ধারিত হইয়াছে উহার প্রতি তাহার নির্ভেজাল ভরসা রহিয়াছে। তাহার কোন চিন্তা নাই কারণ আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি তাহার পূর্ণ নির্ভরতা রহিয়াছে। সে আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণী শ্রবন করিতেছে-

وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ *

"তোমরা লাঞ্ছিত হইও না এবং চিন্তাযুক্ত হইও না, তোমরাই উচ্চে থাকিবে যদি তোমরা ঈমানদার হও।"

সুতরাং মাখলুক থেকে কোন কিছু আশা না করা এবং প্রকৃত বাদশাহ মহান আল্লাহ পাকের প্রতি আস্থা রাখার মধ্যেই ঈমানদারের সম্মান। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে স্বীয় প্রয়োজন পুরা করার জন্য যাওয়া এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি স্বীয় অন্তর ঝুঁকানো ঈমানদারের ঈমান মানিয়া লইতে পারে না। জনৈক ব্যক্তি বলেন,

ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কখনও নহে বৈধ।
কাহারো কাছে কিছু পাওয়ার আশা করে আল্লাহ ব্যতীত।
হে বন্ধু! থামিয়া দাঁড়াও এবং আল্লাহর যিকির করিতে থাক।
তাঁহার মধ্যে নিজকে বিলাইয়া দাও। ইহাতেই তোমার জীবন।
মূল্‌ক জয় করা তো বাদশাহদের ভাগ্য।
কিন্তু তিনি এমন এক বাদশাহ কখনও নাই ধ্বংস যাহার।

আল্লাহ পাক যাহাকে লোভ লালসার দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করিয়াছেন আর আল্লাহর ভয়ে গুণান্বিত হওয়ার সম্মান দান করিয়াছেন তাহার উপর আল্লাহ পাকের বড় অনুগ্রহ হইয়াছে। তাহাকে পরিপূর্ণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

ইহাও মনে রাখা চাই যে, আল্লাহ পাক আমাদিগকে বিভিন্ন পোষাক প্রদান

করিয়াছেন। যেমন ঈমান, আল্লাহর পরিচয়, ইবাদত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ প্রভৃতি। সুতরাং মাখলুকের কাছে পাওয়ার আশা করিয়া, অন্যের আশ্রয় তালাশ করিয়া উল্লিখিত পোষাক ময়লাযুক্ত করিও না।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করিয়াছি। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলিলেন, "হে আলী! তোমার কাপড়-চোপড় ময়লা থেকে পরিস্কার রাখ। প্রতি শ্বাসে তোমার কাছে আল্লাহর সাহায্য পৌঁছিবে।" আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার কাপড় চোপড় কি? তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দিলেন মনে রাখিও, আল্লাহ পাক তোমাকে ঈমান, আল্লাহর পরিচয়, তাওহীদ, মহব্বত প্রভৃতি পোশাক দান করিয়াছেন।

হযরত শায়খ (রহঃ) বলেন যে, তখন আমার কুরআনের و ثيابك فطهر (তোমার কাপড় পাক রাখ) আয়াতের অর্থ বুঝে আসিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনিবে সব জিনিসই তাহার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হইবে। যে আল্লাহকে ভালবাসিবে অন্য সব কিছু তাহার কাছে সম্মানহীন বলিয়া মনে হইবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে অদ্বিতীয় বলিয়া জানিবে সে তাঁহার সাথে কোন কিছুকে শরীক করিবে না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখিবে সে যে কোন বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে। যে আল্লাহর অনুগত হইবে সে তাঁহার নাফরমানী করিবে না। যদি কোন কথায় তাঁহার নাফরমানী করিয়া ফেলে তাহা হইলে ওজর পেশ করিয়া ক্ষমা চাহিতে থাকিবে। আর ওজর পেশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কবুল হয়।

একটি বিষয় বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে, আখেরাতের সফলতার পথের পথিকের জন্য মাখলুক থেকে কিছু পাওয়ার আশা উঠাইয়া লওয়া এবং ইহাদের সাথে সম্পর্ক না রাখা এমন শোভনীয় ভূষণ যে নববধুর অলংকারাদিও ততটুকু নয় শোভনীয়। এমনকি জীবনের জন্য পানির যতটুকু প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহার এই দুইটি গুণে গুণান্বিত হওয়ার আরও অধিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

যখন কাহাকেও রাজ পোশাক পরিধান করানো হয় আর সেও তাহা যত্নের সাথে হেফাজত করিয়া রাখে। তাহা হইলে এই পোষাক তাহার কাছে থাকাই সমীচীন এবং তাহার থেকে এই পোশাক ছিনাইয়া লওয়া ঠিক নয়। তবে এই পোশাক পাওয়ার পর যদি তাহা ময়লাযুক্ত করিয়া ফেলে তাহা হইলে ইহা

তাহার কাছে থাকিতে দেওয়া সঙ্গত নয়।

সুতরাং হে ভ্রাতা! মাখলুকের কাছে পাওয়ার আশা রাখিয়া স্বীয় ঈমান ময়লাযুক্ত করিও না। মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি নির্ভর করিও না। যদি তুমি আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে সম্মান অর্জন কর তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, এই সম্মান চিরস্থায়ী হইবে। কারণ আল্লাহ্ পাক চিরস্থায়ী। পক্ষান্তরে যদি কেহ অন্যের নিকট থেকে সম্মান অর্জন করে তাহা হইলে উহা স্থায়ী হইবে না। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ চিরস্থায়ী নহে।

এক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে এক পংক্তি শুনাইয়াছেন।

(ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল)

"মহান প্রতিপালকের কাছে সম্মান চাও। এই সম্মান স্থায়ী হয়। মৃত ব্যক্তিরও সম্মান আছে। কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী নয়।"

এক ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে কোন এক আরিফের কাছে আসিল। তিনি তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি জবাব দিল যে, তাহার ওস্তাদ মারা গিয়াছে। আরিফ বলিলেন, তুমি এমন ব্যক্তিকে ওস্তাদ বানাইলে কেন যে মরিয়া যায়? আরিফের কথার উদ্দেশ্য হইল এমন এক সত্ত্বাকে তোমার ওস্তাদ বানানো উচিত ছিল যাহার কখনও মৃত্যু আসিবে না।

তোমাকে বলা হইতেছে যে, যদি তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো কাছে সম্মান তালাশ কর সম্মান পাইবে না। অনুরূপভাবে অন্য কাহারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর আশ্রয়ও পাইবে না। যেমন হযরত মুসা (আঃ) সামেরীকে বলিয়াছিলেন, তুমি যে মাবুদের কাছে নিজকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলে সে মাবুদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমি উহাকে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া নদীতে উড়াইয়া দিব। ইহা তোমার মাবুদ হইতে পারে না বরং এমন এক সত্ত্বা তোমার মাবুদ যাহার ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নহে। তাঁহার জ্ঞান সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছে।

সুতরাং হে ব্যক্তি! তুমি ইবরাহীমী হও। তোমার প্রতিপালক ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতিপালক। ইবরাহীম (আঃ) বলিয়াছেন,

لا احب الافلين *

"নিঃশেষ হইয়া যায় এমন জিনিসকে আমি পছন্দ করি না।"

আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু নিঃশেষ হইয়া যায়। ধ্বংসশীল। কোন কোন জিনিস

এমন রহিয়াছে যাহা এখনই ধ্বংস হইতেছে বা হইয়াছে। আবার কতক জিনিস এমনও রহিয়াছে যাহা এখনও ধ্বংস হয় নাই তবে একদিন না একদিন ধ্বংস হইয়া পড়িবে। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব জিনিস অবশ্যই ধ্বংসশীল। আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়াছেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম নীতি অনুসরণ করার অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা স্বীয় পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম নীতি অনুসরণ কর। সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তির জন্য হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম নীতির অনুকরণ করা ওয়াজিব। মাখলুকের কাছে কোন কিছুর আশা না করা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম নীতির অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্য কর যেদিন হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে দূরে নিক্ষেপকারী যন্ত্রের উপর বসাইয়া তাঁহাকে দূর হইতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) সামনে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব দিলেন। তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জবাব দিলেন যে, আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহর কাছে আমার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমি তাঁহার মুখাপেক্ষী। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ঠিক আছে। তাহা হইলে তাঁহার নিকট দোআ করুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) জবাব দিলেন, আল্লাহ পাক আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। তাঁহার অবগত থাকাই আমার জন্য যথেষ্ঠ। সুতরাং আমার চাওয়া লাগিবে না। একটু লক্ষ্য কর হযরত ইবরাহীম (আঃ) কিভাবে নিজের হিম্মতকে মাখলুকের উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন? আর ইহাকে কিভাবে প্রকৃত বাদশাহের দিকে নিয়োজিত করিয়াছেন? তিনি জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না আর নিজকে দোআর যিম্মায়ও সোপর্দ করিলেন না। বরং আল্লাহ পাককে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এবং দোআ করা অপেক্ষাও নিকটবর্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। আল্লাহ পাকও তাহাকে নমরূদের হাত থেকে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহার প্রতি স্বীয় অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করিলেন। তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন।

মোটকথা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মনীতির মধ্যে একটি বিশেষ নীতি হইল এই যে, আল্লাহ পাক থেকে গাফেল করিয়া ফেলে এমন জিনিসের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা এবং স্বীয় শক্তি সাহস আল্লাহ পাকের প্রতি নিয়োজিত করা। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার কথা কুরআনে পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে-

فانهم عدو لى الا رب العلمين *

"নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ পাক ব্যতীত তাহাদের (সকলের) সাথে আমার শত্রুতা রহিয়াছে।"

অতএব তাহাদের কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা কাটিয়া দেওয়া ইবরাহীমী ধর্মনীতির অনুকরণ।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন যে, "আমি নিজের কোন উপকার করিতে পারা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং অন্যে আমার উপকার করিতে পারিবে এই সম্বন্ধে কেন নিরাশ হইব না। অন্যান্যদের জন্য আল্লাহ থেকে পাওয়ার আশা রাখি আর নিজের জন্য অনুরূপ আশা কেন রাখিব না?"

ইহা একটি বড় নিয়ামত। যে ব্যক্তি ইহা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে সে তো এমন এক দৌলত অর্জন করিয়াছে যাহার কোন অভাব দেখা দিতে পারে না। সে এমন এক সম্মান লাভ করিয়াছে যাহাতে কখনও অপদস্থতা আসে না। সে খরচ করার নিমিত্ত এমন সম্পদ লাভ করিয়াছে যাহা নিঃশেষ হইবার নয়। ইহা এমন ব্যক্তির জন্য কিমিয়া যাহার বিবেক আল্লাহর দিকে।

হযরত শায়ক আবুল হাসান (রহঃ)-এর কাহিনী

হযরত শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আমার পিছু ধরিয়াছে। ইহা কিন্তু আমার কাছে খুবই অপছন্দনীয় মনে হইল। আমি তাহার সাথে সহজ হইতে চাহিলাম। ফলে সেও ইহা বুঝিতে পারিয়া আমার সাথে সহজ হইয়া পড়িল। অতঃপর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে বৎস! তোমার কি প্রয়োজন? তুমি আমার পিছনে পিছনে আসিতেছ কেন? সে বলিল, হযরত! আমি শুনিয়াছি যে, আপনি কিমিয়া [১] জানেন? আমি ইহা শিক্ষা করার জন্য আপনার পিছনে আসিয়াছি। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি সত্য বলিয়াছ। আর যে তোমাকে এই সম্বন্ধে খবর দিয়াছে সেও সত্য বলিয়াছে। কিন্তু আমার ধারনা যে তুমি তাহা কবুল করিবে না। সে বলিল, কেন কবুল করিব না? অবশ্যই কবুল করিব। আমি বলিলাম, আমি মাখলুকের (সৃষ্টি জগতের) প্রতি দৃষ্টি দিয়াছি। দেখিতে পাইয়াছি যে, ইহা দুইভাগে বিভক্ত। কতক শত্রু আর কতক বন্ধু। শত্রুর দিকে দেখিয়াছি। তখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কোন কাঁটাও ফুটাইতে পারে না। তখন আমি তাহাদের থেকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছি। এখন আমি ইহাদের কোন পরওয়া করি না।

অতঃপর বন্ধুদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারাও আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন উপকার করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের

১। কিমিয়া লোহা ও পিতলকে স্বর্ণে পরিণত করার কৌশল।

থেকেও নিরাশ হইয়াছি। অতঃপর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করিয়াছি। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে আমাকে বলা হইয়াছে যে এই বিষয়ে ইহার হাকিকত পর্যন্ত তখনই পৌঁছিতে পারিবে যখন আমার (আল্লাহ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হইবে এবং তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত বিষয়ের অতিরিক্ত কেহ কিছু করিতে পারা সম্পর্কে সম্পূর্নরূপে নিরাশ না হইবে।

একদা তিনি বলেন, তখনও তাহার কাছে কোন ব্যক্তি কিমিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তখন তিনি জবাব দিয়াছিলেন অন্তর থেকে লোভ লালসা দূরীভূত কর। তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত অংশ অপেক্ষা অধিক পাইতে পার বলিয়া আশা পরিত্যাগ কর।

স্বীয় দৈনন্দিন আমল নিয়মিতভাবে সর্বদা করিতে থাকে। ফলে অন্তরে নূর পয়দা হইবে। নূর পয়দা হওয়ার আলামত হইল যে, অন্তর অন্যান্যদের থেকে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে।

আন্তরিকভাবে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হইয়া যাও। তাঁহার অধীন হও।

স্বভাবের দাসত্ব হইতে মুক্ত হও। তাকওয়ার সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত হও। ইহার দ্বারা আমলের মধ্যে সৌন্দর্য আর অবস্থার মধ্যে সাফাই আসে।

আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً *

"নিশ্চয়ই আমি যমীনের উপরস্থ জিনিসসমূহকে যমীনের জন্য শোভা হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারি যে, তাহাদের মধ্যে কাহার আমল সুন্দর।"

আমলের মধ্যে সৌন্দর্য অর্জিত হইতে যেসব গুণের প্রভাব রহিয়াছে তাহা হইল বিবেক আল্লাহর দিকে হওয়া। বিবেক আল্লাহর দিকে হওয়ার অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য থেকে বিমুখ হইয়া আল্লাহর মুখাপেক্ষী হইয়া যাওয়া। শুধু তাঁহাকে যথেষ্ট মনে করা। তাঁহারই উপর নির্ভর করা। তাঁহার কাছেই নিজের প্রয়োজন পেশ করা। সর্বদা তাঁহার সামনে থাকা। এই সবকিছু বিবেক আল্লাহর দিকে হওয়ার ফলশ্রুতি।

অন্যান্য গুণাবলী অপেক্ষা নিজের মধ্যে তাকওয়া পয়দা করার প্রয়াস অধিক চালাও। মাখলুক থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা থেকে পবিত্র থাক। কেননা

মাখলুক থেকে পাওয়ার আশাবাদী যদি সপ্ত সমুদ্রের পানি দ্বারাও পবিত্র হইতে চায় তাহা হইলেও কোন কিছু তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না। তবে মাখলুক থেকে নিরাশ হওয়া এবং তাহাদের থেকে স্বীয় আশা আকাঙ্খা উর্ধ্বে রাখা ব্যতীত এই ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে না।

হযরত আলী (রাঃ) বসরায় আগমন করিয়াছেন। জামে মসজিদে আসিয়া দেখিলেন যে, বিভিন্ন বক্তা ওয়াজ করিতেছেন। তিনি বক্তাদেরকে একে একে থামাইয়া দিলেন। অবশেষে হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কাছে পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, হে যুবক! আমি তোমাকে একটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব। যদি সঠিক উত্তর দিতে পার তাহা হইলে তোমাকে ওয়াজ করিবার অনুমতি প্রদান করিব। অন্যথায় তোমাকেও উঠাইয়া দিব। অবশ্য হযরত আলী (রাঃ) তাহার মধ্যে উত্তর প্রদানের যোগ্যতার নিদর্শনও দেখিতে পাইয়াছিলেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) আরয করিলেন, আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করুন।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, বলত দেখি! দ্বীনের মূল জিনিস কি? তিনি জবাব দিলেন, তাকওয়া। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বীনের মধ্যে অনিষ্টকারী কি? তিনি জবাব দিলেন, লোভ-লালসা। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ঠিক আছে! বসিয়া ওয়াজ কর। তোমার মত মানুষ ওয়াজ করিতে পারিবে।

শায়খ আবুল আব্বাস (রঃ)-এর কাছে শুনিয়াছি যে তিনি বলিতেন আমি জীবনের প্রাথমিককালে ইসকান্দরিয়া শহরের সীমান্ত এলাকায় থাকিতাম। কোন একজন পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্ধ দেরহাম মূল্যে কোন একটি জিনিস খরিদ করিলাম। অতঃপর আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, হয়তবা এই ব্যক্তি আমার কাছ থেকে ইহার দাম নিবে না। তখনই অদৃশ্য থেকে এক ব্যক্তি আওয়াজ দিল যে মাখলুকের কাছে কোন কিছু লোভ না করার মধ্যে দ্বীনের হেফাজত। আমি তাহার কাছে শুনিয়াছি যে মাখলুকের কাছে আশাবাদী ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় না। লক্ষ্য কর طمع (লোভ) শব্দটি তিন বর্ণে গঠিত। আর তিনটি বর্ণই খালী। যেমন ط-م-ع

সুতরাং হে মুরীদ! তোমার জন্য একান্ত অপরিহার্য যে, মাখলুকের কাছে কোন কিছু আশা করা হইতে তোমার আকাঙ্খা উর্ধ্বে রাখ। রিযকের ব্যাপারে তাহাদের সামনে অপদস্থ হইও না। কেননা রিযকের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর

হাতে। তোমার অস্তিত্বের পূর্বেই তোমার রিযক বন্টন করিয়া রাখা হইয়াছে। আর তুমি প্রকাশ্যে আসার পূর্বেই তাহা স্থির করা হইয়াছে।

এক বুযুর্গের বাণী শ্রবণ কর, হে মানব! যে সকল জিনিস চোয়ালের দ্বারা চাবানোর জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে চোয়াল অবশ্যই তাহা চাবাইবে। (অর্থাৎ যাহা যেভাবে সম্পাদন হওয়ার জন্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই সেভাবে হইবে।) সুতরাং তোমার রিযক তুমি সম্মানের সাথে খাও। অপমানের সাথে খাইও না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে চিনিবে সে আল্লাহ পাকের অভিভাবকত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণের প্রতি নির্ভরশীল হইবে। নিজের কাছে রক্ষিত বস্তু অপেক্ষা আল্লাহর কাছে মওজুদ বস্তুর প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত অধিক নির্ভরতা না থাকিবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত মাখলুকের দায়িত্ব গ্রহণ অপেক্ষা আল্লাহর দায়িত্ব গ্রহণের প্রতি অধিক ভরসা না থাকিবে বুঝিতে হইবে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। জাহেল (মূর্খ) সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ যে তাহার মধ্যে এই অবস্থা বিদ্যমান নাই।

এক আরিফ ব্যক্তির কাহিনী

এক ব্যক্তি এক আরিফ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল যে, সে সর্বদা জামে মসজিদে নিজকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মসজিদ হইতে বাহির হয় না। ইহা দেখিয়া তাহার খুব আশ্চার্য হইল। তাহার মনে এক প্রশ্নের উদ্রেক হইল যে, এই আরিফ ব্যক্তি খানাপিনা করে কোথায় থেকে? আরিফ ব্যক্তি তাহার অন্তরের কথা বুঝিতে পারিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার খানাপিনা কোথায় থেকে আসে? তুমি কোথায় থেকে খানাপিনা কর? সে জবাব দিল আমার একজন ইহুদী বন্ধু আছে। সে আমার সাথে ওয়াদা করিয়াছে যে, সে প্রতিদিন আমাকে দুইটি করিয়া রুটি প্রদান করিবে। ওয়াদা মোতাবেক সে দুইটি করিয়া রুটি দিয়া যাইতেছে। আরিফ ব্যক্তি বলিল, তুমি তো নিজের জন্য ইহুদী বন্ধুর ওয়াদার প্রতি ভরসা করিয়াছ। কিন্তু আমার জন্য আল্লাহ পাকের ওয়াদার প্রতি ভরসা কর নাই। অথচ আল্লাহ পাকের ওয়াদা সর্বদা সত্য। তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তিনি নিজেই বলেন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا *

"এমন কোন প্রাণী নাই যাহার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর যিম্মায় নহে। তিনি ইহার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থিতি ও ক্ষণস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত আছেন।"

সে ব্যক্তি তাহার কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। এক বুযুর্গের ঘটনা। কয়েক দিন ধরিয়া এক ইমামের পিছনে নামাজ পড়িতেছিল। ইমাম দেখিল যে, এই বুজুর্গ সর্বদা মসজিদে বসিয়া থাকেন এবং জাগতিক বাহ্যিক আসবাব বর্জন করিয়াছেন। ইমাম বড়ই আশ্চার্য বোধ করিল। ইমাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি কোথায় থেকে আহার করেন? বুযুর্গ বলিলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি তোমার পিছনে পঠিত নামাজ প্রথমে পূণর্বার পড়িয়া লই। অতঃপর তোমার প্রশ্নের জবাব দিব। কেননা, আমি এমন ব্যক্তির পিছনে নামায পড়িতে চাই না যে আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।

এই সম্বন্ধে আরও অনেক ঘটনা রহিয়াছে।

কোন এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিল যে, যদি কোন ব্যক্তিকে একটি কোঠায় আবদ্ধ করিয়া উপরের দিক হইতে ঢালাই করিয়া পাকা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার রিযক কোথায় হইতে কিভাবে আসিবে? হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন যে, যেখান থেকে মৃত্যু আসিবে সেখান থেকেই রিযক আসিবে। লক্ষ্য কর.এই দলীলটি কত উজ্জ্বল ও সুদৃঢ়।

হযরত শায়খ (রহঃ) বলিয়াছিলেন, “আমাদিগকে রিযকের ফিকির করা হইতে এবং তদবীর করিয়া ইহা অর্জন করা হইতে বাঁচান।” ফিকির করার অর্থ দেহ ঠিক থাকার জন্য অবশ্যই খাদ্য প্রয়োজন এই খেয়াল অন্তরে পয়দা করা।

আর তদবীর করার অর্থ মনে মনে কল্পনা করা যে, অমুক অমুক পন্থায় রিযক উপার্জিত হইবে। অতঃপর কল্পনা করা যে রিযক অর্জন করার জন্য অমুক অমুক জিনিস ব্যবহারে আনিতে হইবে। এইরূপ কল্পনা জল্পনায় লিপ্ত হওয়া আর ধীরে ধীরে কল্পনা বাড়িতে থাকা। অবশেষে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়া যাওয়া যে নামাজেও তাহার খবর নাই যে এই চিন্তা কতটুকু বাড়িয়াছে। তিলাওয়াতের খবর নাই যে, কতটুকু বাড়িয়াছে। এমন অবস্থায় পৌঁছার পর যে ইবাদতে প্রথমে তাহার অন্তর লাগিত এখন তাহাতে অন্তর লাগে না। ইবাদত ময়লাযুক্ত বস্তুর ন্যায় বিরক্তিকর মনে হয়। ইহার নূর তাহার ভাগ্য হইতে উধাও হয়। ইহার বিভিন্ন রহস্য থেকে হয় বঞ্চিত।

সুতরাং যখন এই ধরণের কল্পনা তোমাকে পাইয়া বসে তখন তাওয়াক্কুলের কোদাল দ্বারা ইহা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেল। একীনের অস্তিত্ব দ্বারা ইহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও।

জানিয়া রাখ যে, তোমার তদবীরের ফলাফল কি হইবে তাহা তোমার

জন্মের পূর্বেই আল্লাহ পাক বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যদি তুমি নিজের জন্য মঙ্গল প্রত্যাশী হও তাহা হইলে তদবীর করা হইতে বিরত থাক। কেননা তদবীর করিলে তোমাকে তোমার প্রতি সোপর্দ করা হইবে। আল্লাহর মেহেরবানীর সাহায্য তোমার কাছে পৌঁছিবে না। আল্লাহ পাক ঈমানদারকে তদবীর করিতে আর তকদীরের মোকাবিলা করিতে দেন না।

যদি কোন কারণে তোমার মধ্যে তদবীর করার অবস্থা সৃষ্টি হয় অথবা তদবীরের আশংকা দেখা দেয় তাহা হইলে তুমি নিজের মধ্যে এই অবস্থা স্থায়ী হইতে দিও না।

কেননা, ঈমানদারের ঈমানের নূর তাহাকে এই অবস্থায় থাকিতে দেয় না। আল্লাহ পাক বলেন-

كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ *

"ঈমানদারদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।"

অন্য এক স্থানে বলেন,

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ *

"বরং আমি সত্যকে বাতিলের প্রতি নিক্ষেপ করি। তখন সত্য বাতিলের মস্তিষ্ক বাহির করিয়া দেয়। আর বাতিল দূরীভূত হইতে থাকে।"

হযরত শায়খ (রহঃ) আরও বলিয়াছেন "রিযক অর্জিত হওয়ার পর আমাদিগকে লোভ লালসা এবং কৃপণতা হইতে বাঁচান।" ইহা এমন দুইটি অবস্থা যাহা রিযক অর্জিত হওয়ার পর সৃষ্টি হয়। একীনের দুর্বলতা এবং আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় নির্ভরতার অভাবে এই অবস্থার জন্ম হয়। আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে উভয় অবস্থার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন-

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

"যাহাদিগকে লোভ-লালসা থেকে দূরে রাখা হইয়াছে তাহারাই সফলকাম।"

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, লোভীর জন্য সফলতা নাই। অর্থাৎ সে নূর হইতে বঞ্চিত। কেননা, সফলতা নূরকে বলা হয়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করেন-

اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ اُولٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ *

"তাহারা সম্পদের লোভী। তাহারা ঈমানদার নহে। সুতরাং আল্লাহ পাক তাহাদের আমল বাতিল করিয়া দিয়াছেন।" অন্য এক আয়াতে বলেন-

وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ ....اِلٰى قَوْمٍ مُعْرِضُوْنَ *

"আর মোনাফেকদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে। যাহারা আল্লাহর সহিত এই অঙ্গীকার করে; যদি আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে অধিক সম্পদ দান করেন তবে আমরা অধিক দান করিতাম ও সৎ কাজ করিতাম। অতঃপর যখন আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে অনেক সম্পদ দান করিলেন তখন তাহারা কার্পণ্য ও উপেক্ষা করিতে লাগিল।"

তিনি আরও বলেন-

وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهٖ *

"যে ব্যক্তি কৃপণতা করে; প্রকৃতপক্ষে সে নিজের সাথেই কৃপণতা করে।"

কেননা খরচ করার সওয়াব তাহার নিজের। কৃপণতা শব্দটি তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম ক্ষেত্র যেখানে সম্পদ ব্যয় করা ওয়াজিব সে সব স্থানে ব্যয় করিতে কৃপণতা করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্র যেখানে ব্যয় করা ওয়াজিব নহে সে সব স্থানে ব্যয় করিতে কৃপণতা করা। তৃতীয় ক্ষেত্র স্বীয় জীবন আল্লাহর জন্য ব্যয় করিতে কৃপণতা করা।

প্রথম প্রকারের কৃপণতার বিবরণ কৃপণতা বশতঃ যাকাত প্রদান না করা। অথচ যাকাত প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথবা এমন কোন হক আদায় না করা যাহা আদায় করা তাহার জন্য অপরিহার্য। যেমন, পিতা মাতা যখন সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় তখন তাহাদের ব্যয়ভার বহন করার জন্য খরচ করা। অনুরূপভাবে সন্তানের খরপোষ দেওয়া, স্ত্রীর খরপোষ দেওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানাদি যখন পিতার মুখাপেক্ষী হয় তখন তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্য খরচ করা। মোটকথা যে সকল হক আদায় করা আল্লাহ পাক তোমার উপর ওয়াজিব করিয়াছেন উহা আদায় করিতে অলসতা করিলে তুমি নিন্দাবাদ ও শাস্তির যোগ্য হইয়া পড়িবে। এই সম্পর্কে কুরআনে আরও একটি আয়াত রহিয়াছে। যেমন-

و الذين يكنزون .... بعذاب اليم *

অত্র আয়াতে কানয (كنز) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কানয শব্দের অর্থ সম্পদ জমা করা যাহার যাকাত আদায় করা হয় নাই। যে সম্পদের যাকাত

আদায় করা হইয়াছে উহাকে কানয্ বলা হয় না। অর্থাৎ যাকাত আদায় করা হইয়াছে এমন সম্পদ আয়াতে উল্লিখিত আযাবের আওতায় পড়িবে না।

কৃপণতার দ্বিতীয় ক্ষেত্র এমন সম্পদের সাথে সম্পর্কিত যাহা ব্যয় করা ওয়াজিব নহে। যেমন এক ব্যক্তি স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় করিয়াছে কিন্তু অন্য কোন দান করে নাই। যদিও সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এমন একটি নির্দেশ পালন করিয়াছে যাহা তাহার জন্য অপরিহার্য ছিল। কিন্তু শুধু এতটুকু করিয়া ক্ষান্ত করা উচিত নয়; কেননা শুধু ফরয ওয়াজিব আদায় করিয়া ক্ষান্ত করা আর নফল দান খয়রাত থেকে ফিরিয়া থাকা নীচ মনা মানুষের কাজ। সুতরাং যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর সাথে স্বীয় সম্পর্ক ঠিক রাখিতে চায় তাহার জন্য শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ পাক তাহার দায়িত্বে যাহা অপরিহার্য করিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন দিক দিয়া আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখে। যে ব্যক্তি তাহার দায়িত্বে অপরিহার্য ব্যয় ব্যতীত অন্য কোন ব্যয় না করে সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য যে শুধু ফরয নামায আদায় করে আর সুন্নত নামায থেকে বিরত থাকে। হে শ্রোতা! আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদ তোমার জন্য যথেষ্ঠ। হাদীছে কুদসীতে আসিয়াছে যে, "ফরয আদায়ের দ্বারা আমার যতটুকু নৈকট্য অর্জিত হয় অন্য কোন আমলের দ্বারা ততটুকু হয় না। বান্দা সর্বদা নফল নামাযের মাধ্যমে আমার নৈকট্য খুঁজিতে থাকে। এমন কি আমি তাহাকে আমার প্রিয় করিয়া লই। আমি যখন তাহাকে আমার প্রিয় করিয়া লই তখন আমি তাহার কান, তাহার চক্ষু, তাহার অন্তর, তাহার রসনা, তাহার বিবেক, তাহার হাত এবং তাহার সাহায্যকারী হইয়া যাই।"

লক্ষ্য কর আল্লাহ্ পাক এখানে বলিয়াছেন যে, বারবার নফল ইবাদত করার দ্বারা এবং গুরুত্ব সহকারে করার দ্বারা তিনি বান্দাকে প্রিয় বানাইয়া লন। আর নফল এমন আমলকে বলা হয় যাহা আদায় করা অপরিহার্য করা হয় নাই। নামায, রোজা, দান খয়রাত, হজ্ব এবং অন্যান্য ইবাদতও নফল আছে।

একজন শুধু ফরয নামায আদায় করে অপরজন ফরয ও নফল উভয় নামায আদায় করে অথবা একজন শুধু যাকাত আদায় করে। অপরজন যাকাত আদায় করার সাথে সাথে দান খয়রাতও করিয়া থাকে। এই দুই ব্যক্তির মর্যাদার পার্থক্য একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝা যায়। যেমন এক মনিব তাহার দুইটি দাসের দায়িত্বে দৈনিক দুই দেরহাম করিয়া ট্যাক্স নির্ধারিত করিল। তন্মধ্যে এক দাস প্রতিদিন স্বীয় মনিবকে দুই দেরহাম করিয়া পরিশোধ করিয়া যাইতেছে। দুই দেরহাম অপেক্ষা অধিক কিছু দিতেছে না। আর কোন প্রকার হাদিয়া

(উপঢৌকন)ও দিতেছে না। এমনকি মনিবকে স্বীয় ভক্তি শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করিতেছে না। দ্বিতীয় দাস তাহার দায়িত্বে নির্ধারিত ট্যাক্স আদায় করার পরও বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল ও অন্যান্য হাদিয়া পেশ করিতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় দাসটি নিঃসন্দেহে মনিবের কাছে অধিক ভাগ্যবান, মনিবের স্নেহ লাভের অধিক উপযোগী এবং তাহার অনুগ্রহ লাভের অধিকতর নিকটবর্তী। কেননা, যে দাসটি তাহার দায়িত্বে নির্ধারিত পরিমান বস্তু মালিকের সামনে পেশ করে সে তো ইহা মনিবের প্রতি তাহার ভালবাসার ভিত্তিতে দেয় না বরং শাস্তির ভয়ে দেয়। পক্ষান্তরে যে দাসটি নির্ধারিত ট্যাক্স ব্যতীত মনিবকে অন্যান্য হাদিয়াও দিয়া থাকে সে মনিবকে ভালবাসার পথে চলিতেছে। মনিবের প্রতি ভালবাসাই তাহার মূল লক্ষ্য। এই দাসটি মনিবের নৈকট্য ও ভালবাসা লাভের অধিকতর উপযোগী। শুধু ফরয আহকাম আদায়কারী প্রথম দাসের তুল্য। ফরযের সাথে সুন্নত-নফল আদায়কারী দ্বিতীয় দাসের তুল্য।

আল্লাহ পাক বান্দার দুর্বলতা ও অলসতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি যে সব আহকাম তাহাদের দায়িত্বে ওয়াজিব করিয়াছেন যদি এই সব আহকামের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এখতিয়ার দিতেন তাহা হইলে অধিকাংশ লোক এইসব আহকাম পালনে বিরত থাকিত। অবশ্য অল্প সংখ্যক লোক পালন করিত। কিন্তু এই ধরণের লোক খুবই বিরল। তিনি তাহাদের দায়িত্বে এইসব আহকাম ওয়াজিব করিয়া বস্তুত তাহাদের বেহেশতে প্রবেশ অপরিহার্য করিয়া দিলেন। যেন তাহাদিগকে ওয়াজিব আহকাম সমূহের শিকলে বাঁধিয়া বেহেশতের দিকে রওয়ানা করাইয়া দিলেন। হাদীছে আসিয়াছে "আপনার পরোয়ারদিগার কতগুলি লোক সম্পর্কে আশ্চর্যবোধ করেন যাহাদিগকে শিকলে আবদ্ধ করিয়া বেহেশতে প্রেরণ করা হইয়া থাকে।"

বিশেষ জ্ঞাতব্য নফল ইবাদত শরীয়তে বৈধ হওয়ার হেকমত

আমরা ওয়াজিব (অবশ্যই করণীয়) আহকাম সম্বন্ধে খুব চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখিয়াছি যে, আল্লাহ পাক যে যে ইবাদত ওয়াজিব করিয়াছেন ঠিক ঐ জাতীয় ইবাদত হইতে কিছু না কিছু ইবাদত নফল হিসাবেও বৈধ করিয়াছেন। যাহাতে ওয়াজিব ইবাদত আদায় করিতে যে ক্রুটি হইয়া যায় নফল ইবাদতের দ্বারা তাহা পুরা হইয়া যায়। হাদীছেও অনুরূপ কথা আসিয়াছে "হিসাব নিকাশের সময় সর্ব প্রথম বান্দার ফরয নামাজসমূহ দেখা হইবে। যদি ইহাতে কিছু ক্রুটি পাওয়া যায় তাহা নফলের দ্বারা পুরা করিয়া দেওয়া হইবে।" হাদীছটি খুব

ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও। আল্লাহ্ পাক তোমার উপর যে সকল আমল ফরয করিয়াছেন শুধু তাহা পালন করাকে যথেষ্ঠ মনে করিও না। "বরং আল্লাহ পাক যে কাজ তোমার দায়িত্বে ওয়াজিব করেন নাই এমন সব আমলের মাধ্যমেও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখিতে পার" এই দিকের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী কোন আকর্ষণ তোমার মধ্যে হওয়া চাই। যদি বান্দা স্বীয় পাল্লায় শুধু ওয়াজিব আহকাম সমূহ আদায় করিবার এবং হারাম কার্যসমূহ পরিহার করিবার সওয়াব দেখিতে পায় তখন সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহার এত অধিক পরিমান কল্যাণকর আমল ছুটিয়া গিয়াছে যাহা কেহ গণনা করিয়াও শেষ করিতে পারিবে না এবং কোন অনুমানকারী অনুমান করিয়াও শেষ করিতে পারিবে না। সুতরাং ঐ মহান সত্ত্বা পবিত্র, যিনি বান্দাদের আমলের দরজা প্রশস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ পাক অবগত আছেন যে, তাঁহার বান্দাদের মধ্যে কতক বান্দা দুর্বল। আর কতক বান্দা শক্তি ও সাহসের অধিকারী। তিনি কিছু আহকাম ওয়াজিব করিয়াছেন আর হারাম বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে দূর্বল বান্দারা শুধু ওয়াজিব আহকামসমূহ আদায় করিয়া এবং হারাম কাজসমূহ হইতে বাঁচিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে। তাহাদের অন্তরে প্রভুর মহব্বতের পিপাসা নাই যে তাহারা ওয়াজিব আহকামসমূহ ব্যতীত অন্যান্য আমলগুলি পালন করিতে পারে। তাহাদের উদাহরণ এমন এক দাসের উদাহরণ যাহার সম্বন্ধে মনিবের জানা আছে যে, যদি মনিব তাহার উপর ট্যাক্স নির্ধারণ না করে তাহা হইলে সে মনিবকে কোন কিছুই দিবে না। এই জন্যই আল্লাহ পাক এ ধরণের বান্দার জন্য মৌখিক রিযক ওয়াজিব করেন নাই বরং দাসের আমলের অনুরূপ আমল নির্ধারিত করিয়াছেন। সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের এবং দিবসের মধ্যভাগে নামাজ পড়া নির্ধারণ করিয়াছেন। নগদ টাকা পয়সা, ব্যবসায়ের মাল এবং গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত নির্ধারণ করিয়াছেন। যমীনের ফসলের উপর নির্ধারিত পরিমান বায়তুল মাল প্রদানের ফয়সালা করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে-

و اتوا حقه يوم حصاده *

"ফসল কাটার দিনে তাহার হক দিয়া দাও।" যিলহজ্জ্ব মাসের দশ তারিখে হজ্জ নির্ধারণ করিয়াছেন। রমযান মাসের রোযা ফরয করিয়াছেন। মোটকথা, তাহাদের আমল নির্ধারিত করিয়াছেন। আমলের ওয়াক্তও নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহার পরে যে সময়টুকু অতিরিক্ত থাকে উহাতে মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য

সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

যাহারা আল্লাহ ওয়ালা হয় তাহাদের বিবেক আল্লাহর দিকে হয়। তাহারা সকল ওয়াক্তকে একই ওয়াক্ত বলিয়া গণনা করে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য ওয়াক্ত নির্ধারণ করে না বরং রাত্র দিন সর্বক্ষণকে আল্লাহর ইবাদতের ওয়াক্ত মনে করে। পুরা জীবনটাই আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, সর্ব ওয়াক্ত তাঁহার জন্য। জীবনের কোন একটি মূহুর্ত অন্য কোন কাজের জন্য নয়।

শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, জীবনে একটিই মাত্র আমল গ্রহণ কর। তাহা হইল মনের চাহিদা পরিহার করা আর মালিককে মহব্বত করা। প্রেমিকের ভালবাসা প্রেমিককে প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কাহারও অনুগত হইতে দেয় না।

আল্লাহ ওয়ালারা জানে যে তাহাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস তাহাদের কাছে আল্লাহ পাকের আমানত। তাহারা বিশ্বাস করে যে প্রতিটি নিঃশ্বাসের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে। সুতরাং তাহারা নিজেদের সমস্ত শক্তি তাঁহার দিকে নিয়োজিত করিয়া রাখে। আল্লাহ পাক প্রতিপালক। চিরস্থায়ী। সুতরাং প্রতিপালকের যে হকসমূহ তোমার উপর রহিয়াছে তাহাও চিরস্থায়ী। তাঁহার প্রতিপালন কোন এক বিশেষ সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং তাঁহার প্রতিপালনের ফলে যে সকল হকসমূহ আদায় করা তোমার জন্য অপরিহার্য তাহাও কোন বিশেষ সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক প্রতিপালক। এই ভিত্তিতে যে সকল হক আদায় করা তোমার দায়িত্বে অপরিহার্য সর্বদা ইবাদত করা উহারই একাংশ।

কৃপণতার তৃতীয় ক্ষেত্র

আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা। আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করা সর্বপ্রকার বদান্যতা অপেক্ষা উত্তম বদান্যতা। বদান্যতার অন্যান্য প্রকার সমূহ এই প্রকার অর্জন করার পক্ষে সহায়ক স্বরূপ। আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করা উত্তম হওয়ার কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। যে ব্যক্তি ওয়াজিব আদায় করিতে অলসতা করে না অনেক সময় ওয়াজিব নয় এমন দান করিতে অলসতা করে। কারণ ইহা নফসের উপর অধিকতর ভারী। আবার যে ব্যক্তি ওয়াজিব নয় এমন দান করিতে তো অলসতা করে না কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে অলসতা করে অর্থাৎ ইহা হইতে বিরত থাকে। এই

ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় না। কারণ ইহা আরও কঠিন ব্যাপার। আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করা সিদ্দীকীনদের আমল। আল্লাহর পরিচয় লাভ করিয়াছে এমন সব একীনওয়ালাদের হালাত (অবস্থা)। তাহারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহারা বিশ্বাস করেন যে, মালিকের সামনে গোলাম কোন কিছুর মালিক হয় না। তাই তাহারা মালিকের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। যেহেতু আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করা সর্বপ্রকার বদান্যতা অপেক্ষা উত্তম সেহেতু এই ক্ষেত্রের কৃপণতাও সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও অপকৃষ্ট।

লোভ-লালসা ও কৃপণতা সম্বন্ধে উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা হযরত শায়খের দো'আ "রিযক অর্জিত হওয়ার পর ইহার লোভ লালসা ও কৃপণতা হইতে আমাদিগকে বাঁচান" এর অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হইয়া গেল।

রিযক সম্বন্ধে কতগুলি আনুসাঙ্গিক অবস্থার বর্ণনা

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, রিযকের সাথে সম্পর্কিত অবস্থা তিন প্রকার। এক প্রকার অবস্থা সৃষ্টি হয় রিযক অর্জিত হওয়ার পূর্বে। দ্বিতীয় প্রকার অবস্থা সৃষ্টি হয় রিযক উপার্জন করার সময়। শায়খের কথার মধ্যে তো এই দুই প্রকারের আলোচনা হইয়াছে। আমরাও তাহা বর্ণনা করিয়াছি। তৃতীয় প্রকারের এমন কতগুলি অবস্থা যাহা রিযক অর্জিত হওয়ার পর এবং রিযক নিঃশেষ হওয়ার পর জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ ইহার জন্য আফসোস হওয়া, আক্ষেপ করিতে থাকা প্রভৃতি। এই সব অবস্থা হইতেও মুক্ত থাকা উচিত। আল্লাহ পাকের ইরশাদ শ্রবণ কর-

لِكَيْلَا تَاسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ *

"যাহাতে তোমরা এমন জিনিসের জন্য আফসোস না কর যাহা তোমাদের থেকে ছুটিয়া গিয়াছে। আর উল্লাস না কর ঐ জিনিসের জন্য যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক কন্যার শিশু সন্তান মরিয়া গিয়াছে। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সংবাদদাতার মাধ্যমে সংবাদ দিলেন তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ পাক যাহা লইয়া গিয়াছেন তাহা আল্লাহরই ছিল। আর যাহা দিয়া রাখিয়াছেন তাহাও তাঁহারই।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন জিনিস অর্জিত হয় নাই বলিয়া আফসোস করে। সে যেন উচ্চস্বরে স্বীয় মূর্খতা এবং আল্লাহ থেকে নিজের দূরে

থাকার ঘোষণা দিতেছে। কেননা, যদি সে আল্লাহকে পাইত তাহা হইলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু তালাশ করিয়া ফিরিত না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে পাইয়াছে সে তালাশ করার মত কোন কিছুই পাইতে পারে না।

বান্দার ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া চাই যে, যে বস্তু তাহার হস্তগত হয় নাই তাহা তাহার ভাগ্যেই ছিল না। আবার কোন বস্তু তাহার কাছে ছিল এখন তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছে; বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে তাহার অধিকার ছিল না। কেননা, যদি ইহাতে তাহার অধিকার থাকিত তাহা হইলে অন্যের কাছে যাইতে পারিত না। বরং বুঝিতে হইবে যে, এই বস্তুটি তাহাকে ধার দেওয়া হইয়াছিল। ধারদাতা ফিরাইয়া লইয়াছে।

কোন এক ব্যক্তির এক চাচাত বোন ছিল। এই বোনের সাথে তাহার বিবাহ হওয়ার কথাবার্তা শৈশবকাল থেকেই পাকাপোক্ত ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কোন না কোন কারণে তাহাদের মধ্যে বিবাহ হয় নাই। বরং অন্য এক ব্যক্তির সাথে এই বালিকার বিবাহ হইয়া গেল। এক বিবেকবান ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া বলিল, যাহার সাথে তোমার এই চাচাত বোনের বিবাহ হইয়াছে তোমার উচিত তাহার কাছে যাওয়া। আর তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা তুমি এই বালিকাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে অথচ আবহমানকাল থেকে এই বালিকার বিবাহ তাহার তকদীরে লিখা হইয়াছে। সুতরাং তুমি এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর যে, আমি তোমার হক ছিনাইয়া লইতে চাহিয়াছিলাম। অজান্তে আমার দ্বারা এই ত্রুটি হইয়া গিয়াছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার প্রতি মনোকষ্ট রাখিও না।

কোন বস্তু হস্তচ্যুত হওয়ার পর উহার জন্য বিষণ্ন হওয়া ঈমানদারের জন্য উচিত নয়। এই বিষয়ে নিম্নোল্লেখিত আয়াত যথেষ্ঠ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ اطْمَأَنَّ بِهٖ * وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ * ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ *

"কোন কোন লোক এমনও রহিয়াছে যাহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হইয়া আল্লাহ পাকের ইবাদত করে। যদি সে কোন সম্পদ লাভ করে তখন সে সম্পদের কারণে স্থিরচিত্ত হইয়া যায়। আর যখন সম্পদ সম্পর্কে কোন পরীক্ষা সামনে আসে তখন অস্থির হইয়া পড়ে। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ। ইহা প্রকাশ্য ক্ষতিগ্রস্থতা।"

লক্ষ্য কর অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তির নিন্দা করিয়াছেন যাহার

সম্পদ লাভ হওয়ার পর সম্পদের সাথে অন্তর লাগাইয়া দিয়াছে। আল্লাহ পাক তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন-

فان اصابه خير اطمأن به *

"অর্থাৎ সে সম্পদের সাথে অন্তর লাগাইয়া বসিয়াছে।"

তাহার যদি বুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও সাথে অন্তর লাগাইত না। শুধু আল্লাহর সাথেই অন্তর লাগাইয়া রাখিত। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তিরও নিন্দা করিয়াছেন যাহার সম্পদ হস্তচ্যুত হইয়া যাওয়ার পর চিন্তাযুক্ত হইয়াছে। দেখ আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন و ان اصابته فتنة আয়াতে উল্লেখিত ফিতনা শব্দের অর্থ এমন প্রিয়বস্তু হস্তচ্যুত হইয়া যাওয়া যাহার সহিত সে অন্তর লাগাইয়া ছিল। انقلب على وجهه। অর্থাৎ অস্থির চিত্ত হইয়া যায়। নিজকে ভুলিয়া যায়। অন্তর গাফেল হইয়া যায়। আর এই অবস্থার সৃষ্টি হয় আল্লাহর পরিচয় না থাকার কারণে। যদি সে আল্লাহকে চিনিত তাহা হইলে আল্লাহর অস্তিত্ব তাহাকে অন্য সব কিছু থেকে অমনোযোগী করিয়া দিত। ফলে যে কোন হস্তচ্যুত বস্তুর জন্য উৎকণ্ঠা করিত না। যে আল্লাহকে পায় নাই সে কিছুই পায় নাই। যে আল্লাহকে পাইয়াছে কোন বস্তু তাহার হস্তচ্যুত হয় নাই। যে এমন সত্ত্বাকে পাইয়াছে যাহার হস্তে সবকিছুর মালিকানা তাহার সম্বন্ধে কিভাবে বলা যায় যে, কোন বস্তু তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তাকে পাইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিভাবে বলা যায় যে, কোন বস্তু তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছে? যে এমন জিনিস পাইয়াছে যাহার মধ্যে সমস্ত জিনিস প্রকাশিত হয় তাহার সম্বন্ধে কিভাবে বলা যায় যে কোন জিনিস তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছে।

আল্লাহর পরিচয় লাভকারীদের মতানুসারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন জিনিস সম্বন্ধে পাওয়া না পাওয়ার কথা হইতে পারে না। কারণ আল্লাহর তুলনায় কোন কিছুই মওজুদ নহে। অনুরূপভাবে কোন কিছু হস্তচ্যুতও হয় না। কেননা হস্তচ্যুত এমন বস্তু হইয়া থাকে যাহা প্রথমে হাতে মওজুদ ছিল। যখন ধারণার পর্দা ফাটিয়া যাইবে তখন পরিস্কারভাবে দেখা যাইবে যে, দুনিয়াতে কোন জিনিস অস্তিত্বশীল নহে। তখনই একীনের নূর চমকিয়া উঠিবে। যেহেতু তুমি উপরোক্ত আলোচনা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছ এখন তোমার জন্য অপরিহার্য হইল কোন জিনিস হস্তচ্যুত হওয়ার কারণে অস্থির না হওয়া। আর কোন জিনিস পাইলে উহার প্রতি ঝুঁকিয়া না পড়া। কেননা, যে ব্যক্তি কোন জিনিস পাইলে উহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে আর হস্তচ্যুত হইলে অস্থির হইয়া পড়ে

সে প্রমাণ করিয়া দিল যে, সে ঐ জিনিসের বান্দা। তাই সে উহা পাইলে খুশী হয় আর না পাইলে বিষণ্ণ হয়। এখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ শ্রবণ কর।

"দীনারের দাস ধ্বংস হউক। দেরহামের দাস ধ্বংস হউক। কম্বলের দাস ধ্বংস হউক। ধ্বংস হউক এবং মাথা নীচু হউক। যদি তাহার গায়ে কাঁটা ফুটে। বাহির হয় না।"

সুতরাং স্বীয় অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও প্রেম ব্যতীত অন্য কোন জিনিস স্থান লইতে দিও না। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও বান্দা হওয়া অপেক্ষা তুমি অনেক উর্ধ্বের লোকের। আল্লাহ তোমাকে উপযুক্ত গোলাম বানাইয়াছেন। তুমি অনোপযুক্ত গোলাম বনিতে যাইতেছ কেন? যাহার বিবেক আল্লাহর দিকে রহিয়াছে। তাহার এই বিবেক তাহাকে কোন জিনিসের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতে দেয় না আবার কোন জিনিস না পাওয়ার কারণে অস্থির হইতে দেয় না। যাহাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত হইয়া পড়ে।

আমি শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ)-এর কাছে শুনিয়াছি যে তিনি বলেন, আহলে হাল [১] দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

একঃ এমন ব্যক্তি যে হাল নামক বিশেষ অবস্থায় হালের হইয়াই থাকে। দ্বিতীয়ঃ এমন ব্যক্তি যে এই বিশেষ অবস্থায় এই অবস্থার সৃষ্টিকর্তার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হালের অবস্থায় হালের হইয়া থাকে। সে হালের বান্দা। তাহার অবস্থা হইল যদি হাল থাকে তাহা হইলে খুব খুশী। আর যখন হাল থাকে না তখন খুব বিষন্ন। আর যে ব্যক্তি হালের অবস্থায় হাল সৃষ্টিকর্তার হইয়া থাকে। সে হালের সৃষ্টিকর্তার বান্দা অর্থাৎ খোদার বান্দা। সে হালের বান্দা নহে। তাহার অবস্থা হইল যদি তাহার মধ্যে হাল না থাকে। তাহা হইলে বিষণ্ন হয় না আর হাল থাকিলেও খুশী হয় না। সুতরাং আল্লাহ পাকের বাণী-

و من الناس من يعبد الله على حرف *

এর তাফসীর এই যে, আল্লাহর ইবাদত করে এক কারণে। যদি সে কারণ দূরীভূত হইয়া যায় তাহা হইলে ইবাদত দূরীভূত হইয়া যায়। ইবাদত বন্ধ হইয়া যায়। যদি তাহার বিবেক আমার দিকে হইত তাহা হইলে সর্বাবস্থায় ও সর্বকারণে সে আমার ইবাদত করিত। যেমন, আমি সর্বাবস্থায় তোমার প্রতিপালক। তেমনি তুমি সর্বাবস্থায় আমার বান্দা হইয়া থাক।

টীকা ১। তাসাউফপন্থীদের এক বিশেষ অবস্থাকে হাল বলা হয়।

فان ابصبه خير اطمأن به *

আয়াতাংশের তাফসীর এই যে, যদি সে কোন সম্পদ পায় যাহা তাহার মনমত হয়। অর্থাৎ বাস্তবে তাহা মঙ্গলময় না হইলেও তাহার দৃষ্টিতে মঙ্গলময় হয়। তখন সে সন্তুষ্ট হয়, খুশী হয়। و ان اصبته فتنة انقلب *

অর্থাৎ যে সম্পদ পাইয়া সে সন্তুষ্ট হইয়াছিল যদি তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলে সে অস্থির হইয়া যায়। অত্র আয়াতে এইরূপ সম্পদ দূরীভূত হওয়াকে ফিতনা বলা হইয়াছে। ফিতনা আরবী শব্দ। আমাদের ভাষায় ইহার অনুবাদ 'পরীক্ষা।' ইহাকে পরীক্ষা বলার কারণ হইল নিয়ামত হস্তচ্যুত হইলে ঈমানদারের ঈমানের পরীক্ষা হইয়া যায়। যেমন অনেক লোক ধারণা করে যে, তাহার রিযকের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে। অথচ তাহারা বাস্তাবক্ষেত্রে ইহার সম্পর্ক করিয়া রাখিয়াছে দুনিয়াবী আসবাবের সাথে এবং উপার্জন করার পন্থার সাথে। যদি তাহাদের সম্পর্ক সত্যিকার অর্থে আল্লাহর সাথে হইত তাহা হইলে সম্পদ হস্তচ্যুত হইলেও অস্থির হইত না। আবার অনেকে মনে করে তাহাদের প্রীতি রহিয়াছে স্বীয় প্রতিপালকের সাথে। অথচ তাহাদের প্রীতি স্বীয় হালের (বিশেষ অবস্থার সাথে) ইহার প্রমান এই যে, তাহাদের হাল দূরীভূত হইলে প্রীতিও দূরীভূত হইয়া যায়। যদি স্বীয় প্রতিপালকের সাথে প্রীতি থাকিত তাহা হইলে তাহা স্থায়ী হইত। কারণ প্রতিপালক স্থায়ী। সুতরাং তাহার সাথে প্রীতিও স্থায়ী হইয়া থাকে। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক এই ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন-

خسر الدنيا و الاخرة *

"সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ।"

দুনিয়াতে এইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ যে তাহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হইল না। আর আখেরাতে এইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ যে সে আখেরাতের জন্য আমল করিল না। সুতরাং তাহার যাহা উদ্দেশ্য ছিল তাহা হাসিল হয় নাই। কেননা সে আমাকে চায় নাই। যদি আমাকে চাহিত তাহা হইলে আমি তাহার জন্য হইয়া যাইতাম।

উদাহরণের অধ্যায়

অত্র অধ্যায়ে তদবীর চালানোর, তদবীরকারীর, রিযকের এবং আল্লাহ পাক যিম্মাদার হওয়ার উদাহরণ বর্ণনা করা হইবে। কারণ. উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু খুব পরিস্কার হইয়া সামনে আসে।

প্রথম উদাহরণ তদবীর চালানোর। যেমন এক ব্যক্তি সমুদ্রের তীরে ঘর

নির্মাণ করিতেছে। এই দিকে সমুদ্রের তরঙ্গ তাহার ঘরে আঘাত করিতেছে। ঘর নির্মাণে তাহার চেষ্টা যত বাড়িতেছে তরঙ্গের উত্তালতাও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। এইভাবে তরঙ্গ তাহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করিয়া দিয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে তদবীর চালায় তাহার অবস্থাও অনুরূপ। সে তদবীর করার ইমারত নির্মাণ করিতেছে আর তাকদীর এই ইমারত ধ্বংস করিয়া দিতেছে। এই জন্যই কথিত আছে যে, তদবীরকারী তদবীর করিতেছে আর তাকদীর (ভাগ্য) হাসিতেছে। কবি বলেন-

عمارت کب پوری ہوکہ تو اسکو بناتاھم

مگر ہو دوسرا ارس جا کہ وہ اسکو گراتاھو

"তুমি যে ইমারত নির্মাণ করিতেছ তাহা কখন পুরা হইবে?"

কিন্তু ইহার স্থলে অন্য একটা হইয়া যাইতেছে আর প্রথমটাকে ধ্বংস করিতেছে।"

তদবীরকারীর উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি বালির স্তূপে বসিয়া বালি দ্বারা ঘরের ন্যায় ইমারত নির্মাণ করিল। তখন ঝটকা হাওয়া আসিয়া সমস্ত বালি উড়াইয়া লইয়া গেল। ফলে তাহার নির্মিত বালির ইমারত বালির স্তূপে হারাইয়া গেল। তদবীরকারীর অবস্থাও তদ্রূপ। তদবীর করিয়া যাহা কিছু করিল তাকদীরের (ভাগ্য) হাওয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গেল। কবি বলেন-

مٹ گے گھر انکے ملکر ریگ مین + کب رھے قائم جو ھو گھر ریگ مین

"তাহাদের ঘর বালির মধ্যে মিশিয়া ধ্বংস হইয়া গেল।

বালির মধ্যে যে ঘর হয় তাহা কখন ঠিক থাকে?

তৃতীয় উদাহরণ ঃ তদবীরকারীর। এক বালক স্বীয় পিতার সাথে সফরে ছিল। উভয়ে রাত্রে চলিতেছে। যেহেতু পিতা পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ন। তাই এই অন্ধকারের মধ্যেও পুত্রের দেখাশুনা করিতেছে। কিন্তু পুত্র পিতার এই সতর্কতা সম্বন্ধে বেখবর। পুত্র যেহেতু অন্ধকারের কারণে পিতাকে দেখিতে পাইতেছে না। তাই সে নিজের চিন্তায় চিন্তিত; নিজের হেফাজতে লিপ্ত। হঠাৎ করিয়া চন্দ্র উদিত হইল। সবকিছু ফর্সা হইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল যে, পিতা তাহার নিকটেই রহিয়াছে। পিতা তাহার দেখাশুনা করিতেছে। তখন তাহার অন্তর শান্ত হইল। পিতাকে পার্শ্বে দেখিয়া পুত্র নিজ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ করিল। যে ব্যক্তি নিজের জন্য তদবীর করে। সে পুত্রের ন্যায়। সে

এইজন্যই তদবীর করে যে, সে ধারনা করিয়াছে যে, আল্লাহ তাহার থেকে অনেক দূরে রহিয়াছেন। আল্লাহর নৈকট্য তাহার জানা নাই। যদি তাওহীদের চন্দ্র অথবা আল্লাহর পরিচয়ের সূর্য উদিত হয় আর সে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করিতে পায় তাহা হইলে সে নিজের জন্য তদবীর করিতে লজ্জিত হইবে। আল্লাহ পাক তাহার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন উহার প্রতি নির্ভর করিয়া নিজের জন্য নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করিবে।

চতুর্থ উদাহরণ ঃ তদবীর একটি বৃক্ষের সাথে তুলনীয়। বৃক্ষের জন্য পানি বদ ধারণার তুল্য। বৃক্ষের ফল আল্লাহ থেকে দূরে থাকার তুল্য। বৃক্ষে পানি দিলে বৃক্ষ তাজা থাকে। পানি বৃক্ষের খাদ্য। খাদ্য না পাইলে বৃক্ষ শুকাইয়া যায়। অনুরূপভাবে বান্দা নিজের জন্য তদবীর করে আল্লাহর প্রতি সুধারণা থাকে না বলিয়া। বান্দার প্রতি সুধারণা থাকিলে বদ ধারণা খতম হইয়া যায়। আর বদ ধারণা তদবীরের খাদ্য। সুতরাং যখন তদবীর আহার পাইবে না তখন এমনি এমনিতেই শুকাইয়া মিটিয়া যাইবে। বান্দা তদবীর করা হইতে বিরত হইয়া পড়িবে। আল্লাহ হইতে দূর হইয়া যাওয়াকে তদবীরের ফল বলা হইয়াছে। কারণ যে ব্যক্তি নিজের জন্য তদবীর করে সে বিবেকের উপর নির্ভর করে। স্বীয় তদবীরের উপর সন্তুষ্ট থাকে। তদবীরের পর প্রাপ্ত বস্তুকে স্বীয় ব্যক্তিত্বের উপার্জিত বলিয়া মনে করে। এই অবস্থা তখনই জন্ম লাভ করে যখন আল্লাহ থেকে বান্দা দূর হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্যক্তির শাস্তি হইল তাহার সবকিছু তাহার নিজের দায়িত্বে ছাড়িয়া দেওয়া এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য তাহার কাছে যাইতে না দেওয়া।

পঞ্চম উদাহরণ ঃ তদবীরের দৃষ্টান্ত ।কোন এক মনিব স্বীয় গোলামকে এক শহরে প্রেরণ করিল উক্ত শহরের আসবাবপত্র গুছাইয়া রাখার জন্য। গোলাম উক্ত শহরে পৌঁছিয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়া সে নিজের আরাম আয়েশের চিন্তায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে কোথায় অবস্থান করিবে? কি খাইবে? কাহাকে বিবাহ করিবে? এইসব তাহার চিন্তা। মূলকথা সে এইসব চিন্তায় এইভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে মনিব তাহাকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। অতঃপর মনিব গোলামকে ডাকিয়া নিজের কাছে লইয়া আসিল। এইরূপ গোলামের শাস্তি হইল তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া। কেননা সে নিজের ঝামেলায় জড়িত হইয়া মালিকের নির্দেশ পালনে অসাবধান হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হে ঈমানদার! তোমার অবস্থাও তদ্রূপ। আল্লাহ পাক তোমাকে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং স্বীয় নির্দেশ পালনের হুকুম

দিয়াছেন। তোমার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন। তোমার জন্য সবকিছুর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তুমি নিজের ফিকিরে লাগিয়া গিয়া মালিকের নির্দেশ পালনে অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছ। হেদায়েতের পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছ। ধ্বংসের পথ ধরিয়া চলিয়াছ।

ষষ্ঠ উদাহরণ ঃ তদবীরকারী আর তদবীর পরিহারকারীর উদাহরণঃ এক বাদশাহ। তাহার দুই গোলাম। এক গোলাম স্বীয় মনিবের হুকুম পালনে সর্বদা নিয়োজিত। ফলে নিজের খানা পিনার প্রতিও ততটা খেয়াল রাখার সময় পায় না। তাহার সদাসর্বদা চিন্তা হইল মনিবের খেদমত করা। এই চিন্তা তাহাকে নিজের প্রয়োজন পুরা করা হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয় গোলাম তাহার মত নয়। বরং নিজের চিন্তায় অধিকাংশ সময় কাটায়। মনিব যখন তাহাকে ডাকে তখন দেখা যায় কখনও কখনও সে নিজের কাপড়-চোপড় ধৌত করাতে লিপ্ত রহিয়াছে। কখনও কখনও স্বীয় পশুর পরিচর্যায় লাগিয়া আছে। আবার কখনও কখনও স্বীয় সাজ সজ্জায় লাগিয়া আছে। প্রথম গোলাম দ্বিতীয় গোলামের তুলনায় সর্বদাই স্বীয় মনিবের অনুগ্রহ লাভের অধিকতর হকদার। কেননা গোলাম ক্রয় করা হয় মনিবের সেবা করার জন্য। নিজের প্রয়োজনে লিপ্ত থাকার জন্য নয়। অনুরূপ অবস্থা বিবেক সম্পন্ন বান্দার। যখন তাহার দিকে লক্ষ্য করিবে তাহাকে দেখিতে পাইবে যে, সে সর্বদাই স্বীয় মনঃপুত ও মনতুষ্টিকর জিনিসসমূহ পরিহার করিয়া আল্লাহ পাকের হক ও আহকামসমূহ আদায় করার মধ্যে লাগিয়া আছে। যেহেতু তাহার অবস্থা এইরূপ সেহেতু আল্লাহ পাক তাহার সমস্ত কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। স্বীয় অপরিসীম দানের ভাণ্ডার এই বান্দার দিকে ঝুঁকাইয়া দেন। কেননা সে আল্লাহর প্রতি ভরসা করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। যে আল্লাহর প্রতি ভরসা করে আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ঠ। গাফেল ব্যক্তি এমন নহে। বরং তাহার অবস্থার দিকে যখন তাকাইবে তখন দেখিবে যে, সে দুনিয়ার আসবাবপত্র অর্জনে লিপ্ত। স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করিবার মাধ্যম সংগ্রহ করিতেছে। নিজের জীবিকা উপার্জনে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। সে সৌন্দর্য, নির্ভরতা, সত্যতা এবং তাওয়াক্কুল হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

সপ্তম উদাহরণ তদবীর অবলম্বনকারীর ঃ যেমন সূর্য যখন ঠিক সোজা উপরে না থাকে তখন উহার ছায়া লম্বা হইয়া পড়ে। আর যখন ঠিক সোজা মাথার উপরে আসে তখন ছায়া প্রায় শেষ হইয়া যায়। শুধু ছায়া নামে একটি নিশানা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ইহা আর ছোট্ট হয় না। তদবীর অবলম্বনকারী ছড়ানো লম্বা ছায়ার ন্যায়। আল্লাহর পরিচয়ের সূর্য যখন তাহার অন্তরের

সোজাসোজি আসে তখন তাহার ব্যবস্থা অবলম্বনের লম্বা ছায়া ধ্বংস করিয়া ছাড়ে। অবশ্য তখনও বান্দার মধ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের সামান্য স্পৃহা থাকে। যাহাতে তাহার উপর শরীয়তের আহকাম জারী হইতে পারে।

অষ্টম উদাহরণ ঃ তদবীর অবলম্বনকারীর ঃ যেমন এক ব্যক্তি একটি বাড়ী অথবা একটি দাস বিক্রি করিল। লেনদেন শেষ হইয়া যাওয়ার পর বিক্রেতা ক্রেতার কাছে আসিয়া বলিল যে, এখানে কোন ঘর নির্মাণ করিতে পারিবে না। অথবা এই বাড়ীর অমুক কোঠাটি ভাঙ্গিয়া ফেল। অথবা বিক্রেতা নিজেই এই কাজগুলি করিতে উদ্যত হইল। তখন তাহাকে বলা হইবে যে তুমি তো বিক্রি করিয়া দিয়াছ। আর বিক্রি করিয়া দেওয়ার পর কোন ক্ষমতা খাটে না। কেননা বিক্রি করিয়া দেওয়ার পর ক্ষমতা খাটানো ঝগড়ার বীজ রোপন করা। যাহা কোন অবস্থায়ই ঠিক নয়। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন যে, তিনি সকল মুমিনের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং মুমিনগণ বিক্রেতা। আর আল্লাহ পাক ক্রেতা। তাই মুমিনের জন্য অপরিহার্য হইল নিজকে এবং নিজের সবকিছু আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা। কেননা, তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আবার খরিদ করিয়া লইয়াছেন। যে জিনিস সোপর্দ করা হয় তাহা সম্বন্ধে সোপর্দকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না। বরং ব্যবস্থা অবলম্বন পরিহার করা তাহার জন্য অপরিহার্য। সুতরাং জান ও মাল সম্পর্কে যে কোন প্রকার তদবীর পরিহার করা মুমিনের জন্য কর্তব্য।

রিযকের উদাহরণ ঃ পার্থিব জগতে রিযকের উদাহরণ। যেমন কোন মনিব স্বীয় দাসকে বলিল, বাড়ীর অমুক অমুক কার্যের প্রতি খুব লক্ষ্য কর। এইগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন কর। সুতরাং ইহা হইতে পারে না যে, মনিব কার্যে লাগিয়া থাকার নির্দেশ দিবে আর তাহার খানাপিনার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে উদাসীন থাকিবে এবং তাহার ভরন-পোষণের বন্দোবস্ত করিবে না। একইভাবে আল্লাহ পাক বান্দাকে ইবাদতের এবং স্বীয় আহকাম পালনের নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তিনিই তাহার রিযকের যিম্মাদার হইয়াছেন। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হইল মালিকের খেদমত করা, তাহার নির্দেশ পালন করা। আর মালিক স্বীয় অনুগ্রহে তাহার খোঁজ খবর লইবেন।

নবম উদাহরণ ঃ আল্লাহর সাথে বান্দার যে সম্পর্ক সন্তানের সাথে মাতার সম্পর্কের সাথে তুলনা করা যায়। মাতা স্বীয় সন্তানের অভিভাবকত্ব কখনও পরিহার করে না এবং স্নেহ মমতা কম করে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাহাদের প্রতি নেয়ামত প্রেরণ করেন। তাহাদের

কষ্ট-ক্লেশ দূর করেন। একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে দেখিতে পাইলেন যাহার সাথে একটি শিশু সন্তান ছিল। তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাহাবাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কি ধারণা হয় যে, এই মহিলা স্বীয় শিশুটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে পারিবে? উপস্থিত ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! না, পারিবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই মাতা স্বীয় সন্তানের প্রতি যতটুকু স্নেহময়ী, আল্লাহ পাক স্বীয় মুমিন বান্দার প্রতি আরও অধিক দয়ালু।

দশম উদাহরণ ঃ পার্থিব জগতে বান্দার উদাহরণ। যেমন এক দাস। মনিব তাহাকে নির্দেশ দিয়াছে যে, অমুক স্থানে যাও। সেখানে নিজের পুঁজি পাকা করিয়া লও। কেননা, সেখান থেকে অন্য কোথায়ও তোমাকে সফর করিতে হইবে। সুতরাং সেখান থেকেই সফরের আসবাবপত্র লইয়া লও। মনিবের এইরূপ অনুমতি প্রদানের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, শারিরীক গঠন বহাল রাখিতে সহায়তা করে এমন যে কোন জিনিস আহার করা তাহার জন্য বৈধ এবং এমন যে কোন জিনিস সে ব্যবহার করিতে পারে যাহা তাহার সফরের আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে কাজে আসে। অনুরূপ অবস্থা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে। আল্লাহ পাক এই দুনিয়াতে বান্দাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আখেরাতের সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন-

وتزودوا فان خير الزاد التقوى *

"তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর। তবে আল্লাহকে ভয় করা সর্বোত্তম পাথেয়।"

সুতরাং যখন আখেরাতের সফরের জন্য পাথেয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা গেল যে, দুনিয়া হইতে এমন এমন জিনিসসমূহ ব্যবহার করা বৈধ যাহা পাথেয় সংগ্রহ করিতে, সফরের জন্য প্রস্তুত হইতে এবং আখেরাতের জন্য আসবাবপত্র তৈয়ার করিতে সাহায্য করে।

একাদশ উদাহরণ ঃ আল্লাহর সাথে বান্দার উদাহরণ ঃ যেমন কোন মালিকের একটি বাগান রহিয়াছে। মালিক স্বীয় দাসকে উক্ত বাগানে চারা লাগানোর, শস্য উৎপাদন করার এবং বাগানের অন্যান্য কাজকর্ম গুরুত্বের সাথে করিবার নির্দেশ দিয়াছে। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে দাস স্বীয় কর্তব্যে লাগিয়া গিয়াছে। কখনও বাগান থেকে বাহির হয় না। এখন যদি এই দাস এই বাগানের ফলমূল খায় তাহা হইলে মালিক তাহাকে ভৎর্সনাও করিবে না

তিরস্কারও করিবে না। আবার ফলমূল খাইতে নিষেধও করিবে না। কেননা সে বাগানের ফলমূল খাইলে বাগানের উন্নতির জন্য পরিশ্রমও করিবে। কিন্তু এক নির্ধারিত পরিমান খাওয়া উচিত। যে পরিমান খাইলে বাগানের কাজকর্ম করার সহায়তা লাভ করিতে পারে। কামনা ও অভিলাষের চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে, স্বাদ উপভোগ করিবার জন্য খাওয়া উচিত নয়।

দ্বাদশ উদাহরণ আল্লাহর সাথে বান্দার উদাহরণ ঃ যেমন কোন ব্যক্তি খুব বড় একটি বাগান করিয়াছে। অথবা খুব বড় একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, কাহার জন্য এতবড় জিনিস প্রস্তুত করিয়াছ? সে বলিল, স্বীয় বড় ছেলের জন্য। কিন্তু তাহার এই ছেলে এখনও জন্ম লাভ করে নাই। এই ব্যক্তি তাহার জন্মের আশা করিতেছে মাত্র। এই ব্যক্তির সন্তানের প্রতি মহব্বত থাকার কারণে সন্তানের জন্মের পূর্বেই তাহার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। তবে কি তোমাদের এই ধারণা হয় যে, এই ব্যক্তি সন্তানের জন্মের পূর্বেই যেহেতু সন্তানের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। এখন সন্তানের জন্মের পর তাহাকে সংগৃহীত জিনিসপত্র দিবে না? আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কও তদ্রূপ। আল্লাহ পাক বান্দা সৃষ্টি করার পূর্বেই দুনিয়াতে তাহাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

তুমি কি জ্ঞাত নহে যে, আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহ তোমার জন্মের পূর্বেই অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। কেননা, আল্লাহ পাক বান্দার জন্মের পূর্বেই এবং সে কোন আমল করার পূর্বেই নিয়ামত সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ পাক আবহমানকাল হইতে যে জিনিস তোমার ভাগ্যে লিখিয়া দিয়াছেন এবং তোমার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিবেন না। এমনকি কখনও হইতে পারে যে কোন কিছু অস্তিত্বে আসার পূর্বে উহার জন্য যাহা কিছু তৈয়ার করিয়া রাখা হয় তাহার অস্তিত্বের পর তাহাকে সেগুলি দেওয়া হইবে না?

ত্রয়োদশ উদাহরণ ঃ আল্লাহর সাথে বান্দার উদাহরণ যেমন এক বাদশাহ কোন ব্যক্তিকে চাকর নিযুক্ত করিয়াছে এবং কি কি কাজ করিবে তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। বাদশাহ তাহাকে চাকর নিযুক্ত করিয়া ঘরের কাজ করাইবে আর তাহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিবে তাহা কখনও হইতে পারে না। কেননা বাদশাহের মর্যাদা ইহা অপেক্ষাও অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক অনুরূপ। দুনিয়া আল্লাহর ঘর। তুমি চাকর। আল্লাহর ইবাদত কাজ। বিনিময়

বেহেশত। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাকে কাজ করার হুকুম দিবেন আর কাজ সম্পাদন করিতে যে সব জিনিস তোমাকে সহায়তা করে তাহা তোমাকে দিবেন না এমন হইতে পারে না।

চতুর্দশ উদাহরণ ঃ বান্দার উদাহরণ এক ব্যক্তি কোন দয়ালু বাদশাহের ঘরে মেহমান হইল। এই মেহমানের উচিত খানাপিনার চিন্তা না করা। যদি সে এই চিন্তা করে তাহা হইলে বাদশাহের প্রতি তাহার কুধারণার প্রকাশ হইল। বরং ইহা বাদশাহের প্রতি তাহার অপবাদ। দুনিয়া আল্লাহর ঘর। এখানে যে সব লোক বসবাস করে তাহারা আল্লাহর মেহমান। তিনি স্বীয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মানুষকে মেহমানদারী করার কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। এখন তিনি তাহাদের মেহমানদারী করিবেন না- তাহা হইতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় খানাপিনার চিন্তায় থাকে সে এই বাদশাহের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। কেননা, যদি সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে সন্দেহে না থাকিত তাহা হইলে নিজের রিযকের চিন্তায় কেন পড়িত?

পঞ্চদশ উদাহরণ ঃ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের উদাহরণ ঃ এক বাদশাহ এক দাসকে কোন এক স্থানে গিয়া অবস্থান করার নির্দেশ দিল। আর বলিল যে, সেখানে তুমি দুশমনের মোকাবিলা করিবে। তাহার মোকাবিলা করিতে স্বীয় শক্তি সাহস ব্যয় করিবে। সর্বদাই তাহার মোকাবিলা করিতে থাকিবে। বাদশাহ দাসকে এই নির্দেশ দেওয়ার দ্বারা অপরিহার্যভাবে বুঝা যায় যে, এই শহরের জনসাধারণ থেকে উপার্জিত ট্যাক্স এবং রাজকোষ থেকে আমানতদারীর সাথে সম্পদ ব্যবহার করার অনুমতি রহিয়াছে। কারণ এই সম্পদ ব্যবহারের দ্বারা সে শত্রুর মোকাবিলায় শক্তি ও সাহস লাভ করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে শয়তানের মোকাবিলা করিবার জন্য আল্লাহ্ পাক বান্দাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন

وَجَاهَدُوا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ *

"আল্লাহর রাস্তায় যথাসাধ্য মোজাহিদা কর।"

অন্য এক স্থানে বলেন-

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدو فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًا *

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। তাহাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর।" সুতরাং বান্দাদের যখন শয়তানের মোকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার এই নির্দেশের অধীনে বুঝা গিয়াছে যে, দুনিয়ার নিয়ামত এই পরিমাণ

ভোগ করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে যে পরিমাণ ভোগ করার দ্বারা শয়তানের মোকাবিলা করার শক্তি অর্জিত হয়। কেননা যদি পানাহার ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে ইবাদত করা এবং আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং মোজাহিদা করার জন্য বাদশাহের নির্দেশ প্রদান করা প্রমাণ করে যে, বাদশাহ তাহার জন্য যতগুলি জিনিস প্রস্তুত করিয়াছে উহাদের প্রত্যেকটি ব্যবহার করা তাহার জন্য বৈধ। তবে আমানতদারীর সাথে অর্থাৎ অন্যের হক ভোগ না করিয়া ব্যবহার করিবে।

ষোড়শ উদাহরণ ঃ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি বৃক্ষের একটি চারা রোপন করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা এই চারাটি বড় হয়। সুতরাং বৃক্ষ চারা যদি জানে যে উহার গোড়ায় পানি দেওয়া হইবে ভাল কথা। অন্যথায় আমরা অবশ্যই জানি যে, চারা রোপন করাতে এই ব্যক্তির ইচ্ছা হইল চারা বড় বৃক্ষে পরিণত হয়। তাহার এই উদ্দেশ্য সফল করিতে সে অবশ্যই চারার গোড়ায় পানি দিবে। সে পানি দিবে না এমন হইতে পারে না। হে মানব! অনুরূপভাবে তুমি বৃক্ষতুল্য, আল্লাহ পাক রোপনকারী ও পানি সেচনকারী; সর্বদা তোমার খাদ্য প্রেরণকারী তাঁহার প্রতি সুধারণা পোষণ করিও। তাঁহার প্রতি ধারণা খারাপ করিও না যে তোমাকে রোপন করার পর তিনি পানি দিবেন না। অর্থাৎ তোমার রিযকের ব্যবস্থাপনা করিয়া অসতর্ক হইয়া থাকিবেন।

সপ্তদশ উদাহরণ ঃ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ঃ যেমন, এক বাদশাহ কোন এক স্থানে তাহার অনেকগুলি দাস রহিয়াছে। এই সকল দাসের জন্য অন্য এক স্থানে একটি সুন্দর মনোরম বাড়ী নির্মাণ করিয়াছে। বাড়ীটি খুব করিয়া সজ্জিত করিয়াছে। ইহাতে এক উদ্যান সৃষ্টি করিয়া সর্বপ্রকার চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহ রাখিয়াছিল। বাদশাহের ইচ্ছা যে, দাসসমূহকে ঐ স্থান হইতে এই মনোরম বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিবে। তবে কি কেহ ধারণা করিতে পারে যে, বাদশাহ যাহাদের জন্য মহামূল্যবান মনোরম বাড়ী প্রস্তুত করিল তাহাদিগকে ইহাতে স্থানান্তর করিবার পূর্বে আহার প্রদান করিবে না? বান্দার অবস্থা তদ্রূপ। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করিয়াছেন। দুনিয়াতে তাহাদের দেহ টিকিয়া থাকিতে যে সব জিনিস ব্যবহার করা প্রয়োজন তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

كُلُوْا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ *

“আল্লাহ পাকের প্রদত্ত রিযক হইতে পানাহার কর।”

অন্য এক স্থানে বলেন,

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهٗ *

"তোমাদের প্রতিপালকের রিযক থেকে আহার কর এবং তাঁহার শুকরিয়া আদায় কর।"

অন্য আয়াতে আছে-

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا صَالِحًا *

"হে রাসূল! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক আমল করুন।"

অন্য এক আয়াতে আছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ *

"হে ঈমানদাররা! আমি তোমাদিগকে যে রিযক দিয়াছি উহার পবিত্রগুলি আহার কর।"

সুতরাং তোমার জন্য যখন চিরস্থায়ী নিয়ামত সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা হইলে কিভাবে তোমাকে অস্থায়ী নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করিতে পারেন? যদি বঞ্চিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে এমন জিনিস থেকে তোমাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে যাহা তোমার ভাগ্যে ছিল না। ইহাতে তোমার কোন অধিকার ছিল না। উপরন্ত ইহা থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে তোমার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। যেমন বৃক্ষে সর্বদা পানি দিলে বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যাইবে বিধায় কখনও কখনও বৃক্ষে পানি দেওয়া থেকে বিরত থাকিতে হয়। অথচ এই বিরতির মধ্যেই বৃক্ষের কল্যাণ।

অষ্টাদশ উদাহরণ ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া আখেরাতের সম্বল উপার্জনের ক্ষেত্রে বিমুখ হইয়া রহিয়াছে তাহার উদাহরণ যেমন এক ব্যক্তিকে এক হিংস্র প্রাণী অর্থাৎ সিংহ হামলা করিয়া বসিয়াছে। হয়তবা তাহাকে ছিড়িয়া ফাঁড়িয়া খাইবে। অপর দিকে তাহার গায়ে একটি মাছিও বসিয়াছে। সে সিংহের হামলা থেকে আত্মরক্ষার কোন চিন্তা করিতেছে না; বরং মাছি বিতাড়িত করার চিন্তায় লাগিয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তি চরম পর্যায়ের আহম্মক। তাহার বিবেক বুদ্ধি বলিতে কিছু আছে বলা যাইবে না। যদি তাহার বিবেক বুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই প্রথমে সিংহের আক্রমন হইতে আত্মরক্ষার চিন্তা করিত। মাছি বিতাড়িত করার চিন্তাও করিত না।

আখেরাতের চিন্তা বর্জন করিয়া যে দুনিয়ার চিন্তায় ব্যস্ত তাহার উদাহরণ তদ্রুপ। ইহা তাহার আহম্মক হওয়ার দলীল। যদি বিবেক বুদ্ধি থাকিত তাহা

হইলে আখেরাতের প্রস্তুতির কাজে লাগিয়া থাকিত। কারণ আখেরাতেও অবশ্যই তাহার সওয়াল জবাব হইবে। সে জিজ্ঞাসিত হইবে। খোদার সামনে তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। এই বিশ্বাস থাকিলে সে রিযকের উপার্জনের প্রতি গুরুত্ব দিত না। কারণ, আখেরাতের চিন্তা বর্জন করিয়া ইহকালের গুরুত্ব দেওয়া সিংহের হামলা হইতে আত্মরক্ষার চিন্তা বর্জন করিয়া মাছি তাড়াইবার চিন্তায় লাগিয়া যাওয়ার ন্যায়।

উনবিংশ উদাহরণ ঃ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের উদাহরণ যেমন পিতর সামনে পুত্র। পিতা থাকা অবস্থায় পুত্রের কোন চিন্তা থাকে না। দারিদ্রতার ভয় পায় না। অভাবের চিন্তা করে না। কেননা সে জানে যে, পিতা তাহার অভিভাবক। তাহার এই বিশ্বাস তাহার জীবন সুখময় করিয়া তুলে। তাহার চিন্তা দূরীভূত করিয়া দেয়। আল্লাহ পাকের সাথে মুমিনের সম্পর্কের অবস্থাও তদ্রূপ। তাহার অন্তরে রিযক সম্বন্ধে চিন্তা আসিতে পারে না। কারণ সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ পাক তাহাকে ক্ষুধার্ত ছাড়িবেন না। স্বীয় অনুগ্রহ হইতে দূরে ঠেলিয়া দিবেন না। স্বীয় দান ও ইহসান থেকে বঞ্চিত করিবেন না।

বিংশতম উদাহরণ ঃ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সম্বন্ধে। যেমন এক গোলাম। তাহার মালিক বিত্তশালী, ধণাঢ্য ব্যক্তি। গোলামদের প্রতি খুব সদয় ও উদারমনা। কখনও কিছু দিতে অস্বীকার করে না। দান খয়রাত করার সুখ্যাতি রহিয়াছে। তাহার দয়ামায়া, উদারতা ও অনুগ্রহের প্রতি গোলামের বিশ্বাস রহিয়াছে। তাই গোলাম সর্বাবস্থায় তাহার হাতের দিকেই চাহিয়া থাকে। স্বীয় মালিকের ধন সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞাত। এই জন্য সে সর্ব প্রকার অস্থিরতা ও পেরেশানী মুক্ত। এই ভাবধারা হযরত শকীক বলখী (রহঃ)-এর তওবার কারণ হইয়াছিল। তিনি নিজেই বলেন, একবার বলখের মধ্যে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তিনি কোথায়ও যাইতেছিলেন। পথে দেখিলেন যে, এক গোলাম খুব আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষের কারনে আপতিত বিপদের খবরও তাহার নাই। তিনি তাহাকে বলিলেন, হে যুবক! তোমার কি জানা নাই যে, মানুষ কত দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে? কি পরিমান বালা-মুছিবতে দিন কাটাইতেছে? গোলাম জবাব দিল যে, আমার এই বিষয়ে কোন পরওয়া নাই। কারণ আমার মালিক একটি গ্রামের মালিক। আমার যাহা খরচাদির প্রয়োজন হয় প্রতিদিন তাহা পাঠাইয়া দেন। হযরত শকীক বলখী (রহঃ) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, তাহার মালিক মাত্র একটি গ্রামের মালিক। আর আমার মালিক তো সকল আসমান যমীনের মালিক। এই সবের ধন ভাণ্ডার তাঁহারই হাতে। সুতরাং আমার মালিকের প্রতি আমার ভরসা তো তাহার তুলনায় অনেক

বেশী হওয়া উচিত। এই চিন্তাই তাহার সতর্ক হওয়ার কারণ হইয়াছিল।

একবিংশ উদাহরণ ঃ যে ব্যক্তি রিযক উপার্জন করার জন্য কোন উপায়ে জড়িত রহিয়াছে তাহার উদাহরণ। যেমন এক গোলাম। তাহার মালিক তাহাকে বলিল, কাজ কর এবং ইহার উপার্জিত অর্থ হইতে ভরনপোষণ চালাও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উপায় বর্জন করিয়াছে তাহার উদাহরণ এক গোলাম। তাহার মালিক তাহাকে অভয় দিয়াছে যে, আমার সেবা কর। আমি তোমাকে আমার নিয়ামত প্রদান করিব।

দ্বাবিংশ উদাহরণ ঃ যে ব্যক্তি রিযক উপার্জনে উপায় অবলম্বন করার পরও আল্লাহর দিকে দৃষ্টি রাখে উপায়ের দিকে রাখে না তাহার উদাহরণ। যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টি হইতেছে। এক ব্যক্তি বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে নীচের দিকে ঝুলানো জলনালীর নীচে গিয়া বসিল। আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতে থাকিল। জলনালীর নীচে বসার কারণে তাহার জন্য অপরিহার্য নহে যে, সে মনে করিবে যে, জলনালী বৃষ্টি প্রদান করিতেছে। কারন সে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জানে যে, যদি বৃষ্টি না আসিত তাহা হইলে এক ফোটা পানি দেওয়ার ক্ষমতা জলনালীর ছিল না। অনুরূপভাবে উপায় আল্লাহ পাকের নিয়ামত আসার জলনালী স্বরূপ। যে ব্যক্তি রিযক উপার্জনে উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু অন্তর আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করিয়া রাখে। উপায়ের সাথে সম্পর্কিত করে না। তাহার উপায় অবলম্বন করাতে কোন ক্ষতি নাই। আল্লাহর দরবার হইতে দূর হইয়া যাওয়ার ভয় তাহার নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি উপায় গ্রহণ করিয়া আল্লাহ থেকে গাফেল হইয়া পড়িয়াছে সে চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য। চতুষ্পদ জন্তুর নিকট দিয়া উহার মালিক যাইতেছে অথচ ইহা মালিকের দিকে লক্ষ্যও করে না। যদিও সে ইহার মালিক। কিন্তু ইহার চারক যখন কাছে আসে তখন তোষামোদের দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকায় এবং তাহার প্রতি স্বীয় আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কেননা এই জন্তু তাহার হাতে ঘাস পানি ভক্ষণ করিতে অভ্যস্থ হইয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ঘাস পানি পাঠায় মালিক। মালিক বন্ধ করিয়া দিলে চারকের কোন ক্ষমতা নাই। অনেক বান্দাদের অবস্থাও অনুরূপ। তাহারা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, মাখলুকের হাতের মাধ্যমেই অনুগ্রহ জারী হইয়াছে। কাহার থেকে অনুগ্রহ আসিয়াছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না। তাহাদের তুলনা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে। এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থার চেয়েও তাহাদের অবস্থা খারাপ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ *

"তাহারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং ইহাদের চেয়েও পথভ্রষ্ট। তাহারাই গাফেল।"

ত্রয়োবিংশ উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি রিযক উপার্জনে উপায়ের উপর নির্ভর করে আর অপর ব্যক্তি উপায় অবলম্বন করার পরও দৃষ্টি আল্লাহর দিকে রাখে এমন দুই ব্যক্তির তুলনামূলক আলোচনা- উদাহরণ পেশ করার মাধ্যমে। যেমন দুই ব্যক্তি। এক গোসলখানায় প্রবেশ করিল গোসল করিবার জন্য। একজনের বিবেক পরিপক্ক। অপরজন বিবেকহীন আহম্মক। গোসল করার সময় হঠাৎ করিয়া পানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিবেকবান জানে যে এই পানির একজন পরিচালক রহিয়াছে। সে পানি নিয়ন্ত্রণ করে। কখনও বন্ধ করে আবার কখনও জারী করে। বিবেকবান ব্যক্তি তাহার কাছে আসিবে। পানি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিবে। পক্ষান্তরে আহম্মক ব্যক্তি পানির নালীর কাছে আসিয়া নালিকে অনুরোধ করিয়া বলিতে শুরু করিয়াছে যে, হে নালী! আমাদের জন্য পানি ছাড়িয়া দাও। তোমার কি হইল যে, তুমি আমাদের পানি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ? এই অবস্থায় তাহাকে বলা হইবে যে, তুমি তো আহম্মক। নালী শুনিতে পায় নাকি? ইহা কি কিছু করিতে পারে? ইহা তো পানি আসার একটি পথ মাত্র।

চতুর্বিংশ উদাহরণ ঃ সম্পদ জমা করনেওয়ালার উদাহরণ। যেমন কোন বাদশাহের কোন গোলাম আছে। বাদশাহ তাহাকে বাগানের কাজে নিয়োজিত করিল যাহাতে সে বাগান পরিপাটি সুন্দর করিয়া রাখে এবং বাগানের অন্য কাজগুলি সম্পাদন করে। এই গোলাম বাগান হইতে ততটুকু পরিমাণ ফলমূল খাইতে পারে যতটুকু ফলমূল খাইলে বাগানের কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করিতে পারে। তবে জমা করিয়া রাখা বৈধ হইবে না। কেননা এই বাগানের ফল সর্বদাই মওজুদ থাকে। অধিকন্তু বাগানের মালিকও বিত্তশালী, শক্তিশালী। সুতরাং যদি মালিকের অনুমতি ব্যতীত ফল জমা করিয়া রাখে এবং মালিকের প্রতি সুধারণা পোষণ না করে তাহা হইলে এই গোলাম খেয়ানতকারী।

যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করিয়া রাখে না তাহার উদাহরণ। যেমন এক গোলাম। মালিকের বাগানে বা বাড়ীতে নিযুক্ত। সে জানে যে, তাহার মালিক তাহাকে ভুলিবে না এবং তাহাকে বেকারও ছাড়িবে না। বরং তাহার জন্য খরচ করিতে থাকিবে। তাহার প্রয়োজনাদি মিটাইবে। সুতরাং এই গোলাম স্বীয় মালিকের কারণে মাল জমা করিবে না। মালিক বিত্তশালী বলিয়া অভাবের ভয় করিবে না। মালিক ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি ভরসাও করিবে না। এই ধরণের

গোলামের প্রতি মনিবের সুদৃষ্টি পড়িয়া থাকে এবং মনিব ইহ্সান ও অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া থাকে।

পঞ্চবিংশ উদাহরণ ঃ যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে কিন্তু মনে করে যে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে আমানত স্বরূপ এইরূপ ব্যক্তির উদাহরণ। যেমন এক বাদশাহের এক গোলাম। সে কোন জিনিস নিজের মনে করে না। আবার তাহার কাছে যাহা কিছু আছে তাহা জমা করিয়া রাখার উপরও নির্ভর করে না। খরচ করিতেও পরওয়া করে না। তাহার প্রকৃত দৃষ্টি হইল বাদশাহের দিকে। বাদশাহ যাহা পছন্দ করে সে তাহাই অবলম্বন করে। যখন বুঝিতে পারে যে, তাহার মালিক অমুক জিনিসটি রাখিতে চাহিতেছে তখন তাহা রাখিয়া দেয়। তবে নিজের জন্য রাখে না। খরচ করার সুযোগ তালাশ করে। যখন বুঝিতে পারে যে, এই জিনিসটি খরচ করিলে মালিক খুশী তখন তাহা বিনা দ্বিধায় খরচ করিয়া ফেলে। সুতরাং এমন ব্যক্তি সম্পদ জমা করিয়া রাখিলেও মালিকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার অসন্তুষ্টির কথা হইতে পারে না। কেননা সে রাখিলেও মালিকের জন্যই রাখে। নিজের জন্য রাখে না। মারেফাত হাসিল করিয়াছে এমন ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রূপ। যদি খরচ করে তাহা হইল তো আল্লাহর জন্যই খরচ করে। আর জমা করিয়া রাখে তো আল্লাহর জন্য জমা করিয়া রাখে। খরচ করা এবং জমা করিয়া রাখা উভয় আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং এই লোক আল্লাহর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গোলাম। আল্লাহ পাক তাহাকে মাখলুকের গোলামী থেকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তি মহব্বত ও ভালবাসার দৃষ্টিতে মাখলুকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে না। তাহার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। আল্লাহর বড়ত্বে তাহার বক্ষ ভরপুর হইয়াছে। ইহা তাহার মাখলুকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য জমা করে। সে কত উচ্চ পদে আসীন? এই ব্যক্তির মর্যাদা ঐ ব্যক্তি হইতে কম নহে, যে আল্লাহর জন্য খরচ করে। কোন জিনিস তাহার হাতে পৌঁছার আগে আল্লাহর খাযানায় থাকিতে যে অবস্থা ছিল এখন তাহার হাতে পৌঁছার পরও ঐ অবস্থায়ই যেন রহিয়াছে। কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তাহার। আর তাহার সম্পদের মালিকও আল্লাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য জমা করিতে জানে না সে আল্লাহর জন্য খরচ করিতেও জানে না। বিষয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও।

রিযক ও উপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রে অবস্থার ভাষায় আল্লাহর পক্ষ হইতে সম্বোধন

প্রথম সম্বোধন ঃ হে বান্দা! খুব মনোযোগের সাথে তোমার কান আমার প্রতি পাতিয়া রাখ আর শুন যে আমার পক্ষ হইতে তুমি নিয়ামত লাভ করিবে। তোমার অন্তরের কান এই দিকে ঝুঁকাও আর শুন যে আমি তোমার থেকে দূরে নহি।

দ্বিতীয় সম্বোধন ঃ হে বান্দা! যখন তুমি তোমার নিজের ছিলে না তখন থেকেই আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে (অর্থাৎ তোমার জন্য তদবীর করাতে) আছি। সুতরাং তুমি নিজে এমন হও যেন তুমি নিজের না থাক। আমি তোমার প্রকাশের পূর্বেই তোমার হেফাজত করিয়াছি; এখনও তোমার হেফাজতে আছি।

তৃতীয় সম্বোধন ঃ হে বান্দা! সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এবং গঠন করার ক্ষেত্রে আমি অদ্বিতীয়। আদেশ দেওয়ার বেলায় ও ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায়ও আমি অতুলনীয়। সৃষ্টি ও গঠনের ক্ষেত্রে তুমি তো আমার শরীক নও। সুতরাং হুকুম করার ও ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায় আমার শরীক হইওনা। স্বীয় রাজত্বের বিভিন্ন বিষয়ের বন্দোবস্ত আমি করিয়া থাকি। আমার কোন সহায়তাকারী নাই। নির্দেশ প্রদানে আমি অদ্বিতীয়। আমি কোন পরামর্শদাতার মুখাপেক্ষী নহি।

চতুর্থ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! তোমার অস্তিত্বের পূর্ব হইতেই যে সত্ত্বা তোমার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বন্দোবস্তে লাগিয়া আছে। তাহার থেকে তোমার উদ্দেশ্য অর্জনে তাহার সাথে ঝগড়া করিও না। যে তোমার স্নেহ-মমতায় সর্বদা নিয়োজিত তাহার সাথে শত্রুতামী করিয়া মোকাবিলা করিও না।

পঞ্চম সম্বোধন ঃ হে বান্দা! তোমাকে স্নেহ-মমতা করিতে আমি অভ্যস্থ। সুতরাং তুমি আমাকে ডিঙ্গাইয়া নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন হইতে বিরত থাক।

ষষ্ঠ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! অভিজ্ঞতা অর্জিত হওয়ার পরও কি সন্দেহ থাকিতে পারে? বর্ণনা করিয়া দেওয়ার পরও কি কেহ কিংকর্তব্যবিমুঢ়তায় থাকিতে পারে? হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরও কি পথভ্রষ্টতা আছে? আমার ব্যতীত কোন তদবীর করনেওয়ালা (ব্যবস্থা গ্রহণকারী) নাই। তোমার এই বিশ্বাস কি তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করিতে পারে না? ইতিপূর্বে কৃত

আমার অনুগ্রহ কি তোমাকে আমার থেকে ঝগড়া করা হইতে বিরত রাখিতে পারে না?

সপ্তম সম্বোধন ঃ হে বান্দা! তুমি নিজকে আমার সৃষ্টি জগতের সাথে তুলনা করিয়া দেখ। বুঝিতে পারিবে যে, তুমি এই ধ্বংসশীল মাখলুকের তুলনায়ও কোন মূল্যই রাখ না। আর সৃষ্টিকর্তা তো ধ্বংশশীল নহেন; বরং চিরস্থায়ী। তাঁহার তুলনায় নিজকে কতটুকু মনে কর? তুমি তো আমার নিয়ন্ত্রণাধীন বিশাল সাম্রাজ্যের কথা স্বীকার কর। আর তুমিও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অংশী হইতে চেষ্টা করিও না।

আমাকে ডিঙ্গাইয়া নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আমার উপাস্য হওয়ার গুণের বিরোধিতা করিও না।

অষ্টম সম্বোধন ঃ তোমার জন্য কি ইহা যথেষ্ঠ নহে যে, আমিই তোমার জন্য যথেষ্ঠ। ইতিপূর্বে তোমার প্রতি আমি কত অনুগ্রহ করিয়াছি। ইহা দেখিয়া কি তুমি আমার উপর নির্ভর করিতে পার না?

নবম সম্বোধন ঃ তোমাকে আমি কখন তোমার নিজের মুখাপেক্ষী করিয়াছি যে, এখন তোমাকে তোমার কাছে সোপর্দ করিতে হইবে? আমার রাজত্বে আমি কোন জিনিসকে কখনও অন্যের কাছে অর্পণ করিয়াছি যে, এখন তাহা তোমার কাছে অর্পণ করিব।

দশম সম্বোধন ঃ হে বান্দা! আমি তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই আমার অনুগ্রহ ও দয়া তোমার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলাম। আমি নিজের কুদরতেই প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকি। সুতরাং আমাকে অস্বীকার করা তোমার জন্য কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?

একাদশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! আমি যাহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব লইয়াছি তুমি তাহাকে কখন অসুবিধায় পাইয়াছ? আমি যাহার সাহায্যকারী হইয়াছি সে কখন সাথীবিহীন রহিয়াছে?

দ্বাদশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! তুমি ভাগ্য অন্বেষণের পিছনে না পড়িয়া আমার খেদমতে লাগিয়া থাক। আমার প্রতিপালনের ক্ষমতার প্রতি বদ ধারণা পরিহার করিয়া আমার প্রতি সুধারনা পোষণ কর।

ত্রয়োদশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! অনুগ্রহকারীর প্রতি সুধারণা পোষণ না করা, শক্তিধরের সাথে প্রতিযোগীতা করা, সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞানের উপর আপত্তি উত্থাপন করা, মেহেরবান দয়ালুর সামনে বিষন্নতা প্রদর্শন করা উচিত নহে।

চতুর্দশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! যে স্বীয় ইচ্ছার পিছনে চলিয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছে সে উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পারে নাই। যে নিজকে আমার কাছে সোপর্দ করিয়াছে তাহাকে সহজ ও সোজা রাস্তা প্রদর্শন করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি সঠিক পন্থায় স্বীয় প্রয়োজন আমার কাছে পেশ করিয়াছে সে অগনিত সম্পদ লাভ করিয়াছে। যে আমার দিকে চলিয়াছে সে আমার সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হইয়াছে। যে আমার রজ্জু ধরিয়াছে সে খুব সুদৃঢ় মজবুত রজ্জু ধরিয়াছে। আমি নিজেই কসম করিয়াছি যে, যাহারা নিজের জন্য নিজেরাই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহাদের বিনিময় এইভাবে প্রদান করিব যে, তাহারা সর্বদা ঝামেলায় থাকিবে। তাহারা যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে তাহা আমি তছনছ করিয়া দিব। তাহারা যাহা বাধিবে আমি তাহা খুলিয়া দিব। তাহাদের দায়িত্ব তাহাদের উপরই অর্পণ করিব। সন্তুষ্ট থাকার সুখ স্বাদ এবং নিজকে সৃষ্টিকর্তার দায়িত্বে অর্পন করার ন্যায় নিয়ামত তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না। যদি তাহাদের আমার দিকে বুঝ থাকিত। তাহা হইলে আমি তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিত। সুতরাং নতুন করিয়া নিজের পক্ষ হইতে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিত না। তাহাদের হেফাজতের জন্য আমার ব্যবস্থা গ্রহণকেই যথেষ্ট মনে করিত। নিজের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বনের পিছনে পড়িত না। তখন আমি তাহাদিগকে আমার সন্তুষ্টির পথে পরিচালনা করিতাম। হেদায়েতের পথ দেখাইয়া দিতাম। সঠিক পথে চালনা করিতাম। চলার পথে সকল প্রকার ভয়ের মোকাবিলা আমার অনুগ্রহকে রক্ষা কবজ বানাইয়া দিতাম। তাহাদের সকল প্রকার আশা-আকাঙ্খা পুরা করিয়া দিতাম। আর এইসব কিছু করা আমার জন্য সহজ।

পঞ্চদশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! আমি কামনা করি যে, তুমি আমাকে চাও এবং আমাকে ডিঙ্গাইয়া অন্য কোন কিছুর ইচ্ছা না কর। আমি তোমার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে অবলম্বন কর। আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও অবলম্বন করা থেকে বিরত থাক। আমি তোমার জন্য পছন্দ করি যে, তুমি আমাকে পছন্দ কর। অন্যকে পছন্দ না কর।

ষোড়শ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! যদি আমি তোমাকে বিজয় ও সফলতা দান করি তাহা হইলে এই জন্যই দান করি যে আমি তোমার মধ্যে আমার দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আর যদি তোমাকে পরাজিত ও অসফল করি তাহা হইলে এইজন্যই করি যে, আমি তোমার জন্য যাহা নির্ধারিত করিয়াছি তাহাই তোমার জন্য প্রকৃত মেহেরবানী ও অনুগ্রহ। আর আমি আমার

এই অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর নিগূঢ় রহস্যসমূহ তোমার কাছে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

সপ্তদশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! আমি তোমার জন্য আমার যে সকল নিয়ামত প্রকাশ করিয়াছি। তুমি ইহার বিনিময় এইভাবে দিও না যে তুমি আমার সাথে ঝগড়া করিতে শুরু করিয়া দাও। আমি তোমাকে বিবেক বুদ্ধি দান করিয়া তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছি। আর ইহার মাধ্যমে তোমাকে অন্যান্যদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি। তুমি আমার এই অনুগ্রহের বিনিময় এইভাবে প্রদান করিও না যে তুমি আমার বিরোধিতা করিতে থাক।

অষ্টাদশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! আসমান ও যমীনের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আমিই করিয়া থাকি আর আদেশ করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমি অদ্বিতীয়। ইহা তুমি স্বীকার করিয়া লইয়াছ, সুতরাং তুমি ইহাও স্বীকার করিয়া লও যে, তুমি আমার রাজত্বে আছ। কেননা তুমি আমার রাজত্বেই আছ। তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও তুমি নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিও না। আমাকে তোমার সমস্যার সমাধানকারী বলিয়া বিশ্বাস কর। আমার অভিভাবকত্বের প্রতি আস্থা রাখ। আমি তোমাকে বিরাট দান দিব।

উনবিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা আমি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি আমার কাছে নিজকে সোপর্দ করার নূর আর আমার বিরোধিতা করার অন্ধকার কখনও বান্দার অন্তরে একত্রিত হয় না। যদি অন্তরে একটি স্থান পায় তাহা হইলে অপরটি অবশ্যই স্থান পাইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পার। ইহা তোমার ইচ্ছা। তুমি নিজের কাজে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং স্বীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিও না। হে ব্যক্তি! আমি তো তোমার মর্যাদা অনেক উচ্চ করিয়াছি। সুতরাং তুমি নিজকে অন্যের কাছে সোপর্দ করিয়া অপদস্থ হইও না। হে ব্যক্তি! আমি তো তোমাকে সম্মানিত করিয়াছি। সুতরাং তুমি অন্যকে লইয়া ব্যস্ত হওয়া তো তোমার দুর্ভাগ্য। অন্যকে লইয়া ব্যস্ত হওয়া অপেক্ষা আমার দৃষ্টিতে তুমি অনেক উর্ধ্বে রহিয়াছ। আমি তো তোমাকে আমার দরবারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। এই দিকে তোমাকে আহবান করিতেছি। আর স্বীয় অনুগ্রহে একই দিকেই আকর্ষণ করিতেছি। যদি তুমি নিজকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড় তাহা হইলে তোমাকে বন্ধ করিয়া রাখিব আর যদি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহা হইলে তোমাকে বাহির করিয়া দিব। যদি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা পরিহার কর তাহা হইলে তোমাকে আমার নিকটস্থ করিয়া লইব। আর যদি আমার ছাড়া

যাহা কিছু আছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আমাকে ভালবাস তাহা হইলে আমি তোমাকে কবুল করিব।

বিংশতম সম্বোধন ঃ হে বান্দা! যদি তুমি যথেষ্ঠতা ও হেদায়েত চাও তাহা হইলে ইহা কি তোমার জন্য যথেষ্ঠ নহে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ঠ এবং হেদায়েতকারী। আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তোমার গঠন সুঠাম করিয়াছি। তোমাকে সবকিছু দান করিয়াছি। সুতরাং আমার এই অনুগ্রহসমূহ কি আমার বিরোধিতা হইতে তোমার বিরত থাকার কারণ হইতে পারে না?

একবিংশতম সম্বোধন ঃ যে আমার সাথে ঝগড়া করে আমার প্রতি সে ঈমান রাখে না। বান্দার জন্য আমার সবকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও যখন সে নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে বুঝা গেল সে আমাকে অদ্বিতীয় মানে না। যে আমার নাযিলকৃত বিপদাপদের কথা অন্যের কাছে আলোচনা করে সে আমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে। যে আমার সামনে স্বীয় এখতিয়ার (ক্ষমতা) প্রদর্শন করে সে আমাকে অবলম্বন করে নাই। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশ পালন করে নাই সে আমার দাপট ও শক্তির সামনে অবনত হয় নাই। যে স্বীয় কাজ আমার কাছে সোপর্দ করে নাই সে আমাকে চিনে নাই। যে আমার প্রতি নির্ভর করে নাই সে আমার সম্বন্ধে অনবগত রহিয়াছে।

দ্বাবিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! আমার সম্বন্ধে তোমার চরম মূর্খতা রহিয়াছে। তোমার তো স্বীয় হস্তস্থিত বিষয়ের প্রতি আস্থা রহিয়াছে কিন্তু আমার হস্তস্থিত বিষয়ের প্রতি তোমার আস্থা নাই। আমি তোমার জন্য ইহা পছন্দ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে অবলম্বন করিবে আর আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও অবলম্বন করিবে না। আনুগত্য আর এখতিয়ার একত্রিত হয় না। অনুরূপভাবে অন্ধকার ও আলো এক সাথে হয় না। আবার আমার প্রতি মনোযোগী হওয়া আর মাখলুকের প্রতি মনোযোগী হওয়া এই দুইটি বিষয়ও একত্রিত হয় না। সুতরাং হয়তবা তুমি আমার হইবে অথবা তুমি তোমার নিজের থাকিয়া যাইবে। খুব বুঝিয়া লইয়া যে কোন দিক অবলম্বন কর। হেদায়েত পরিহার করিয়া ক্ষতিগ্রস্থতা অবলম্বন করিও না।

ত্রয়োবিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা যদি তুমি আমার কাছে নিজের জন্য কোন ব্যবস্থা প্রার্থনা কর মনে রাখিবে ইহা তোমার মূর্খতা। সুতরাং যখন তুমি নিজেই ব্যবস্থা অবলম্বন শুরু করিয়া দাও তখন এই সম্বন্ধে তোমাকে কি বলা যাইতে পারে? (অর্থাৎ ইহা তো আরও মারাত্মক) যদি আমাকে সাথে রাখিয়া অন্য কোন কিছু অবলম্বন কর তাহা হইলে ইহা তোমার বেঈনসাফী। আর যদি

আমাকে ছাড়িয়া অন্যকে অবলম্বন কর তাহা হইলে এই সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? (অর্থাৎ ইহা আরও মারাত্মক।)

চতুর্বিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! যদি আমি তোমাকে তোমার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করিতাম। তবুও ব্যবস্থা অবলম্বনে লজ্জিত হওয়া তোমার উচিত ছিল। অথচ ব্যবস্থা অবলম্বন থেকে বিরত থাকার জন্য তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হে ব্যক্তি! তুমি তো নিজের ফিকিরে লাগিয়া আছ। যদি তুমি নিজকে আমার দায়িত্বে সোপর্দ করিতে তাহা হইলে নিঃচিন্তায় আরামে থাকিতে। বান্দার প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করার বোঝা প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কেহ বহন করিতে পারে না। মানুষের তো ইহার শক্তিই নাই। যদি তোমার বোঝা অন্য কেহ বহন করে তাহা হইলে তুমি বহন করিতে যাও কেন? আমি তো তোমার আরাম ও সাবলীলতা চাই। সুতরাং তুমি নিজকে কষ্টে ফেলিও না। মাতৃগর্ভের অন্ধকারে আমি কিভাবে তোমার জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তুমি অস্তিত্ব লাভ করার পর যাহা চাহিয়াছ আমি তোমাকে তাহাই দিয়াছি। এখন আমি তোমার কাছে যাহা চাই সে বিষয় ঝগড়া করা তোমার জন্য শোভনীয় নহে।

পঞ্চবিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! আমি তোমাকে আমার খেদমত করিবার নির্দেশ দিয়াছি। তোমার রিযকের যিম্মাদার হইয়াছি। কিন্তু তুমি আমার নির্দেশ পালন কর নাই। আমার যিম্মাদারীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়াছ। আমি শুধু রিযকের যিম্মাদারী লইয়াই ক্ষান্ত করি নাই বরং এই বিষয়ে শপথও করিয়াছি। অতঃপর শুধু শপথ করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই বরং ইহার দৃষ্টান্তও বর্ণনা করিয়াছি। আর বিবেকবান বান্দাদের সম্বোধন করিয়া বলিয়া দিয়াছি। দেখ আমি বলিয়াছি-

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا انكم تَنْطِقُونَ *

“এবং তোমাদের রিযক এবং তোমাদের যাহা ওয়াদা করা হইয়াছে তাহা আসমানে রহিয়াছে। আসমান যমীনের প্রতিপালকের শপথ যে ইহা নিশ্চয়ই সত্য যেমন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা সত্য।”

অত্র আয়াতে উল্লেখিত যিম্মাদারী, শপথ ও দৃষ্টান্তের বর্ণনা ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

আরিফগণ আমার গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়াছে। একীনওয়ালাগণ আমার দয়া ও অনুগ্রহের কাছে নিজকে সোপর্দ করিয়াছে। সুতরাং যদি আমি

ওয়াদা না করিতাম তবুও তাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের প্রতি বর্ষিত অনুগ্রহ বন্ধ করিব না। যদি তাহাদের প্রতি আমার যিম্মাদারী নাও থাকিত তবুও আমার অনুগ্রহ করার গুণের প্রতি নির্ভরশীল থাকিত। যাহারা আমার নাফরমানী এবং আমার ব্যাপারে অসতর্কতায় লিপ্ত রহিয়াছে আমি তাহাদিগকেও রিযক প্রদান করিয়া থাকি। সুতরাং যাহারা আমার অনুগত এবং আমার ব্যাপারে সতর্ক আমি কিভাবে তাহাদিগকে রিযক না দিয়া থাকিব?

জানিয়া রাখ যে, যে ব্যক্তি বৃক্ষ রোপন করে সে ব্যক্তিই ইহাতে পানি সেচন করিয়া থাকে। যে কোন জিনিস সৃষ্টি করে সেই ইহার পরিচর্যা ও সাহায্য সহযোগীতা করে। মাখলুকের জন্য ইহা কম কথা নহে যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং তাহাদের জন্য যথেষ্ঠ। তিনি তাহাদের বিনিময়দাতা।

মাখলুক তো আমার থেকেই অস্তিত্ব পাইয়াছে। সুতরাং সর্বদা তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করাও আমার দায়িত্ব। আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং সর্বদা তাহাদিগকে রিযক প্রদান করা আমারই দায়িত্ব। হে বান্দা যাহাকে আহার করানো তোমার ইচ্ছা হয় তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও কি তুমি দাওয়াত করিয়া থাক? যাহার মনোতুষ্টি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও তোমার দিকে সম্পর্কিত করিয়া থাক কি?

ষড়বিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! তুমি রিযকের ফিকিরের স্থলে আমার ফিকির কর। কেননা আমি নিজে যে জিনিসের দায়িত্ব লইয়াছি ইহাতে তুমি শ্রম ব্যয় করিতেছ কেন? আর যাহা তুমি নিজ দায়িত্বে লইয়াছ অর্থাৎ ইবাদত তাহা অর্থহীন করিয়া ছাড়িয়াছ অর্থাৎ পালন করিতেছ না। ইহা কি সম্ভব, যে আমি তোমাকে আমার ঘরে স্থান দিব আর তোমাকে আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখিব? তোমার অস্তিত্ব দান করিব আর তোমাকে সাহায্য সহযোগীতা করিব না? তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিব না? আমি তোমার থেকে আমার হক চাহিদা করিব আর তোমাকে রিযক দিব না? তোমার থেকে খেদমত চাহিব আর তোমাকে আমার নিয়ামতের অংশ রিযক দিব না? হে দুর্ভাগা বান্দা! আমার কাছে তোমার জন্য বিভিন্ন রংয়ের বিভিন্ন প্রকারের বখশিশ রহিয়াছে। আমি তো তোমাকে আমার অনুগ্রহ প্রকাশের মাধ্যম বানাইয়াছি। আমি তোমাকে শুধু পার্থিব অনুগ্রহ দান করিয়াই ক্ষান্ত করি নাই; এমন কি তোমার জন্য বেহেশত পর্যন্ত জমা করিয়া রাখিয়াছি। এখানেই ক্ষান্ত করি না বরং আমার দর্শন লাভ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং সর্বদা আমার কার্যে লাগিয়া থাক। আমার অনুগ্রহে কিভাবে সন্দেহ করিতে পার?

সপ্তবিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! নিয়ামত গ্রহণকারী এবং আমার অনুগ্রহ লাভের যোগ্য কেহ না কেহ অবশ্যই থাকা চাই। যাহাকে উপকার করিয়াছি তাহার থেকে লাভবান হওয়ার থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুখাপেক্ষীহীন। এই বিষয়ে দলীল কায়েম রহিয়াছে। এমনকি তোমাকে রিযক না দেওয়ার জন্যও যদি আবেদন কর আমি তোমার আবেদন কবুল করিব না। যদি আমার অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার জন্য আবেদন কর তবুও তোমাকে বঞ্চিত করিব না।

সুতরাং আমার কাছে সর্বদা অথবা অধিকাংশ সময় চাহিতে থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাকে কিভাবে বঞ্চিত করিতে পারি? যদি আল্লাহর সামনে হায়া (লজ্জা) না করিয়া থাক তাহা হইলে এখন থেকে হায়া করিতে থাক। আমার পক্ষ হইতে যে সব কথা হয় তাহা অনুধাবন কর। আমার পক্ষ হইতে যে সব কথা হয় তাহা যে অনুধাবন করিয়াছে তাহার সবকিছু মিলিয়াছে।

অষ্টবিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! আমাকে অবলম্বন কর। আমাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও অবলম্বন করিও না। অকপটভাবে অন্তর আমার দিকে মনোনিবেশ কর। যদি তুমি ইহা কর তাহা হইলে তোমাকে উদাহরণহীন অনুগ্রহ ও অকল্পনীয় দয়া প্রদর্শন করিব। আর তোমার অন্তর খোদায়ী নূর দ্বারা আলোকীত করিয়া দিব। আমি একীনওয়ালাদের জন্য পথ খুলিয়া দিয়াছি। হেদায়েত অনুসন্ধানীদের জন্য হেদায়েতের নিদর্শন উজ্জল করিয়া দিয়াছি। সুতরাং একীনওয়ালারা যাচাই করতঃ আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। আর ঈমানদাররা দলীল প্রমাণসহ আমার প্রতি নির্ভর করিয়াছে। তাহারা বদ্ধমূল বিশ্বাস করিয়াছে যে, তাহারা নিজেরা নিজেদের জন্য যতটুকু কল্যাণকর নহে আমি তাহাদের জন্য তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করিয়াছে যে তাহাদের নিজেদের জন্য নিজেদের ব্যবস্থা অবলম্বন যতটুকু কার্যকর নহে তাহাদের জন্য আমার ব্যবস্থা গ্রহণ আরও অধিকতর কার্যকর। সুতরাং তাহারা মাথাবনত করিয়া আমার প্রতিপালন মানিয়া লইয়াছে এবং নিজেদেরকে আমার সামনে সোপর্দ করিয়াছে। ইহার বিনিময়ে আমি তাহাদের জীবনে শান্তি দিয়াছি। অধিকন্তু তাহাদের বিবেক বুদ্ধিতে নূর, অন্তরে আমার পরিচয় এবং ভিতরে আমার নৈকট্যের বিশ্বাস দান করিয়াছি। ইহা তো তাহাদের জাগতিক জীবনে আমার অনুগ্রহ। যখন তাহারা পরকালে আমার নিকট আসিবে তখন আমি তাহাদের উচ্চ মর্যাদা দান করিব এবং বড়ত্বের ঝাণ্ডা তাহাদের হাতে দিব। তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া এমন সব নিয়ামত

প্রদান করিব যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শুনে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে ইহার কল্পনাও আসে নাই।

উনত্রিংশ সম্বোধন ঃ হে বান্দা! যে সময়টুকু সামনে আসিতেছে এই সময়ে তো আমি তোমার কাছে কোনরূপ খেদমত চাই নাই তুমি কিভাবে আমার কাছে ঐ সময়ের রিযক চাহিতেছ? যখন আমি তোমার কাছে ইবাদত তলব করিব তখন তোমাকে রিযক প্রদান করিব। তোমার রিযকের বোঝা আমি নিজেই বহন করিব। যখন তোমার কাছে খেদমত চাহিদা করিব তখন তোমাকে আমিই আহার করাইব। একীনের সাথে জানিয়া রাখ যে, যদিও তুমি আমাকে ভুলিয়া থাক কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিব না। তুমি আমাকে স্বরণ করার পূর্বেই আমি তোমাকে স্বরণ করি। যদিও তুমি আমার নাফরমানী কর তবুও তোমার প্রতি আমার রিযক জারী থাকিবে। আমার থেকে তোমার মুখ ফিরাইয়া থাকা অবস্থায় (যাহা এখন উল্লেখ করা হইয়াছে) যখন আমি তোমার সাথে এইরূপ আচরণ করিয়া যাইতেছি। সুতরাং তুমি যখন আমার প্রতি মনোনিবেশ করিবে তখন তোমার সাথে আমার আচরণ কেমন হইবে বলিয়া মনে কর। যদি আমার শক্তি ও প্রতাপের সামনে শির অবনত না কর অথবা আমি তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছি উহার শুকরিয়া আদায় না কর, অথবা আমার নির্দেশসমূহ পালন না কর তাহা হইলে বুঝা গেল যে, তুমি আমার সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করিতে পার নাই। অতএব আমার থেকে বিমুখ হইয়া থাকিও না। তুমি এমন কাহাকেও পাইবে না যে, আমার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। সুতরাং অন্য কাহারও সাথে সম্পর্ক করিয়া আমার ব্যাপারে অসতর্ক থাকিও না। কেহই তোমাকে আমার থেকে মুখাপেক্ষীহীন করিতে পারে না। সর্বাবস্থায় তুমি আমার প্রতি মুখাপেক্ষী। আমি স্বীয় কুদরতে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমার প্রতি আমার নিয়ামত প্রশস্ত করিয়া দিয়াছি। আমার ছাড়া তোমার দ্বিতীয় কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। অনুরূপভাবে আমার ছাড়া তোমার অন্য কোন রিযিকদাতাও নাই। আমি নিজে তোমাকে সৃষ্টি করিব অথচ তোমার ভরন-পোষণের দায়িত্ব অন্যের স্কন্ধে অর্পন করিব ইহা কি হইতে পারে? আমি বড় অনুগ্রহশীল। আমি বান্দাদিগকে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া থেকে ফিরাইয়া রাখি। সুতরাং হে বান্দা! আমার প্রতি ভরসা কর যে আমি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। আমার সামনে আসিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে পৃথক হইয়া পড়। তাহা হইলে তুমি যাহা চাও আমি ঠিক তাহাই প্রদান করিব। পূর্বে তোমার প্রতি আমি যে ইনসাফ করিয়াছি উহা স্বরণ কর। সত্যিকার ভালবাসা ভুলিয়া যাইওনা।

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন ঃ আমরা ইচ্ছা করিয়াছি অত্র গ্রন্থটি এমন একটি দোআর মাধ্যমে সমাপ্ত করিতে যাহা অন্য গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামস্যপূর্ণ হয়।

দোআটি নিম্নরূপ, হে এলাহি! আমরা আপনার কাছে আবেদন করিতেছি যে, আপনি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন যেমন আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁহার পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। হে এলাহী! আপনি আমাদিগকে এমন সব লোকের অন্তর্ভূক্ত করুন যাহারা আপনার অনুগত। আপনার সামনে খেদমতের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমাদিগকে এমন সব লোক হইতে পৃথক রাখুন যাহারা আপনাকে ডিঙ্গাইয়া বা আপনার ব্যবস্থা গ্রহনের মোকাবিলায় নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে। আমাদিগকে আপনার কাছে আত্মসমর্পনকারী করিয়া দিন। হে এলাহী! যখন আমরা ছিলাম না তখন আপনি আমাদের ছিলেন। সুতরাং আমরা থাকার পূর্বে যেভাবে আপনি আমাদের ছিলেন অনুরূপভাবে এখনও আপনি আমাদের হইয়া থাকুন। আমাদিগকে আপনার অনুগ্রহের কাপড় দ্বারা আবৃত করুন এবং আপনার দয়া ও মেহেরবানী আমাদের দিকে ধাবিত করুন। নিজের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্ধকার আমাদের অন্তর থেকে বাহির করুন। আপনার কাছে আত্মসমর্পন করার নূর দ্বারা আমাদের ভিতর আলোকিত করুন। যাহাতে আমরা নিজেদের জন্য যাহা অবলম্বন করি তদাপেক্ষা আপনার বাছাই করা জিনিস আমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়।

হে এলাহী! আমাদের যে সব জিনিসের দায়িত্ব আপনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন সে সব জিনিস উপার্জনে আমাদিগকে জড়িত করিবেন না। যাহাতে আমরা আপনার সম্বন্ধে অসতর্ক না হইয়া পড়ি।

হে এলাহী! আপনি তো আমাদিগকে আহবান করিয়াছেন যাহাতে আমরা সর্বদা আপনার ইবাদত ও খেদমতে লাগিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের ইহার শক্তি নাই। তবে যদি আপনি শক্তিদান করেন। অধিকন্তু আমাদের ইহার সাহসও নাই। তবে যদি আপনি সাহস দান করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদিগকে কোন এক অবস্থায় না রাখেন আমরা কিভাবে ঐ অবস্থায় পৌঁছিতে পারি? যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদিগকে কোন উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌঁছান আমরা কিভাবে পৌঁছিতে পারি? যতক্ষন পর্যন্ত আপনি আমাদিগকে কোন বিষয়ে সাহায্য না করেন ঐ বিষয় আমরা কোথায় থেকে শক্তি পাইব? সুতরাং আপনার

আদেশসমূহ পালনার্থে আমাদিগকে তাওফীন দান করুন। এবং আপনার নিষিদ্ধ কার্যসমূহ থেকে বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করুন।

হে এলাহী! আমাদিগকে আত্মসমর্পনের এবং আপনার নির্দেশ মানিয়া লওয়ার বাগানে প্রবিষ্ট করাইয়া দিন। আর অস্থিরতামুক্ত করিয়া আমাদিগকে তথায় রাখিয়া দিন। আমাদের অন্তর আপনার সাথে জড়িত করিয়া রাখুন। আপনার সাহচর্যের স্বাদ ও মজা উপভোগ করিতে দিন। ইহার জাকজমক ও চমক দমক আমাদের চাহিদা নয়। হে এলাহী! আমাদিগকে আপনার আনুগত্য করার ও আপনার প্রতি মনোনিবেশ করার তাওফীক দান করুন। আর এমন নূর দান করুন যাহা দ্বারা আমাদের অন্তর উজ্জ্বল হইয়া যায় এবং আমাদের মধ্যে নিহিত নূর পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

হে এলাহী! সমস্ত জিনিস অস্তিত্ব লাভ করিবার পূর্বেই ইহাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের সমস্ত প্রয়োজন পুরা করিয়াছেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আপনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হইয়া থাকে। আর এই বিশ্বাসের দ্বারা তখনই আমাদের উপকার হয় যখন আপনি আমাদের উপকারের ইচ্ছা করেন। অতএব আপনি স্বীয় কল্যাণসহ আমাদিগকে বিদায় করুন। স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের অবস্থা উন্নীত করুন। স্বীয় মেহেরবানীসহ আমাদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করুন। স্বীয় করুনা দ্বারা আমাদিগকে পরিবেষ্টন করুন। আপনার ওলী হওয়ার পোশাকে সজ্জিত করুন। আমাদিগকে আপনার সাহায্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করুন। নিঃসন্দেহে আপনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

হে এলাহী! আমরা জানি যে আপনার নির্দেশের মোকাবিলা করিতে পারে এমন কেহ নাই। আপনার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোন কাজ কেহই করিতে পারে না। আমরা আপনার সিদ্ধান্ত নষ্ট করার ক্ষেত্রে এবং আপনার নির্দেশ অমান্য করার বেলায় সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। সুতরাং আপনার কাছে আমাদের আবেদন এই যে, আপনি আমাদের জন্য সিদ্ধান্তের বেলায় অনুগ্রহ করুন। আপনার নির্দেশ পালনে সহায়তা করুন এবং আমাদিগকে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভূক্ত করুন যাহাদের প্রতি আপনি করুনা করিয়াছেন। হে নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক! হে এলাহী! আমাদের ভাগ্যে যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা আমাদের কাছে এইভাবে পৌঁছাইয়া দিন যাহাতে আমাদের কোন কষ্ট না হয় এবং আমরা অতি সহজভাবে তাহা অর্জন করিতে পারি। মিলনের যে নূর আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে তাহা আপনার পক্ষ হইতে আসিয়াছে বলিয়া যেন বিশ্বাস করিতে পারি ফলে আপনার শুকরিয়া আদায় করিতে পারি এবং আপনি তাহা প্রদান

করিয়াছেন বলিয়া যেন বিশ্বাস করিতে পারি। অন্য কেহ দিয়াছে বলিয়া মনে না করি এমন তাওফীক দিন। হে এলাহী! দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত রিযক আপনার হাতে। সুতরাং উভয় প্রকার রিযক হইতে আমাদিগকে এতটুকু প্রদান করুন যাহাতে আমাদের কল্যাণ ও উপকার আছে বলিয়া জানেন।

হে এলাহী! আমাদিগকে এমন সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন যাহারা আপনাকে অবলম্বন করিয়াছে এবং তাহাদের অন্তর্ভূক্ত করিবেন না যাহারা আপনাকে ছাড়িয়া অন্যকে অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগকে এমন লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন যাহারা আপনার কাছে আত্মসমর্পন করিয়াছে। তাহাদের অন্তর্ভূক্ত করিবেন না যাহারা আপনার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করে।

হে এলাহী! আমরা আপনার মুখাপেক্ষী। আপনি আমাদিগকে দান করুন। আমরা ইবাদত করিতে অক্ষম। আমাদিগকে ইবাদত করার শক্তি ও সাহস দান করুন। আপনার নাফরমানী করিতে অক্ষম করিয়া দিন। আপনার খোদায়ীর সামনে অবনত হওয়া নসীব করুন এবং আপনার নির্দেশ পালনে পাবন্দি করার তাওফীক দান করুন। আপনার দিকে সম্পর্কিত হওয়ার সম্মানে সম্মানিত করুন। তাওয়াক্কুলের ফলে প্রাপ্ত প্রশান্তি রুজী হিসাবে দান করুন। আমাদিগকে এমন লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন যাহারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার ময়দানে চলে, আত্মসমর্পনের চৌবাচ্চাতে মুখ লাগাইয়া পান করে। আপনার মারেফাতের বাগান থেকে ফল কুড়াইতে থাকে। আপনার বিশেষ বান্দা হওয়ার পোশাকে সজ্জিত হইয়াছে, আপনার নৈকট্যের বখশিশ এবং আপনার মহব্বতের দরবারের দানসমূহ যাহারা লাভ করিয়াছে। যাহারা আপনার খেদমতে থাকে, আপনার পরিচয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, আপনার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী ব্যক্তিগণ যাহাদের উত্তরাধিকারী হয় এবং যাহাদের থেকে ফয়েজ হাসিল করে তাহাদের হইয়া থাকে এবং তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়।

হে রাব্বুল আলামীন! আপনি আমাদের শেষফল কল্যাণময় করুন।